ধর্ম্মজীবন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত

উপদেশাবলী।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

বিবৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩২২

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য,
২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি সংগৃহীত হইয়া "ধর্ম্মজীবন" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইল। এ গুলি পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকারা যদি আপনাদিগকে উপকৃত বোধ করেন, তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। বার্দ্ধক্যে রুগ্ন ও ভগ্নশরীরে গ্রন্থখানিকে বোধ হয় সম্পূর্ণ নির্ভুল করিতে পারা গেল না। যাহা হউক জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারই নাম মহিমান্বিত হউক।

কলিকাতা
৩রা মাঘ, ১৩২২

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সূচি পত্র।

সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	পৃষ্ঠা
১।	ধর্ম্ম প্রাণে।	৩রা ডিসেম্বর ১৮৯৯	১
২।	জীবনের ভিত্তি।	১০ই „ „	১৩
৩।	সহজ সাধন। ১ম।	১৭ই „ „	২৫
৪।	„ ২য়।	২৪শে „ „	৩৯
৫।	„ ৩য়।	৩১শে „ „	৫০
৬।	গভীর অভিনিবেশ ও স্বার্থত্যাগের শক্তি।		৬৪
৭।	মানবজীবনের সার্থকতা।		৭০
৮।	বিনয় ও শ্রদ্ধা।	১৯০০ সালে	৮১
৯।	আশা, আনন্দ ও বল।	„	৯৪
১০।	সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম।	„	১০৪
১১।	রাজসিক ধর্ম্ম ও সাত্বিক ধর্ম্ম।	„	১১৫
১২।	ধর্ম্মে শ্রেণীভেদ।	„	১২৬
১৩।	মানব-জীবনের একতা।	„	১৩৭
১৪।	অভয়-প্রতিষ্ঠা।	„	১৪৭
১৫।	ধর্ম্মে আত্ম-প্রবঞ্চনা।	„	১৫৪
১৬।	ঈশ্বরের কাজ ও মনুষ্যের কাজ।	„	১৬২
১৭।	কল্যাণকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।	„	১৭৩
১৮।	যেখানে প্রীতি সেখানেই নির্ভর।	„	১৮৩
১৯।	প্রেম ও সেবা।	„	১৮৮
২০।	উপাসনার বিঘ্ন।	„	২০০

সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	পৃষ্ঠা
২১।	নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।	”	২১২
২২।	মানব-প্রকৃতির সাক্ষ্য।	”	২২১
২৩।	আসল ও নকল।	”	২৩১
২৪।	সারবান ধর্ম্মজীবনের পথের বিঘ্ন।	”	২৪২
২৫।	বিচ্ছেদের ধর্ম্ম ও মিলনের ধর্ম্ম।	”	২৫৩
২৬।	ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম।	”	২৬৭
২৭।	দুঃখেঃ পাত্রা দিবোদকং।	”	২৮০
২৮।	চক্রনাভি ও চক্রনেমি।	”	২৯১

৫/২৩

ধর্ম্ম-জীবন।

ধর্ম্ম প্রাণে।

এ জগতে মানুষ ধর্ম্মকে তিনভাবে সেবা করিতেছে। প্রথম, এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা বলেন—ধর্ম্ম মতে। সকল ধর্ম্মেরই মূল ভিত্তিস্বরূপ কতকগুলি মত আছে। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যগণ ঈশ্বর, জগৎ ও মানবপ্রকৃতিকে, যে ভাবে দেখিয়াছিলেন ও ইহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে যেরূপ বিচার করিয়াছিলেন, সেই বিচারকে কতকগুলি মতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সকল মত সেই সেই ধর্ম্মের ভিত্তিভূমিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; সেই মতগুলিকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি ভাব ও অনুষ্ঠান রহিয়াছে;—এই সকলের সমষ্টিকে এক একটী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়। মানবদেহে কঙ্কালময় সংস্থানটী যেরূপ, এই মতগুলি যেন সেইরূপ। কঙ্কালের উপরে রক্ত মাংস লাগিয়া তবে দেহ গঠিত হয়; অস্থি-সংস্থানটীই দেহকে দণ্ডায়মান রাখে; ও তাহাকে কার্য্যক্ষম

করে; অস্থি-সংস্থান ভিন্ন রক্তমাংস কোথায় বসিবে ও কাজ করিবে? অথবা, ইহাকে দেবপ্রতিমা-গঠনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মৃণ্ময় দেবমূর্ত্তি গঠন করিবার পূর্ব্বে পটুয়াগণ একটা কাষ্ঠময় মূর্ত্তি গঠন করে, যাহাকে চলিত ভাষায় 'কাঠমা' বলে। ঐ কাঠমাখানি অগ্রে না করিলে মৃণ্ময় মূর্ত্তি গঠনের সুবিধা হয় না। মৃত্তিকা ঐ কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। ধর্ম্মের মতও যেন সেই প্রকার। মতগুলি ভিত্তিস্বরূপ ভিতরে না থাকিলে একটা ধর্ম্ম শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইতে পারে না; সাধনের অবস্থায় আসিতে পারে না; ভাব ও অনুষ্ঠানকে পোষণ করিতে পারে না। মতের প্রয়োজনীয়তা এতদূর স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে যে, দেহের কঙ্কাল যেমন দেহ নয়, প্রতিমার কাঠমা খানা যেমন প্রতিমা নয়, তেমনি কেবলমাত্র মতটাও ধর্ম্ম নয়।

বিশেষতঃ, এই একটা কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হয়; অজ্ঞ ও দুর্ব্বল মানুষ ঈশ্বর, মানব ও জগৎ সম্বন্ধে যে ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করে ও হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা সর্ব্বদাই অপূর্ণতা-দোষসংস্পৃষ্ট। যেমন আমরা এই দুইটী ক্ষুদ্র বাহিরের চক্ষু দ্বারা অনন্ত আকাশের যতটুকু দেখিতে পাই, এবং যে ভাবে দেখি, তাহা কি সত্যের অনুরূপ? অসীম অন্তরীক্ষে এক একটী গ্রহ নক্ষত্র অপরটী হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে; কিন্তু আমাদের বোধ হয় তাহারা যেন এক নীলবর্ণ পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে; বা এক প্রকাণ্ড গোলাকৃতি ছাদে হীরক খণ্ডের

ন্যায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃই কি তাহারা ঐরূপ? আমাদের চক্ষু প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ নয় বলিয়াই আমাদিগকে দূরবীক্ষণাদির ন্যায় যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। জ্যোতিস্তত্ত্ববিদ্যার উন্নতি সহকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ক্ষুদ্র চর্ম্মচক্ষু যাহা দেখিত, ও যে ভাব গ্রহণ করিত, তাহার কতই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে! জ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ মনে রাখা উচিত। আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা ও বিচারশক্তি, ঈশ্বর, মানব ও জগতের তত্ত্ব সম্বন্ধে যতটা গ্রহণ করে, ও যেরূপ বিচার করে, তাহাতে সর্ব্বদাই ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। তাহার উপরে এতটা ঝোঁক দেওয়া উচিত নহে, যাহাতে মতভেদের জন্য অপরকে নির্য্যাতন করিতে পারা যায়। অথচ ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কোনও কোনও সম্প্রদায় মতের উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দিয়াছেন; কতকগুলি মতের সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া, তদ্দ্বারাই মানবকে বিচার করিয়াছেন; বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে পতিত ও ভ্রষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন; এবং সামান্য মতভেদের জন্য মানুষকে এত ক্লেশ দিয়াছেন, যে রাজারা দস্যুতস্কর দিগকেও তত নিগ্রহ করে না। কেহ এই উক্তিকে অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না। যিহুদী ধর্ম্ম ও তদুৎপন্ন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যিহুদী ধর্ম্ম বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ

হইলেও মতপ্রধান ধর্ম্ম। ইহার অবলম্বিগণ চিরদিন অপর মতাবলম্বীদিগের প্রতি ঘোর অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। জগতে যদি ইঁহাদের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সেই শক্তি যে বিরুদ্ধ মত উন্মূলনে নিয়োগ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম যিহুদী ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত, সুতরাং তাহাদেরও মধ্যে মতপ্রধানতা দৃষ্ট হয়। এই উভয়ের মধ্যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম যিহুদী ধর্ম্মের অধিক নিকটবর্ত্তী, এজন্য মতগত সংকীর্ণতা ইহার একটী প্রধান চিহ্ন। কাফেরকে হত্যা করিলে পাপ নাই বরং পুণ্যই আছে, এই মত যে ধর্ম্মে উদ্ভূত ও পোষিত হইয়াছে, তাহার মতগত সংকীর্ণতার প্রমাণ অন্যত্র আর কি অন্বেষণ করা যাইবে? খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম ততটা সংকীর্ণ ও অনুদার না হইলেও ইহাতে মত-প্রাধান্য প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছে। মানবের পতন, শয়তানের জয়, যীশুর অলৌকিক জন্ম, তাঁহার অলৌকিক ও অতি-নৈসর্গিক ক্রিয়া, মৃত্যুর পরে সশরীরে আগমন, সশরীরে স্বর্গে গমন, যীশুর শিষ্য ভিন্ন অপর সকলের অনন্ত-নরক-বাস, প্রভৃতি কতকগুলি ভিত্তিভূত মত আছে, তাহাই জগতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। উক্ত মতাবলম্বীরা বিবেচনা করেন, যাহারা সেই সকল মত পোষণ না করে, তাহারা অধার্ম্মিক, তাহারা শয়তানের কর-কবলিত, ও অনন্ত নরকবাসের উপযুক্ত। ঐ মতগুলিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম বলিয়া জানাতে খ্রীষ্টীয় জগতে যুগে যুগে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে;

পোপের আদেশক্রমে সরল, সত্যপ্রিয়, সাধু-প্রকৃতি নরনারীকে সামান্য মতভেদের জন্য ঘোর যাতনা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে; দলে দলে নিধন করা হইয়াছে; গৃহচ্যুত ও দেশচ্যুত করা হইয়াছে। বলিতে কি, ধর্ম্ম মতে এই ভাবের অতি বিষময় ফল আমরা জগতের ইতিবৃত্তে দেখিয়াছি।

হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে অনেক উদার। ইহার স্থিতিস্থাপকতা ও প্রসারণশীলতার বিষয় চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে কপিল নাস্তিকতার পোষণ করিয়া অভ্যুদিত হইলেন, বেদের ও শাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, হিন্দুগণ সেই কপিলকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে শাক্যসিংহ দেব, দ্বিজ, বেদ, শাস্ত্র প্রভৃতির ঘোর বিদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইলেন, তিনিই কালে হিন্দুর হৃদয়াসনে অবতাররূপে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ইহা অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের উদারতার পরিচয় অন্য কি হইতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম এমনি স্থিতিস্থাপক যে ইহাতে উচ্চ একেশ্বরবাদ হইতে নিকৃষ্ট প্রেতপূজা ও কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পূজা পর্য্যন্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে বাবা নানকের শিষ্যগণ গগনথালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বালিয়া অলখ নিরঞ্জনের আরতি করিতেছেন, অপর দিকে তান্ত্রিক বামাচারিগণ ঘোর স্বেচ্ছাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া সেবা করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্ম-চিন্তায় সুমেরু ও কুমেরু একত্র মিশিয়া রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম মত বিষয়ে এমনি উদার। বরং এক এক সময়ে মনে হয়, এতটা উদার না হইলেই ভাল ছিল;

কারণ, উদারতা অনেক স্থলে ঔদাসীন্যের আকার ধারণ করে, এবং ঔদাসীন্যের ন্যায় ধর্ম্মের প্রাণনাশক অতি অল্প পদার্থই আছে।

হিন্দুধর্ম্ম মত বিষয়ে উদার হইয়া আর এক বিষয়ে ভ্রমে পড়িয়াছেন। যিহুদীধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, মহম্মদীয়ধর্ম্ম বলিয়াছেন—ধর্ম্ম মতে; হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াছেন—ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ভাব এই—তোমার মত কি, তুমি সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মান কি না, তাহার সহিত সমাজের বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ধর্ম্মের প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি তুমি যতক্ষণ করিতেছ, যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ, শৌচ সদাচার গুলি যতক্ষণ রাখিতেছ, ততক্ষণ তুমি ধার্ম্মিক, তুমি হিন্দুরূপে সমাজে গৃহীত হইবার যোগ্য। শৌচ সদাচারের এই নিয়মগুলি, লৌকিক ও কৌলিক অনুষ্ঠানগুলি, দুই প্রদেশ বা দুই হিন্দুমণ্ডলীর মধ্যে সমান নয়; অথচ যে প্রদেশে যে গুলি প্রচলিত আছে, সে প্রদেশে সেই গুলিই ধর্ম্ম, তাহার লঙ্ঘন হওয়া আর ধর্ম্মের উচ্ছেদ হওয়া একই কথা।

অনুষ্ঠানের উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় এতটা ঝোঁক দেওয়াতে অনিষ্ট ফল এই হয়, যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ যে নীতি, তাহার প্রতি লোকের ঔদাসীন্য-বুদ্ধি জন্মে। একজন বার মাসে তের পার্ব্বণ করিয়া মনে করে যে, নিষ্ঠাবান হিন্দুর পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা প্রয়োজনীয় তাহা কৃত হইল। তৎপরে সে ব্যক্তি বিধবার দুই বিঘা ভূমি কাড়িয়া লয়, কি আদালতে

দুইটা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কি দুইখানা দলিল জাল করে, তাহাতে আসে যায় না ; নিষ্ঠাবান হিন্দুর পক্ষে যাহা করণীয় তাহা সে করিতেছে। যখনি কোনও যুবক প্রচলিত অনুষ্ঠান ও নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজাকে আশ্রয় করিয়াছে, তখনি তাহার আত্মীয় স্বজনের মুখে শোনা গিয়াছে, "ইহা অপেক্ষা মাতাল দাঁতাল হইয়া থাকিল না কেন, তাহা হইলে ত স্বধর্ম্মে ও স্বীয় সমাজে থাকিত।" ইহাতেই প্রমাণ হয় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি নিয়ম পালন ও কতকগুলি অনুষ্ঠানের আচরণের প্রতি যতটা ঝোঁক, নীতির প্রতি ততটা ঝোঁক নহে।

ধর্ম্ম মতে ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে, এই দুই ভাবের ন্যায় আর একটা ভাব আছে তাহা এই, ধর্ম্ম কেবল নীতিতে। প্রতীচ্য দেশ সকলে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া যে সকল সংস্কৃত সম্প্রদায় অভ্যুদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভাব কতকটা এইরূপ। যাঁহারা নীতির উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক দিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্মের বিচার করেন, তাঁহাদেরও বিপদ আছে। সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইয়াও জগতে একপ্রকার নীতি থাকিতে পারে। নীতির নিয়মসকল অনেক স্থলেই মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের ফল। মানবে মানবে সংঘর্ষ হইতে নীতির জন্ম, মানব মানবের সম্বন্ধ ও তজ্জনিত কর্ত্তব্য নিরূপণ করা নীতির কাজ। যে ব্যক্তি নীতির নিয়মগুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছে, সে সেই গুলির প্রতিই দৃষ্টি রাখে ও

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেগুলিকে পালন করে। নিয়ম নিয়ম করিতে করিতে অনেক সময়ে তাহার হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলি শুষ্ক হইয়া যায়; জগতের কুনীতি তাহার হৃদয়কে বিষাক্ত করে; এবং তাহার চিত্তের শান্তিকে হরণ করে। মানব-জীবন কেবল কর্ত্তব্য কার্য্যের সমষ্টি নয়; ইহার মধ্যে অনেকটা প্রেম থাকা আবশ্যক; তদ্ভিন্ন সুখী হওয়া যায় না; অথবা অপরকে সুখী করা যায় না। প্রেমের উৎস হইতে যে নীতি উদিত হয় না, কিন্তু বাহিরের নিয়ম হইতে আসে, তাহা তিক্ততাকে প্রসব করে; এবং মানুষকে আর একদিকে সংকীর্ণ ও অনুদার করিয়া ফেলে।

ধর্ম্মকে আর একটা ভাবে দেখা উচিত তাহা এ, ধর্ম্ম প্রাণে। ধর্ম্ম মতে, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে, ধর্ম্ম নীতিতে, ও ধর্ম্ম প্রাণে, ইহার মধ্যে ধর্ম্ম প্রাণে এই কথাটাই যুক্তিযুক্ত। ধর্ম্ম প্রাণে আগে আসিলে তবে মতে, অনুষ্ঠানে, ও নীতিতে যায়। প্রাণগত ধর্ম্ম হইল জীবন-তরুর রস, আর মত অনুষ্ঠান ও নীতি হইল শাখা প্রশাখা। মূলে রস থাকিলেই শাখা প্রশাখাতে যায়, মূলে রস না থাকিলেই সমুদয় শুকায়। কিন্তু ধর্ম্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর, আত্মার লক্ষ্য যখন ঈশ্বরে স্থাপিত হয়। ধর্ম্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর, যখন হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি জাগিয়া উঠে এবং অনলের ন্যায় হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে থাকে। ধর্ম্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর, যখন ধর্ম্ম লক্ষ্য ও বিষয় উপলব্ধ হয়। ধর্ম্ম কখন প্রাণে আসে?

উত্তর, যখন সকল চিন্তা ভাব ও আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত আকারে ধর্ম্মের দিকে ধাবিত হয়। ধর্ম্ম কখন প্রাণে আসে? উত্তর, যখন পাপে অরুচি ও পুণ্যে রুচি জাগ্রত হইয়া হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করে। হৃদয়ের এই প্রকার পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্যে সন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে। দশটা ধর্ম্ম-মত মানুষকে শুনাইতে কতক্ষণ লাগে? পাঁচ জন উপযুক্ত সুবক্তা নিযুক্ত করিলে, ও প্রচারের প্রকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিলে, আমরা দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতার সমগ্র লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতগুলি শুনাইয়া দিতে পারি। তাহাকে কি বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার? তবেই দেখিতেছি; কেবল মত শুনাইলেই প্রচার হয় না, আরও কিছু চাই; কি চাই? হৃদয়-পরিবর্ত্তন চাই; হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি লাগা চাই; যে জিনিসে মত, অনুষ্ঠান, নীতি সকলকে সামলায় সেই জিনিষ চাই। তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন।

যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, যাঁহারা শিক্ষা দিতেছেন, যাঁহারা লিখিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও ইহার দ্বারা স্বীয় স্বীয় কার্য্যের বিচার করিতে হইবে। আমি যে এখানে সপ্তাহে সপ্তাহে উপদেশ দিতেছি তাহার ফল কি? ফল যদি এই মাত্র দেখি যে, লোক ভাষার লালিত্যে, বা অলঙ্কার বিন্যাসের পারিপাট্যে, বা কবিত্ব ও ভাবের প্রাচুর্য্যে প্রীত হইতেছেন, 'বাঃ বাঃ' বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন, তাহার অতিরিক্ত, তাহার অধিক, আর কিছুই অনুভব করিতেছেন না, হৃদয়ে কোনও আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে

না, কোনও প্রতিজ্ঞার উদয় হইতেছে না, কোনও পরিবর্ত্তন আনিতেছে না, তাহা হইলে আমি বলিব আমার এখানে বসিয়া প্রচার করা বিফল হইতেছে; বৃথা শক্তির অপচয় হইতেছে। কিন্তু যদি এই পাঁচ ছয় শত লোকের মধ্যে পাঁচ ছয় জন দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষ্য দেন যে, আমার ভাবের সহিত, আমার আত্মার সহিত সংশ্রব হইয়া তাঁহাদের আত্মাতে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, তবে আমি বলিব আমার এতদিন এখানে বসা সার্থক হইয়াছে। প্রচারকগণ প্রচারে বহির্গত হইয়া যদি দেখেন বহুসংখ্যক লোক করতালি দিয়া প্রশংসাধ্বনি করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই ভগবানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, উন্মুখ হইতেছে না, তবে ভাবিবেন যে প্রচার-প্রয়াস বৃথা যাইতেছে। যাঁহারা শিশুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, বা যাঁহারা তাহাদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারা যদি দেখেন যে, বর্ষের পর বর্ষ এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহারা কাহারও অন্তরে ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার দেখিতেছেন না, ধর্ম্মার্থে আগ্রহ ও ব্যাকুলতার লক্ষণ দেখিতেছেন না, যাহা দেখিলে মনে হয় ধর্ম্ম প্রাণে আসিয়াছে এমন কিছু দেখিতেছেন না, তবে ভাবিবেন যে, এত বৎসরের পরিশ্রম বৃথা যাইতেছে। যে শিক্ষার দ্বারা প্রাণে ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করা গেল না, তাহা দিয়া কিরূপে তৃপ্ত থাকা যায়? এই সকল বালক বালিকা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে ও গৃহধর্ম্মে

প্রবৃত্ত হইবে, তখন যে তাহারা বিষয়াসক্তি ও স্বার্থপরতাতে ডুবিবে না তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারেন? যে জিনিস সমুদয় জীবনকে সামলাইবে সে জিনিস যদি প্রাণে জন্মিল না, তবে কে তাহাদিগকে সামলাইবে? তাহারা যে কেবল বিষয়াসক্তি ও স্বার্থপরতাতে ডুবিবে তাহাই বা কে বলিল, তদপেক্ষা অধিক আরও কিছুতে যে ডুবিবে না তাহাই বা কে বলিল? সমাজমধ্যে যদি ধর্ম্মভাব জাগ্রত না থাকে, তাহা হইলে যে সে সমাজ দুষ্কৃতিতে ডুবিবে না, তাহার পূতিগন্ধে জগত যে নাকে কাপড় দিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এ সকল চিন্তা বিশেষভাবে তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যাঁহারা নরনারীকে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা দিয়া উন্মুক্ত করিতেছেন; যাঁহারা মানুষের স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করেন, কিন্তু সামলাইবার জিনিস অন্তরে দিবার জন্য ব্যস্ত হন না, তাঁহারা ঈশ্বর ও মানব উভয়ের নিকট দায়ী।

এই দায়িত্বভার যখন স্মরণ করি এবং চারিদিকে ধর্ম্ম-জীবনের অভাব দেখি, তখন মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। এক এক বার মনে হয়, এমন কাজে হাত দিয়াছি আমরা যাহার উপযুক্ত নই। যদি গড়িতে পারিব না তবে ভাঙ্গিতে কেন প্রবৃত্ত হইলাম; যদি ধর্ম্মজীবন দিতে পারিব না, তবে মানুষের ডানা হইতে শাসনের দড়ি খুলিয়া কেন উড়িতে শিখাইলাম? প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা অন্তরে অন্তরে এই প্রশ্নের উত্তর

দিবার চেষ্টা করুন। মানবাত্মা লইয়া ছেলেখেলা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে গুরুতর অপরাধ।

কিন্তু অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিবেন নব-জীবন দেওয়া কি মানুষের হাত? আমরা কে যে মানুষকে নব-জীবন দিব? একথা সত্য; আমরা জীবনদাতা নই, জীবনদাতা স্বয়ং ভগবান, আমরা তাঁহার সহায় মাত্র। জড় জগতে তাপ যেমন বিকীর্ণ হয়, ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মজীবনও তেমনি বিকীর্ণ হয়। তপ্ত হাতা খানি মাটীতে রাখ, মাটী তাতিবে। তেমনি ব্যাকুল জীবন্ত আত্মার সংশ্রবে আত্মাকে রাখ, ব্যাকুলতা ও জীবন সংক্রান্ত হইবে। আমরা যে অপরের হৃদয়ে ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার করিতে পারি না তাহার কারণ আমরা ব্যাকুল ও জীবন্ত আত্মা নই। আমরাই মৃত, সুতরাং অপরকে জীবন দিব কিরূপে? আমরাই স্বীয় স্বীয় আত্মার অবস্থার প্রতি উদাসীন, অপরকে সে বিষয়ে জাগাইব কি? কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, আমরা যদি না জাগি, ও অপরকে জাগাইতে না পারি, তবে এ সমাজ ধর্ম্মসমাজ থাকিবে না; ভবিষ্যতে মৃত্যু ইহাকে অনিবার্য্যরূপে গ্রাস করিবে; রসবিহীন বৃক্ষের শাখা প্রশাখার ন্যায় মত, অনুষ্ঠান, নীতি সকলি শুকাইবে। ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনই ধর্ম্মসমাজের জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, ইহা জানিয়া সকলে অভ্যুত্থিত হউন।

জীবনের ভিত্তি।

এই যে আমরা এতগুলি লোক এই উপাসনা-মন্দিরে বসিয়া আছি, যদি কোনও সাধু পুরুষ হঠাৎ এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদের মধ্যে কোনও একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি জীবনের ভিত্তি কি ? তুমি এ জগতে কিসের উপর দণ্ডায়মান আছ ? তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দেন ? আমি জানি, এরূপ প্রশ্ন করিলে আমাদের মধ্যে অনেককে একটু মুস্কিলে পড়িতে হয়। কারণ, আমরা সকলেই এ জগতে জীবন ধারণ করিতেছি বটে, এবং সকলেই এখানে কাজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই চিন্তা করিয়া থাকেন, কেন এ জগতে আছি, এবং কিসের উপর দাঁড়াইয়া আছি। অধিকাংশ মানবের পক্ষে এরূপ প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না ;—প্রশ্ন করি, আর না করি, আমরা জগতে থাকিবই, কাজ করিবই। গীতাকার ঠিক বলিয়াছেন,—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ র্গুণৈঃ॥

অর্থাৎ, এ জগতে কেহই কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না ; প্রকৃতির ধর্ম্ম বশতঃ সকলেই কাজ করিয়া থাকে।

কাজ করিতে হয় তাই করি ; কেন করি, কোথায় দাঁড়াইয়া আছি, তাহা কেহই চিন্তা করি না। বলিতে কি আমাদের অনেকের দশা যেন নদী-স্রোতের কাঠখানার ন্যায়। প্রতিদিন কলিকাতার সমীপবর্ত্তী গঙ্গার স্রোতে দেখিতেছি, কাঠখানা ভাঁটার টানে শিবপুরের চড়ায় আসিয়া লাগিতেছে, আবার জোয়ারের টানে ঘুষুড়ির টেঁকে গিয়া লাগিতেছে। কেন আসিতেছে, কেন যাইতেছে, নদীর স্রোত ভিন্ন তাহার অপর কারণ নাই। এ জগতে অনেক মানুষের জীবন দেখি যেন সেই প্রকার। যখন যে চর্চ্চা উঠিতেছে, যখন যে হাওয়া বহিতেছে, যখন যে স্রোত টানিতেছে, তাহারা তদ্দারাই নীত হইতেছে ; যখন যেরূপ প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি আসিতেছে, তখন সেইরূপ চলিতেছে। ভিতরে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিবার উপযুক্ত কিছু নাই ;—জীবনের গতি-নিয়ামক কিছুই নাই ; এখানে জন্মিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং না বাঁচিয়া কি করে ; বাঁচিতে গেলেই খাটিতে হয়, সুতরাং না খাটিয়া কি করে ; লোকে বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছে, পুত্র কন্যা হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদের পালন না করিয়া কি করে, তাই জগতে আছে ও কাজ করিতেছে। কেন আছে ও কোথায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা ভাবে না।

অথচ মানুষ এ জগতে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে এটা ভাবা ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে প্রয়োজন। একটা সামান্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে গেলে, তাহার বনিয়াদটা পাকা করিবার জন্য

ব্যস্ত হও, আর মানব-চরিত্রটা এত বড় জিনিস, তাহার বনিয়াদটা কোথায় রহিল, তাহা একবার ভাবিবে না? যাঁহারা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে বনিয়াদটা পাকা করিবার প্রয়াস পান। যতক্ষণ পাকা শক্ত মাটী না পান, ততক্ষণ ভিত্তি স্থাপন করেন না। এক স্থানে একটি পুষ্করিণী ছিল, কয়েক বৎসর হইল ভরাট হইয়া রহিয়াছে। সেখানে একজন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যাইতেছেন। তিনি কি করেন? ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব্বে যতক্ষণ না শক্ত মাটী পান ততক্ষণ খনন করিতে থাকেন। যাহারা গৃহনির্ম্মাণতত্ত্ব কিছুই জানেনা তাহারা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করে, এত খনন করিতেছে কেন। খনন করিতে করিতে যখন শক্ত মাটীতে গিয়া উপনীত হয়, তখন ভিত্তি স্থাপন আরম্ভ হয়। জিজ্ঞাসা করিলে গৃহ-নির্ম্মাতারা বলিয়া থাকে কাঁচা মাটীতে ভিত্তি স্থাপন করিলে গৃহ টেঁকে না, কালে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়; আবার দ্বিগুণ ব্যয় করিয়া তাহাকে নির্ম্মাণ করিতে হয়।

মানব-চরিত্রের পক্ষেও সেইরূপ কাঁচা মাটীর উপরে যদি চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সে চরিত্র টেঁকে না, কালে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। অতএব পাকা মাটীতে চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করিবেন চরিত্রের ভিত্তি আবার কি? এ ত বাক্যের একটা অলঙ্কার মাত্র; চরিত্র কি কোন বাহ্য বস্তু, ইহা কি মৃৎ-পাষাণ-নির্ম্মিত অট্টালিকার ন্যায় যে ইহার একটা ভিত্তি থাকিবে? ইহা

যে বাক্যের একটা অলঙ্কার তাহা সত্য, কিন্তু ভিতরে একটু অর্থও আছে। চরিত্রের ভিত্তি কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আমাদের প্রতিদিনের কাজ কর্ম্মের পশ্চাতে যে জিনিস থাকে, থাকিয়া আমাদের কাজের লক্ষ্য ও গতিকে নিয়মিত করে,—বিপদ আপদে যে জিনিসের উপরে আমরা প্রধান রূপে নির্ভর করি, যে জিনিসকে আমরা প্রধান-রূপে অন্বেষণ করি, যে জিনিসের লাভে হৃষ্ট হই, এবং যাহার ক্ষতিতে ভাঙ্গিয়া পড়ি, সেই জিনিস আমাদের চরিত্রের ভিত্তি।

দুইটী দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উক্তি কিঞ্চিৎ বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে ; একজন বিষয়ী লোকের কথা আমি জানি। তিনি জীবনের প্রথমাবস্থাতে অতিশয় দারিদ্র্যে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে পালন করিতেন। ঈশ্বর-কৃপাতে পুত্রটীর মেধা কিঞ্চিৎ প্রখর হওয়াতে তিনি অল্প কালের মধ্যেই বিদ্যাশিক্ষা ও বিষয় কর্ম্মে পারগ হইয়া উঠিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী পাইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক শত টাকা বেতনের একটা কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যে ব্যক্তি ধনের মুখ কখনও দেখে নাই, সে ধন পাইল, তখন ধনকে একেবারে বুকে ধরিল। তিনি মিতব্যয়িতার দ্বারা ধন সঞ্চয় করিতে লাগিলেন! সর্ব্ব প্রযত্নে ধনগুলিকে রক্ষা করিতেন,—এবং সংসারের আপদ বিপদে সেগুলির ক্ষতি হইতে দিতেন না। পূর্ব্বে তাঁহার স্বীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের

সহিত সখ্য ছিল ; কিন্তু ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধনীদের বন্ধুতা-প্রার্থী হইলেন ; এবং ধনের বৃদ্ধি বিষয়ে যাহারা পরামর্শ দিতে পারে তাহাদের পরামর্শই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন যায়, একবার সংবাদপত্রে দেখা গেল কোনও স্থানে একটী নূতন স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এবং তদর্থে একটী কোম্পানী হইতেছে। সকলেই বলিতে লাগিল সেই কোম্পানীর শেয়ার এখন কিনিলে দশ বৎসর পরে দশগুণ লাভ হইবে। দলে দলে লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। আমাদের বন্ধুটী অতি হিসাবী, অতি চতুর, ও বিষয়-রক্ষাতে পরিপক লোক হইয়াও সেই ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। তিনি তাঁহার সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ ঐ কোম্পানীর শেয়ার কিনিবার জন্য নিয়োগ করিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যেই জানা গেল সে স্বর্ণের খনি কিছুই নহে ; কোম্পানী ভাঙ্গিয়া গেল ; শেয়ারগুলির দাম বাজারে কাগজের মূল্যে দাঁড়াইল। আমাদের বন্ধুর অধিকাংশ ধনই নষ্ট হইল। ইহাতে তাঁহার এত আঘাত লাগিল যে আর অধিক দিন বাঁচিতে পারিলেন না। সেই সময় হইতেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তৎপরে তিনি যদিও কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, পূর্ব্ববৎ বেতন পাইতে লাগিলেন, মনে করিলে আবার কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিলেন না ; একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন ; ভাঁটার জলের ন্যায় জীবন ক্ষয় হইয়া যাইতে লাগিল ; অবশেষে চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত

হইলেন। সকলেই কি বলিবেন না, এ মানুষটা এ জগতে ধনের উপরেই দাঁড়াইয়া ছিল? ধন গেল আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। পশ্চিমে একজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালি বাস করিতেন। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধনের গুণে সকল শ্রেণীর লোকের নিকটে অতি উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলিতেন; সকল দরবারে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইতেন; মনে করিলেই লোকের একটা না একটা কর্ম্ম জুটাইয়া দিতে পারিতেন; মনে করিলেই একটা বিপদুদ্ধার করিয়া দিতেন; এ কারণে বহু সংখ্যক লোক তাঁহার অনুগত ও বাধ্য ছিল। এদেশীয় লোকের এত বড় পদ ও সম্ভ্রম কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু কিছু কাল পরে কোনও কারণে স্থানীয় ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন। একদিন সভামধ্যে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অপমানিত হইতে হইল। তিনি সেই যে গৃহে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, আর উঠিলেন না। তার পর প্রায় এক বৎসর জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু আর বাহিরে যাইতেন না; লোকের সঙ্গে মিশিতেন না; আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন না; রাজপুরুষদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না; জীবনটা যেন তিল তিল করিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি এ জগত হইতে চলিয়া গেলেন। সকলেই কি বলিবেন না, এ মানুষটী সম্ভ্রমের উপরে দাঁড়াইয়াছিল? সম্ভ্রম গেল আর দাঁড়াইতে পারিল না।

এইরূপে ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যে এ জগতে কেহবা ধনের উপরে, কেহবা প্রভুত্ব-শক্তির উপরে, কেহবা মানসম্ভ্রমের উপরে, দাঁড়াইয়া আছে। ভক্তিভাজন ঋষিগণ এই সকল মানুষকে বালকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন :—

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা
স্তে যন্তি মৃত্যো র্বিততস্য পাশং।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেম্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

অর্থাৎ, বালকেরাই বাহিরের কামনার বিষয়ের অনুসরণ করে; তাহারা বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; কিন্তু ধীরেরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া অধ্রুবের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

যাহারা অনিত্য অস্থায়ী বিষয় সকলকে আপনাদের চরিত্রের ভিত্তি করে, তাহাদিগকে বালক বলিবার অভিপ্রায় এই যে, বালকের স্বভাব এই যে, সে, বস্তুর আপাত-মনোহর রূপ দেখিয়াই আকৃষ্ট হয়; সে বস্তু স্থায়ী হইবে কিনা সে চিন্তা তাহার মনে উদিত হয় না। সুতরাং যাহারা অস্থায়ী বিষয়ের উপরে অমর আত্মার ও মানব চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে তাহারাও বালকের ন্যায় নির্ব্বোধ।

হে মানুষ! তুমি কি মনে কর, কোনও প্রকারে খাইয়া শুইয়া এ জগতে ষাটি বৎসর বাঁচিয়া থাকাই জীবন? কোনও প্রকারে দুইখানা পায়ের উপরে দাঁড়াইয়া চলিয়া, বলিয়া, করিয়া

খাওয়াই কি জীবন? ষাটি কি সত্তর বৎসর কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকাই যদি জীবন হয়, তবে সেরূপ জীবন ত একটা হাতিও ধারণ করে; সেও ত খাইয়া শুইয়া ষাটি কি সত্তর বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তুমি কি খাও, কি পর, কিরূপ ঘরে বাস কর, তাহা তোমার জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ; তুমি চারিদিক হইতে যে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছ, সুখ দুঃখের আঘাতে তুমি যাহা গড়িয়া দাঁড়াইতেছ, তোমার সময়, সুবিধা ও শক্তি অনুসারে জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য যতটা সাধন করিতেছ, সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ যতটা স্বীয় চরিত্রে আনিতে পারিতেছ, মর্ত্ত্যধামের নশ্বর বিষয় সকল হইতে চিত্তকে তুলিয়া যতটা অমরত্বের অনুধ্যানে নিযুক্ত করিতে পারিতেছ, ততটাই তোমার জীবন। ইহা যদি জীবন হয় তবে সে জীবনের ভিত্তি কি? অট্টালিকা গাঁথিয়া তুলিবার সময় তুমি যেমন মানুষকে পরামর্শ দেও—খনন কর, খনন কর, যতক্ষণ না শক্ত মাটী পাও ততক্ষণ ভিত্তি স্থাপন করিও না; তেমনি এ বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া যায়—খনন কর, খনন কর, যতক্ষণ না ঈশ্বরে গিয়া ঠেক। অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিবেন, খনন করার অর্থ কি? আর ঈশ্বরে ঠেকারইবা অর্থ কি?—খনন করার অর্থ সাধন করা,—ঈশ্বরে ঠেকার অর্থ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

সাধনের সঙ্গে খননের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুশীতল শান্তিপ্রদ বারি তোমার পায়ের নিম্নেই আছে, তাহাতে এখনি তোমার তৃষ্ণা নিবারিত হইতে পারে; কিন্তু খনন করা

চাই। খনিত্র লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, যে জল তুলিবই তুলিব, দেখিবে অচিরে জল উঠিবে। তেমনি হে মানব! মুক্তিপ্রদ বিমল তত্ত্ব তোমার হাতের নিকটেই আছে; তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধন কর,—বল, আমি সত্যস্বরূপে আশ্রয় না পাইলে ছাড়িব না,—দেখিবে সত্যস্বরূপ তোমার অন্তরেই রহিয়াছেন! এদেশের সাধুরা বলিয়াছেন, সাধনের মূলে প্রথমে "নেতি নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয়—এই ভাব; যাহা কিছু অনিত্য, যাহা কিছু ক্ষণিক, যাহা কিছু অসার, সে সমুদয় বর্জ্জন, এবং অমর ও সত্য বস্তুতে দৃষ্টি-স্থাপন। এইরূপে তুমি সাধনে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে পরম তত্ত্ব তোমার অন্তরে জাগিবে।

সাধনকে আর এক কারণে খননের সঙ্গে তুলনা করা যায়। খনন কার্য্যে মানুষ খনিত্রের সাহায্যে ভিতরের দিকেই প্রবেশ করে; সাধনের প্রধান কাজও তাই—ভিতরের দিকে প্রবেশ করা। তুমি ছুটিয়া বেড়াইও না; দূর হইতে ছালা বাঁধিয়া ধর্ম্ম আনিতে যাইও না; আত্মদৃষ্টিরূপ খনিত্রের সাহায্যে ভিতর হইতে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা কর, গুরু ও শাস্ত্র প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিতেছ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা তাহা হৃদগত করিবার চেষ্টা কর। তাহাই সাধন!

এইত গেল খননের অর্থ, এখন ঈশ্বরে ঠেকার অর্থ কি তাহা কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিতেছি। আত্মা যখন সর্ব্বপ্রধানরূপে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে, সর্ব্বপ্রধানরূপে ঈশ্বরের কৃপার উপরে নির্ভর করে ও সর্ব্বপ্রধানরূপে তাঁহার আদেশকে শিরোধার্য্য

করিয়া পালন করে, তখন বলা যায় সে আত্মা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ও ঈশ্বরে ঠেকিয়াছে।

আমরা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মসমাজের নামে, এমন অনেক কাজ করি যাহা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত নহে; যাহার ভিত্তি অনেক সময় অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ভাবের উপরে বা ক্ষণিক উত্তেজনার উপরে ন্যস্ত থাকে। যে নির্ম্মল বায়ুতে ঈশ্বরপ্রীতি বাস করে, সে নির্ম্মল বায়ু আমাদের মনে অনেক সময় থাকে না; সুতরাং আমাদের সকল কাজ ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা চালিত হয় না। ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা আমাদের অনেকের জীবনে ঘটে নাই। তাহা হইলে ধর্ম্মকেই সর্ব্ব-প্রধানরূপে অন্বেষণ করিতাম, ধর্ম্মের উপরেই সর্ব্বপ্রধানরূপে নির্ভর করিতাম এবং ধর্ম্মের আদেশের দ্বারাই সর্ব্বাবস্থাতে আপনাদিগের কার্য্যকে নিয়মিত করিতাম।

আত্মার পক্ষে নির্ম্মল বায়ু কি, তাহা একটু ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। সত্যকে, ধর্ম্মকে, একদিকে ও আপনাকে অপরদিকে রাখিয়া যে আপনাকে হীন বলিয়া অনুভব করে, এবং নিজের জয়, পরাজয়, খ্যাতি, লাভ গণনা না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যেরই জয় প্রার্থনা করে ও সত্যকেই অনুসরণ করে, তাহার চিত্ত নির্ম্মল. সেরূপ হৃদয়েই ঈশ্বর-প্রীতি জাগিয়া থাকে। যখন ধ্যানে ও চিন্তাতে এই নির্ম্মল ভাব প্রকাশ করে, কার্য্যের মধ্যে এই নির্ম্মল ভাব বাস করে, এবং মানুষের প্রতিদিনের আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এই নির্ম্মল ভাব

থাকে, তখন তাহার চারিদিকে এক প্রকার পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হয়, যাহাতে সমগ্র জীবনকে দিন দিন উন্নত করে।

জীবনের সেই উন্নত ভূমি লাভ করাই মনুষ্যত্ব। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্যই এ জীবন। তাহার সঙ্গে তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ অকিঞ্চিৎকর। মানুষ যাহাকে মুখ্যরূপে অন্বেষণ করে তাহাই তাহার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করে; তাহাই তাহার কার্য্যকে অনুরঞ্জিত করে; তদ্দ্বারাই সে আপনার বিশেষ লক্ষণ লাভ করে। যে বিষয়কে মুখ্যরূপে অন্বেষণ করে, সে বিষয়ী; বিষয় তাহার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়; বিষয় তাহার কার্য্যের গতিকে শাসন করে; বিষয় তাহার জীবনের সম্বন্ধ সকলকে নিয়মিত করে। ধর্ম্মকে যিনি মুখ্যরূপে অন্বেষণ করেন, তিনি ধার্ম্মিক; ধর্ম্ম তাঁহার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়; ধর্ম্ম তাঁহার কার্য্য সকলকে শাসন করে; ধর্ম্ম তাঁহার জীবনের সম্বন্ধ সকলকে নিয়মিত করে; সেইরূপ জীবন ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্মকে জীবনের ভিত্তিরূপে অবলম্বন কর। ইহা অপেক্ষা স্থায়ী ভূমি আর নাই! লোকানুরাগ দুদিন তোমাকে বরণ করিতে পারে, দুদিন পরে চলিয়া যাইতে পারে। আজ তুমি লোকের মনের অভিমত কার্য্য করিতেছ, সেজন্য সর্ব্বজন-প্রশংসিত; কল্য তাহাদের অনভিমত কার্য্য কর, দেখিবে লোক-প্রশংসা তোমাকে বর্জ্জন করিয়া যাইবে; এইরূপে হয়ত বৎসরের প্রথম ছয় মাস লোকের প্রিয়, শেষ ছয় মাস লোকের অপ্রিয় হইবে। যাহা এরূপ চঞ্চল, যাহা এরূপ অনিশ্চিত, তাহা

কি মানুষের কার্য্যের বা চরিত্রের ভিত্তি হইতে পারে? সে ভূমি বর্জ্জন কর। সুখকে জীবনের ভিত্তি করিও না; সুখের প্রকৃতি এই, ইহাকে ডাকিলে আসে না, অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায় না। যদি সুখ চাও তবে সুখ পাইবে না; সুখার্থ যাহা করিবে তাহাতে সুখ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, সুখ দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী কি আছে? প্রাতে সুখ, বৈকালে দুঃখ, এরূপ সর্ব্বদাই ঘটে। যাহা এমন চঞ্চল, এমন অনিশ্চিত, তাহা কি জীবনের ভিত্তি হইতে পারে? সেইরূপ হৃদয়ের ক্ষণিক ভাবকেও জীবনের ভিত্তি করিও না। বায়ুর উপরে ভিত্তি স্থাপনের ন্যায় সে ভিত্তি স্থায়ী হয় না। যিনি পরম সত্য, যিনি সকল চঞ্চলতার মধ্যে অচঞ্চল, সকল অনিত্যের মধ্যে নিত্য, তাঁহাতে জীবনের ভিত্তি স্থাপন কর। মানব-জীবনের অন্তরালে সেই সত্য বিরাজ করিতেছেন, তিনি সুদৃঢ় ভূমিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহাকে প্রীতি-নয়নে দর্শন কর।

সহজ সাধন।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে সকল গূঢ় দুর্ব্বলতা আছে, তাহাই আমাদের ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে প্রধান বিঘ্ন উৎপাদন করে। অধিক কি এই সকল প্রকৃতিগত গূঢ় দুর্ব্বলতার শক্তি এত অধিক যে অনেক সময়ে ইহারা ধর্ম্মের আদর্শকে খাঁট করিয়া থাকে। আমরা যখন দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ যাহা চাহিতেছে তাহা দিবার শক্তি আমাদের নাই, তখন অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে সেই আদর্শকে খাঁট করিয়া লই; আমরা যেরূপ, তদনুরূপ একটা ধর্ম্মকে খাড়া করি। ইহার প্রমাণ জন-সমাজে প্রতিদিন দেখিতে পাইতেছি।

আমাদের প্রকৃতির গূঢ় দুর্ব্বলতা কিরূপে আমাদের সাধন-পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ, অনেকের প্রকৃতিতে এক প্রকার স্বাভাবিক আলস্য আছে; শ্রম তাহারা ভাল বাসে না; শ্রম ভালবাসা মানুষের স্বভাব নয়; বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। এদেশে প্রত্যেক শ্রমজনক কার্য্যই অপ্রীতিকর; শয়ন করিতে পাইলে আমরা বসিতে রাজি নই; বসিতে পাইলে দাঁড়াইতে রাজি নই; দাঁড়াইতে পাইলে চলিতে রাজি নই; চলিতে পাইলে

ছুটিতে রাজি নই। শ্রম করিলেই কিছু শক্তির ক্ষয় হয়; দৈহিক ও মানসিক ধাতুর কিছু অপচয় ঘটে। যদিও মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে অপচয়ের সঙ্গেই উপচয় আছে, ক্ষয়ের সঙ্গেই বৃদ্ধি আছে, তথাপি প্রথম অপচয় ও ক্ষতিটা আমাদের ক্লেশ-কর। যেমন শারীরিক শ্রম সম্বন্ধে, তেমনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক শ্রম সম্বন্ধে। চিন্তা, উৎকণ্ঠা, আগ্রহ অনেকের সহ্য হয় না। সাধুরা বলিয়াছেন ;—

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।

পুত্তিকারা যেরূপ বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেইরূপ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মকে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু পুত্তিকাদিগের বল্মীক নির্ম্মাণের ন্যায় ধীরে ধীরে ধর্ম্মকে সঞ্চয় করা অনেকের পক্ষে অতীব ক্লেশকর। ধীরে ধীরে জ্ঞান সঞ্চয় করা, ধীরে ধীরে আপনাকে সংযত করা, ধীরে ধীরে চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করা, ধীরে ধীরে সাধুভাব অর্জ্জন করা, ধীরে ধীরে স্বীয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সাধন করা, ধীরে ধীরে ঈশ্বর ও মানবের সেবাতে আপনাকে অভ্যস্ত করা, এ সকল তাঁহাদের সয় না। রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার ন্যায় তাঁহারা রাতারাতি ধার্ম্মিক হইতে চান! তাঁহাদের প্রকৃতিগত আলস্য তাঁহাদিগকে তপস্যাতে বিমুখ করে। যেমন আমরা সংসারে দেখিতে পাই অনেক মানুষ ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের যে শ্রম তাহা স্বীকার না করিয়া ধনী হইতে চায়; সর্ব্বদা ভাবে, একটা দাঁও যদি মারিয়া লইতে পারা যায়, একটা ফিকির ফন্দী করিয়া হঠাৎ যদি কতকগুলা টাকা

হাতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। তীর্থের কাকের মত দোকান খুলিয়া আর বসিয়া থাকা যায় না; আনা গণ্ডা কড়া ক্রান্তির হিসাব রাখিয়া আর অর্থ সঞ্চয় করা যায় না; এতটা শ্রম, এতটা হিসাব, এতটা মিতব্যয়িতা আর সহ্য হয় না। এই শ্রেণীর লোক যদি শোনে যে এই কলিকাতায় জগন্নাথের ঘাটে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, যিনি তামাকে সোণা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা ছালা বাঁধিয়া পয়সা লইয়া নিশ্চয়ই কল্য জগন্নাথের ঘাটে উপস্থিত হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ দেখি; এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক আলস্যের মাত্রা এত অধিক যে, তাঁহারা তপস্যার ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত নন। বার বার পতন ও উত্থান, বার বার অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা, বার বার সংকল্পের দড়ি বাঁধা ও প্রবৃত্তির আঘাতে খোলা, বার বার ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা ও বার বার বিস্মরণ—ইহা তাঁহাদের সহ্য হয় না। যদি আজ কেহ তাঁহাদিগকে বলে এমন একজন সাধু একস্থানে আছেন, যিনি কাণে ভোঁ করিয়া এমন একটা মন্ত্র ফুঁকিয়া দিবেন বা চক্ষে চক্ষে চাহিয়া এমন একটা শক্তি সঞ্চার করিয়া দিবেন, যে আর আয়াস ও সংগ্রাম কিছুই করিতে হইবে না, টীকাখানিতে আগুন ধরার ন্যায় ধর্ম্ম আত্মাতে ধরিয়া যাইবে, তাহা হইলে আর তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিবেন না, দলে দলে সেই দিকে ধাবিত হইবেন। ইঁহারা যেন সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে বলিতেছেন,—আমরা তোমাকে

চাই, কিন্তু তোমাকে পাইবার ক্লেশ বহন করিতে রাজি নই।

অথচ চরমে ইঁহারা বঞ্চিত হন। ইঁহাদের দশা কিরূপ হয়? তাহা চিন্তা করিলে আমার একটী সমপাঠী বন্ধুর কথা মনে হয়। আমি প্রায় প্রতিদিন তাঁহার ভবনে বেড়াইতে যাইতাম. বেড়াইতে গেলেই তিনি আমাকে একটা না একটা পাঠ্য বিষয়ের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। বলিতেন—ভাই, কিয়ৎক্ষণ এইটা অনুবাদ কর, আমি একটু কাজ সারিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া তিনি চাকর বাকরের তত্ত্বাবধান, ছেলেদের পাঠের সহায়তা ও ঘরের কাজ কর্ম্মের তদারক করিতে যাইতেন; যে সকল কাজে যাওয়া তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন নয়, তাহাও করিতে যাইতেন। আমি বসিয়া বসিয়া খাতাতে অনুবাদটী লিখিতাম। পরে শুনিলাম, সেগুলি তিনি কাপি করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেন, ও নিজের মান বজায় রাখিতেন। কিছুদিন পরে আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল, আমরা উপরের শ্রেণীতে উঠিয়া আসিলাম, তিনি পড়িয়া রহিলেন। এই-রূপে ধর্ম্ম সাধনার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির জানিয়া রাখা উচিত, সংসারের বিদ্যা যেমন পরের লেখা কাপি করিয়া হয় না, তেমনি ধর্ম্মও ধার করিয়া হয় না। শ্রমে বিমুখ হও,—পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে; আপনার কাজের ভার পরের উপর দেও,—বঞ্চিত হইবে। শিশুদের টানা গাড়িতে শিশুরা বসে, বড় বালকগণ দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায়; যাহারা গাড়িতে বসে, তাহারা

ঝুমঝুমিকে লালাযুক্ত করে ও আনন্দে যায়; সেইরূপ, কোনও গুরু বা আচার্য্য বা মহাজনের হাতে দড়ি দিয়া, টানা গাড়িতে বসিয়া স্বর্গে যাইতে চাও,—চিরদিন ঝুমঝুমিকে লালা-যুক্ত করিতে হইবে;—ধর্ম্ম-জগতে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না। যাহাই বল, ও যাহাই কর, ধর্ম্ম শ্রম ও আয়াসসাধ্য। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন;—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

বলহীন ব্যক্তি, অর্থাৎ শ্রমকাতর ব্যক্তি এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। অতএব আমাদের ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে একটী প্রধান বিঘ্ন আমাদের আধ্যাত্মিক আলস্য।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা আর এক প্রকার কার্য্য করে। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, এই সংসার-টাকে আমাদের মনের মত করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। গৃহ পরিবারে, সমাজে, থাকিয়া সকল দিক সামলাইয়া জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করা বড় কষ্টকর। তাহাতে চিত্ত অনেক সময় উত্যক্ত হয়; হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হয়; মন উত্তেজিত ও তিক্ত হয়। এজন্য এক শ্রেণীর লোক চিন্তা করিতে থাকেন, দূর হোক, সংসার ধর্ম্মের প্রতিকূল, এখানে চিত্তের শান্তি রক্ষা করা যায় না, তা ধর্ম্মসাধন হইবে কি? এ সকল অনিত্য সম্বন্ধের জন্য প্রাণের আরাম হারাই কেন? থাক্, সংসার পড়িয়া থাক্, গৃহ পরিবার পড়িয়া থাক্, আমি ধর্ম্ম করিতে যাই। এই ভাবিয়া কেহ হয়ত বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া গেলেন;

কেহ হয়ত জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিয়া গেলেন। বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার প্রকৃতিগত গূঢ় সুখ-প্রিয়তা ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে এই পথে প্রবৃত্ত করিল; মহীরাবণের শ্রীরাম হরণের ন্যায় বিভীষণের আকার ধরিয়া আসিল। এই শ্রেণীর লোকের কার্য্যের ভিতর-কার কথাটা এই, সংসারে ভাবিতে ও খাটিতে যে ক্লেশ আছে, তাহা পাইতে হয় অপরে পাক্‌, আমি সচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া একটু আরামে বাস করি। এরূপ ধর্ম্ম-সাধনও সুখ-প্রিয়তার রূপান্তর মাত্র। এরূপ ধর্ম্ম-সাধনের ভাবটা দেশ হইতে যত শীঘ্র অন্তর্হিত হয় ততই দেশের পক্ষে কল্যাণ।

তৃতীয়তঃ, আর প্রকার ধর্ম্মসাধন আছে, যাহা স্বার্থপরতার রূপান্তর মাত্র। একজন লোক দেখিলেন প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আদর্শ যাহা চায়, তাহা করিতে গেলে, অনেক ছাড়িতে হয়, গার্হস্থ্য ও সামাজিক ব্যবস্থা অনেক বদলাইতে হয়। কিন্তু বদলাইতে গেলেই লোকভয়, সমাজের নিগ্রহের ভয়, লোকের অপ্রিয় হইবার ভয় আছে, তাহাতে স্বার্থের ক্ষতি; তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এমন কোনও পথ কি নাই, যাহাতে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, অথচ কিছু ছাড়িতে হয় না। দেখিলেন এমন সকল সাধন-প্রণালী রহিয়াছে, যাহাতে চিন্তা ও ভাব রাজ্যে বসিয়া বেশ আনন্দ সম্ভোগ করা যায়, অথচ কিছু ছাড়িতে বা কিছু করিতে হয় না; মন অজ্ঞাতসারে তাহাই ধরিয়া বসিল। তখন তাঁহারা তাহা ধরিয়া নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে

কোনও প্রকারে পরিতৃপ্ত রাখিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। লোকে যেমন শ্রমকাতর ছাত্রগণের জন্য "Algebra made easy" করিয়া দেয়, তেমনি religion made easy করিয়া লইলেন। বলিতে লাগিলেন—নিরাকারের উপাসনার জন্য সাকার কেন ছাড়িতে হইবে, এস আমরা নিরাকার সাকার দুইই ভজি। ঈশ্বরোপাসকদিগের মধ্যেও এরূপ দুর্ব্বলতা গূঢ় ভাবে কার্য্য করে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লোকভয় অতিক্রম করা কঠিন দেখিয়া, বলিতে থাকেন—"এস ভাই, আমরা ব্রহ্মোপাসনাই করি, গৃহ, পরিবার, সমাজ যাহা আছে তাহা থাক্ ; কাজ কি ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে !" এরূপ ধর্ম্ম-সাধনের মূলে স্বার্থরক্ষা-প্রবৃত্তি।

চতুর্থতঃ, আর একপ্রকার ধর্ম্ম-সাধন আছে, যাহা প্রশংসা-প্রিয়তার রূপান্তর মাত্র। কোনও কোনও প্রকৃতিতে প্রশংসা-প্রিয়তার শক্তি অতিশয় প্রবল। প্রশংসা-প্রিয়তাতে মানুষকে কি করাইতে পারে, তাহা অনেকে হয়ত চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। যদি একথা বলা যায়, জগতে যত মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, যে কিছু অসাধারণ স্বার্থনাশ, যে কিছু অসাধারণ বীরত্ব, যে কিছু অসাধারণ মহত্ব দেখা যাইতেছে,—প্রাচীন কালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবীরদিগের ঘাতক হস্তে নিধন প্রাপ্তি, অথবা হিন্দু বিধবাগণের চিতানলে জীবন আহুতি প্রভৃতি যাহা শোনা গিয়াছে,—তাহার বহুল প্রশংসাপ্রিয়তা-প্রসূত, তাহা হইলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশে

চৈত্র সংক্রান্তির সময় অনেক লোক পৃষ্ঠদেশ লৌহময় কাঁটার দ্বারা বিঁধিয়া চড়কগাছে ঝুলিয়া পাক খাইত; এখনও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে 'ডেভিল্ ড্যান্সার' নামে একদল বাজি-কর আছে, যাহারা মুখের মধ্যে আগুন পূরিয়া নাচিতে থাকে, এবং নাচিতে নাচিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যায়। এই সকল লোকের কার্য্যের পশ্চাতে লোকের বাহবা প্রধানরূপে কার্য্য করে। কিন্তু লোকের বাহবার শক্তি কেবল এখানেই দেখি তাহা নহে। আমাদের অনেকের ধর্ম্ম-সাধনের ভিতরেও লোকের বাহবা আছে। সকল দেশেই প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্ম সাধন ও ধার্ম্মিকতার কতকগুলি ভাব ও আদর্শ চলিয়া আসিতেছে। সেগুলি সেদেশের সাধারণ প্রজাকুলের মনে বদ্ধমূল। সাধক কিরূপ হইবে? ভক্ত কিরূপ হইবে? এই সকল প্রশ্ন মনে উদয় হইলেই তাহাদের অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে এক একটী ছবি উদিত হয়। যে সকল লোক স্বীয় জীবনে সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহারাই তাহাদের নিকট সাধক ও ভক্ত বলিয়া আদৃত হয়; এবং যাহারা তাহা অবলম্বন না করে ও ধর্ম্ম সাধনের কথা বলে, তাহারা বিরাগভাজন হয়। এই সকল মানুষের মধ্যে বাস করিয়া একজন যখন ধর্ম্মসাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহারা অজ্ঞাতসারে তাঁহার জীবনে নিজ নিজ হৃদয়স্থিত সাধক ও ভক্তের আদর্শের অনুরূপ লক্ষণ সকল দেখিবার প্রত্যাশা করিতে থাকে। নিতান্ত আত্ম-দৃষ্টি-পরায়ণ ও দৃঢ়চেতা না হইলে মানুষ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিদিগের

এই নীরব প্রত্যাশাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তখন তাঁহারা অজ্ঞাতসারে চারিদিকের লোকের হৃদয়নিহিত নীরব প্রত্যাশার দ্বারা গঠিত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। অমনি চারিদিক হইতে বাহবা বাহবা আসিতে থাকে। তাহাতে তাঁহাদিগকে আরও সেই পথে অগ্রসর করে। একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, হায় আমি কিরূপে ভক্ত হইব? অমনি লোকের হৃদয়-নিহিত নীরব প্রত্যাশা আসিয়া তাঁহার কর্ণে বলিল ;—যদি ভক্ত হইবে তবে

হাসিবে কাঁদিবে নাচিবে গাইবে
ক্ষেপা পাগলের মতন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"হায়, হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব ক্ষেপা পাপলের মতন" এ ভাব কেন আমার জীবনে আসে না?" কেন আসে না, কেন আসে না, করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে তাহা আসিতে লাগিল; তিনি নাচিতে লাগিলেন। অমনি চারিদিকে বাহবা বাহবা উঠিতে লাগিল; একজন ভক্ত দেখা দিয়াছেন। অনেক সাধক ও ভক্তের জীবনে এরূপ গূঢ় ও সূক্ষ্ম প্রশংসা-প্রিয়তার কার্য্য দেখা গিয়াছে। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুভব করা যায়, অনেকের নিরামিষ আহার, স্বপাকে খাওয়া, গেরুয়া ধারণ, একাহার, মালা জপ প্রভৃতির পশ্চাতে এই সূক্ষ্ম বাহবা প্রবল ভাবে কার্য্য করিতেছে। অতএব লোকের সূক্ষ্ম বাহবার শক্তিকে সর্ব্বদা ডরাও।

এইগুলি গেল সাধনপথের কন্টক; এগুলিকে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, এগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, ধর্ম্মের সহজ সাধনের পথ যে কিরূপ তাহা আমরা অনুভব করিতে থাকি। কুলার্ণব তন্ত্রের নবম উল্লাসে একটী বচন আছে তাহা এই ;

উত্তমা সহজাবস্থা, মধ্যমা ধ্যান-ধারণা,
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা মূর্ত্তিপূজাধমাধমা ॥

অর্থাৎ—সাধনের সহজাবস্থা সর্ব্বোত্তম, ধ্যান ধারণা মধ্যম, জপ স্তুতি প্রভৃতি অধম, আর মূর্ত্তিপূজা অধমাধম।

কোনও কোনও স্থানে মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে হোমপূজা এই পাঠ আছে। যাহা হউক, যিনি এই বচন রচনা করিয়াছিলেন, তিনি সহজাবস্থা এই শব্দের দ্বারা কি ভাব ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন? সহজ সাধনের অর্থ কি? এই কি যে ধর্ম্মসাধনার্থ কিছুই করিতে হইবে না? খাও দাও ঘুমাও, ধর্ম্ম আপনাপানি হইয়া যাইবে। তাহা কিরূপে হইতে পারে? ধর্ম্মের দুইটা দিক আছে; একটা জ্ঞানের দিক ও অপরটা চরিত্রের দিক। ইহার কোনওটাইত সাধন-নিরপেক্ষ নয়। ধর্ম্ম-জ্ঞান আয়ত্ত করিতে কি চিন্তার প্রয়োজন নাই? আত্ম-দৃষ্টির প্রয়োজন নাই? সাধুজনের উক্তি অনুশীলনের প্রয়োজন নাই? এরূপ কথা কে বলিতে পারে? সামান্য একটা সঙ্গীতবিদ্যা শিখিতে হইলে কত বৎসর ওস্তাদের তোষামদ করিতে হয়! কত বৎসর গলা সাধিতে হয়! সামান্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে হইলে কত বৎসর রাত্রি

জাগিতে হয়; কঠোর তপস্যা করিতে হয়; আর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে কি কোনও তপস্যার প্রয়োজন নাই?

এইত গেল জ্ঞানের দিক দিয়া, চরিত্রের দিক দিয়াও ত তপস্যার প্রয়োজন। আপনার প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করা, চিত্তশুদ্ধি লাভ করা, কার্য্য সকলকে ধর্ম্মের আদেশের অনুগত করা কি সামান্য শ্রম-সাধ্য ব্যাপার?

তবে সহজ সাধনের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, ধর্ম্ম-সাধন মানব-জীবনের কোনও এক বিশেষ অংশের কার্য্য নয়; কোনও অস্বাভাবিক প্রণালী বা প্রক্রিয়ালভ্য নয়; কিন্তু ফুলটী যেমন লতার সমগ্র শক্তি ও সমগ্র জীবনের পরিণতি, তেমনি ইহাও সমগ্র জীবনের পরিণতি। ইহা লাভ করিতে হইলে কোনও অস্বাভাবিক অবস্থাতে যাইতে হয় না; জগৎ, গৃহ, পরিবার ও সমাজ এ সকলকে ছাড়িয়া কোনও এক কল্পিত অবস্থাতে প্রবেশ করিতে হয় না; এই সকলের মধ্যেই, এই সকলের সমাবেশেই, এই সকলের সংঘর্ষণেই, এই সকলের সাহায্যেই, তাহা সাধিত হইতে পারে। জগতের সর্ব্বত্র চাহিয়া দেখ, যার জন্য যেটী তার সঙ্গে সেটী বাঁধা রহিয়াছে;—চক্ষুর সঙ্গে আলোক বাঁধা, তৃষ্ণার সঙ্গে জল বাঁধা, পৃথিবীর রসের সঙ্গে উদ্ভিদ্ বাঁধা, জীবের জীবনের সঙ্গে তাপ বাঁধা, তাপের সঙ্গে বায়ু বাঁধা, এইরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে; পরস্পর পরস্পরে প্রবেশ করে; পরস্পর পরস্পর-

সাপেক্ষ ও পরস্পর পরস্পরের সহায়। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম, তবে মানব-আত্মা ও মানব-সমাজ এই উভয়ের মধ্যে কি চির বিরোধ? গৃহ, পরিবার ও সমাজ বিধাতারই বিধান; তিনি কি মানব-আত্মাকে এমন পদার্থের দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছেন, যাহা তাহার আত্মার উন্নতির প্রতিকূল? ইহা কখনই নহে। গৃহ, পরিবার ও সমাজ ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল। কেবল একথা বলিলে হইবে না যে, গৃহস্থ হইয়াও ধর্ম্ম সাধন; করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, বলিতে হইবে যে গৃহস্থ হইয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। গৃহ, পরিবার ও সমাজে থাকিয়া যে ধর্ম্ম সাধন করা যায় তাহাই সহজ সাধন; অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে অবস্থা জন্মিয়াছে তাহাতে থাকিয়াই সাধন।

কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, মানব-সমাজ যে বিধাতার বিধান, এটা ধরিয়া লন কেন? আর মানব-জীবনের সঙ্গে যে মানব-সমাজ বাঁধা ইহাই বা মনে করেন কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই,—ঊর্ণনাভের সঙ্গে তাহার জালখানি যে বাঁধা তাহা কি সকলে অনুভব করেন না? ঊর্ণনাভ আপনার ভিতর হইতে জালখানিকে সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তাহার বাঁচিতে গেলেই জালখানি চাই, সুতরাং জালখানি তাহার সঙ্গে বাঁধা; তেমনি কি একথা বলা যায় না যে এমন মাল মসলা মানবের ভিতর ছিল এবং এখনও রহিয়াছে, মানব-সমাজ যাহা হইতে উদ্ভূত, এবং মানুষের এ জগতে থাকিতে

গেলেই মানব-সমাজ চাই। তবে আর বিধাতার বিধান কাহাকে বলে?

মানব-সমাজ যদি মানব-জীবনের সহিত এতদূর বাঁধা হয়, তাহা হইলে মানব-সমাজকে ছাড়িয়া মানব-জীবনের উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে? মানব-সমাজ মানবের ধর্ম্ম-সাধন-ক্ষেত্রের বাহিরে কি প্রকারে থাকিতে পারে? মানবের একটা ব্যক্তিগত দিক আছে, একটা সামাজিক দিকও আছে। সাধনেরও একটা ব্যক্তিগত দিক আছে ও একটা সামাজিক দিক আছে। কোনও কোনও চিন্তাশীল সাধক সাধনের সেই ব্যক্তিগত দিকটাতে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্মের ব্যাপার কেবল আমি ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে, তাহাতে সমাজের প্রয়োজন কি? কিন্তু তাহা একটা ভাবের আতিশয্য মাত্র। মানবাত্মাকে যেমন কাটিয়া দুখানা করা যায় না; মানবজীবনকেও তেমনি কাটিয়া দুখানা করা যায় না। মানুষ যেমন নিজে আটপোরে ও পোষাকি কাপড় পৃথক্ রাখে, তেমনি ধর্ম্ম ও সমাজকে দুইটা স্বতন্ত্র রাখা যায় না। জীবনের এক অঙ্গে অবনতি ঘটিলে সর্ব্বাঙ্গেই অবনতি ঘটে। এইজন্যই জীবনের সর্ব্ববিভাগেই ধর্ম্মসাধনকে ব্যাপ্ত করিতে হয়; এবং তাহা হইলেই মানব-সমাজও ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

গৃহ, পরিবার ও সমাজ ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হইলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে, এই সকল ছাড়িয়া আর কোথাও যে একটা

ধর্ম্ম আনিতে যাইতে হইবে তাহা নহে; এই সকলকে উন্নত করিয়া ধর্ম্মের অনুগত করিতে হইবে। আমরা সর্ব্বদা যে স্থানটাতে বাস করি, এবং বাধ্য হইয়া বাস করিতে হইবে, সে স্থানটাতে যদি ধর্ম্মের হাওয়া না থাকে, আমরা কি বহুদিন আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারি? কলিকাতার দেশীয় বিভাগের অনেক বাবু যেমন দূষিত ও দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা বাস করেন এবং এক ঘণ্টা কাল গড়ের মাঠে পবিত্র বায়ু সেবন করিতে যান, তেমনি কি আমাদের জীবনের অধিকাংশ ভাগ ধর্ম্মসাধনের বাহিরে থাকিবে এবং আমরা সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাল কোন স্থানে গিয়া ধর্ম্ম সাধন করিয়া আসিব?

এইরূপে যতই চিন্তা করা যাইবে ততই অনুভব করা যাইবে যে গৃহ, পরিবার ও সমাজ সমুদয় আমাদের সাধন-ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত। ধর্ম্মসাধন এ সকলকে ত্যাগ করিয়া কোনও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে, কিন্তু এই সকলেরই উপরে ব্যাপ্ত।

সহজ-সাধন।—২য়।

গত বারে বলিয়াছি, সহজ সাধনের অর্থ সমগ্র মানব-জীবন ও মানব-সমাজকে ধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করা। মানব-সমাজ ধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্র এই কথা বলিলেই ইহা বলা হয়, যে গৃহ, পরিবার, বিষয়, বাণিজ্য, অর্থাগম, অর্থের ব্যবহার, শিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতি মানব-সমাজের জীবনের অঙ্গীভূত তাবৎ কার্য্য ধর্ম্মের এলাকাভুক্ত। ইহা একটা বড় কথা; এবং এদেশের পক্ষে একটা নূতন কথা। এদেশে অদ্বৈতবাদের মত বহুল-প্রচার হওয়াতে, এদেশের উচ্চ ধর্ম্ম বহুকাল সমাজ-বিমুখ হইয়া রহিয়াছে। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে যেমন অ্যাসিডের কাজ পদার্থসকলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখান, তাহাদের মধ্যে কোন কোন মৌলিক পদার্থ আছে তাহা প্রকাশ করা, তেমনি আত্মার জগতে জ্ঞান বা বিচারের কাজ জ্ঞান-সমষ্টিকে বিশ্লিষ্ট করা। অদ্বৈতবাদ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত, সুতরাং ইহাতে মানব-জীবনকে মানব-জ্ঞানকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখায় যে সকলের মূলে এক। সুতরাং যাহা কিছু এই একত্বকে আচ্ছাদন করে, একত্ব হইতে দৃষ্টিকে বহুত্বে লইয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞানের চক্ষে তাহা অবিদ্যা। গৃহ, পরিবার, ও সমাজ এই একত্ব জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিবার

পক্ষে প্রধান কারণ ও এই একত্ব জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়, এই কারণে, জ্ঞানিগণ গৃহ, পরিবার ও সমাজে আবদ্ধ জীবদিগকে চিরদিন অজ্ঞ ও অবিদ্যাজালে জড়িত বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন। এই কারণেই অদ্বৈতবাদের গতি সমাজের অভিমুখে না হইয়া সমাজের বিমুখে।

কেবল যে অদ্বৈতবাদমূলক উচ্চ হিন্দুধর্ম্ম জন-সমাজকে হীন চক্ষে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মও আর এক দিক দিয়া সেই ভাব পোষণ করিয়াছে। সেণ্ট অগষ্টাইন নামক সুবিখ্যাত খ্রীষ্টীয় প্রচারকের সময় হইতে প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্ম এই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন যে মানবের আদি পিতামাতার অবাধ্যতা হেতু সমগ্র মানব-সমাজ পাপগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমান মানব-প্রকৃতির মূলে পাপ;—তাহা ধর্ম্মের প্রতিকূল এবং তাহা হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হয়, সকলি অপবিত্র ও ধর্ম্মের প্রতিকূল। ইহা হইতে এই মত জন্মিয়াছে, যে যীশুর আশ্রয় দ্বারা নব-জীবন প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতি পাপময়। ইহা হইতে স্বাভাবিক মানুষ ও নবজীবন-প্রাপ্ত মানুষ, পারমার্থিক কার্য্য ও লৌকিক কার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে একটী সুস্পষ্ট দৃশ্যমান সুমহৎ প্রাচীর উঠিয়াছে। এই কারণে বিশ্বাসী খ্রীষ্টীয়গণ জন-সমাজের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সভ্যতা প্রভৃতি সকলকে ধর্ম্মের চক্ষে দেখিতে পারেন না। ইহার অনেকগুলিকে তাঁহারা মানবের দূষিত-প্রবৃত্তি-প্রসূত বলিয়া মনে করেন। এক

দিকে দেখিতে গেলে ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক ! কারণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে তাহা এই যে, ইহা মানব-সমাজকেই আপনার কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করে। যেমন উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা কিসে সংসার হইতে অবসৃত হইব, এবং অবিদ্যা নিবারণ করিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অনুভব করিব, তেমনি খ্রীষ্টধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা কিসে Kiugdom o! Heaven upon carth, অর্থাৎ মানব-সমাজে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিব। একের গতি সমাজ-বিমুখে অপরের গতি সমাজ অভিমুখে ; সুতরাং বিস্মিত হইয়া সকলেই প্রশ্ন করিতে পারেন, যে ধর্ম্মের গতি সমাজ অভিমুখে, তাহা কেন জন-সমাজের অঙ্গীভূত ব্যাপার সকলকে ধর্ম্মের চক্ষে দেখিতে পারে না ?

আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব এই যে, ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভাবকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিতে চাহিতেছে। হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান ভাব ঈশ্বরকে অনিত্যের মধ্যে নিত্য, এবং আত্মার পরমাত্মা বলিয়া দেখা, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান ভাব জন-সমাজকে উন্নত করিয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন করা। হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান সাধন আত্ম-দৃষ্টিতে ও ধ্যানে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান সাধন প্রার্থনা ও নর-সেবাতে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উভয়কেই স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহিতেছেন। এই কারণে ইহা যুগধর্ম্ম বলিয়া পরি-গণিত হইবার উপযুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা প্রাচীন হিন্দু-ভাবের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দিবেন, অথবা যাঁহারা প্রতীচ্য

ধর্ম্মভাবের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দিবেন, তাঁহারা যুগধর্ম্মের বাহিরে যাইবেন।

আমি অগ্রে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে কাহার কাহারও মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, জন-সমাজকে অর্থাৎ গৃহ, পরিবার, বিষয়, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্যাদি সমুদয়কে ধর্ম্মের সাধনক্ষেত্রের অন্তর্গত করা কি সম্ভব? ধর্ম্ম থাকে পারমার্থিক বিষয় লইয়া, এ সকল থাকে লৌকিক বিষয় লইয়া। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই, পারমার্থিক ও লৌকিকের মধ্যে এতটা প্রভেদ প্রাচীন ধর্ম্মের শিক্ষা-সম্ভূত। মানব জীবন যদি সেই বিধাতা পুরুষের প্রদত্ত হয়, এবং মানব সমাজ যদি মানব-জীবনের রক্ষা, শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বিধান বিশেষ হয়, তবে পারমার্থিক ও লৌকিকের মধ্যে এতটা প্রভেদ করা কি যুক্তিসঙ্গত? চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে কাজটার মধ্যে পারমার্থিকতা বা লৌকিকতা ততটা থাকে না, যে ভাবে কাজটা করা যায় তাহার মধ্যে যতটা থাকে। একজন পারমার্থিক কার্য্য লৌকিক ভাবে করিতে পারে,—লৌকিক কেন পৈশাচিক ভাবে করিতে পারে, আবার একজন লৌকিক কার্য্য পারমার্থিক ভাবে করিতে পারে। এতদ্দেশে বহুসংখ্যক এরূপ সন্ন্যাসী দেখা যায়, যাহারা কোনও গুরুতর পাপ করিয়া শাস্তির ভয়ে ছদ্মবেশে ঘুরিতেছে। তাহারা লোকচক্ষে ধুলি দিবার জন্য যেখানে বসে সেই খানেই ধর্ম্মের মহা আড়ম্বর করে, ধুনী জ্বালে, হোম করে, অঙ্গে ভস্ম প্রলেপন করে, ধর্ম্মের সমুদয় বাহিরের ব্যাপারের অভিনয়

করে, কে বলিবে যে তাহাদের কার্য্য পারমার্থিক কার্য্য? অথবা মনে কর, এক ব্যক্তি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; বহুদিনের পর উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছেন; ধনের মুখ দেখিয়াছেন; তিনি এখন জন-সমাজে সম্ভ্রম লাভ করিতে চান; আপনার ধনগৌরব দেখাইতে চান; বাহবা লইতে চান; তিনি ভাবিলেন জাঁক জমক করিয়া দুর্গোৎসবটা করি, এমন করিয়া প্রতিমা সাজাইব যে কেহ কখনও সেরূপ দেখে নাই—দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইবে। এই ভাবিয়া দুর্গোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করি এটা কি পারমার্থিক কার্য্য? না পরমার্থের নামে লৌকিক কার্য্য? আবার অপরদিকের দৃষ্টান্তও আছে। শ্রীরামপুর-বাসী সুবিখ্যাত আদিম খৃষ্টীয় প্রচারক কেরী সাহেবের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে তিনি ফোর্টউইলিয়ম কালেজের অধ্যাপক রূপে, এবং গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক রূপে জীবনে বহু বহু সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বর্গারোহণ করিলে দেখা গেল, যে তাঁহার ডেক্সে কয়েক আনা পয়সামাত্র আছে। তাঁহার জীবন-চরিতকার গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থের অন্যূন এক লক্ষ ছয়ষট্টি হাজার টাকা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য দান করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি এই মহামনা ব্যক্তির অর্থোপার্জ্জন লৌকিক কার্য্য কি পারমার্থিক কার্য্য? অতএব দেখিতেছি কার্য্যের মধ্যে পারমার্থিকতা বা লৌকিকতা থাকে না; কিন্তু যে ভাবে উক্ত কার্য্য কৃত হয় তন্মধ্যেই থাকে। কিন্তু কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে ধর্ম্মকে যদি

মানবজীবন ও মানবসমাজের মধ্যে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মানব-জীবনের ও মানবসমাজের অনেক ব্যাপারকে পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং তাহা হইলে জীবনধারণ কঠিন হয়; এই জন্যই মনে হয়, ধর্ম্ম ও মানব-সমাজ দুইএ মেলে না।

ধর্ম্ম ও মানবসমাজ এ দুইএ মেলে না, একথা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম যদি বিধাতার বিধান হয়, মানব-সমাজও যদি তাঁর বিধান হয়, তবে উভয়ে মিলিবে না কেন? প্রকৃতির সর্ব্বত্রই দেখি, যেটী স্বাভাবিক, যেটী জগতের পক্ষে, প্রকৃতির বিকাশের পক্ষে, দেহরক্ষার পক্ষে, অত্যাবশ্যক, তাহার সহিত কাহারও বিবাদ নাই। মনে কর অন্নের গ্রাস; তাহার সঙ্গে দেহের আভ্যন্তরীণ কোন যন্ত্রের কি বিরোধ আছে? ক্ষুধার্ত্ত দেহে অন্নের গ্রাসটী যাইবামাত্র দেহের আভ্যন্তরীণ সমুদয় যন্ত্র কিরূপ আগ্রহ ও আনন্দ সহকারে তাহাকে বরণ করিয়া লয়! দন্ত বলে আমি চর্ব্বণ করিয়া পরিপাকের অর্দ্ধেক কাজ করিয়া দিতেছি; মুখের লালা বলে আমি মাখিয়া পরিপাকের কাজ আরও অগ্রসর করিয়া দিতেছি; গ্যাষ্ট্রিক জুস বলে আমি প্রবাহিত হইয়া জঠরানলকে বাড়াইতেছি; যকৃৎ বলে আমি পাকক্রিয়ার জন্য পিত্ত যোগাইয়া দিতেছি। এইরূপে সকল যন্ত্র একবাক্যে সহায় হইয়া কেমন অন্নপিণ্ডকে গ্রহণ করে। কোনও বিষাক্ত দ্রব্য যখন উদরস্থ হয়, এই অন্ন গ্রহণের সহিত তাহার তুলনা কর। মনে কর একজন এক

গ্লাস সুরা উদরস্থ করিল, তাহা হইলে কি ব্যাপার দেখিতে পাও? অমনি দেহের আভ্যন্তরীণ ধাতু ও যন্ত্র সকলের মধ্যে যেন ত্রাস উপস্থিত হয়; সাংঘাতিক শত্রু আসিয়াছে। অমনি গ্যাষ্ট্রীক্ জুস অতিরিক্ত মাত্রায় বহিতে থাকে, যেন সেই রস মিশ্রিত হইয়া ঐ সুরার অনিষ্টকারিত্ব নষ্ট হইতে পারে; অমনি সমুদয় যন্ত্র সেই বিষাক্ত পদার্থকে দেহ হইতে বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে; নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, ঘর্ম্মে, মলমূত্রে, সে সুরা বাহির হইতে থাকে; সকলেই যেন বলিতে থাকে, দূর হ, দূর হ, কাল শত্রু বাহির হইয়া যা। দেহের পক্ষে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুইটী পদার্থের প্রতি দেহের ব্যবহার কিরূপ বিভিন্ন!

কেবল যে দেহের সম্বন্ধেই এইরূপ তাহা নহে; হৃদয়ের সুকোমল ও পবিত্র ভাব গুলির পরস্পরের সহিত কি ঐরূপ সম্বন্ধ নয়? চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে মানব-হৃদয়ের এক প্রকার প্রীতি অপর প্রকার প্রীতিকে পোষণ করে। বর্ত্তমান সময়ে একজন যুগ-প্রবর্ত্তক সাধুপুরুষ বলিয়াছেন, দাম্পত্য প্রেম মানব-প্রেমে উঠিবার সিঁড়ি। ইহা অতীব সত্য কথা। কতবার এরূপ দেখা গিয়াছে, একজন পুরুষ যথেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, ও ধর্ম্মের শাসনের বহির্ভূত রহিয়াছে; সে স্বেচ্ছাচারে কাল কাটাইতেছে; গৃহ ধর্ম্মে মন দেয় না; আত্মোন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই; মানব-সমাজের কল্যাণ বিষয়ে একবার চিন্তাও করে না। এইরূপ কিছুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ

একবার একজন পবিত্র-হৃদয়া পবিত্র-চরিত্রা নারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সৌভাগ্য ক্রমে ঘোর লঘুচিত্ততা ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও তাহার প্রেমের শক্তি একেবারে মরে নাই। সেই নারী তাহার চিত্তকে আবর্জ্জিত করিয়া ফেলিলেন; তাহার নিদ্রিত প্রেমকে জাগাইয়া তুলিলেন; নারীর আদর্শকে তাহার হৃদয়ে উন্নত করিয়া দিলেন! সে আপনার হৃদয়ে এমন কিছু দেখিল, যাহা সে অগ্রে কখনও লক্ষ্য করে নাই। কে তাহার লঘু-চিত্ততা উড়াইয়া লইয়া গেল; তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়া দিল; তাহার মনের অপবিত্রতা হরণ করিয়া লইল। সে আপনাতে নবজীবনের সূত্রপাত দেখিল। ক্রমে প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হইল। সে পুরুষ নবজীবনের দ্বার দিয়া নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। তাহার প্রেমের সুকোমল, সুপবিত্র ও সুস্নিগ্ধ বায়ুতে যতই বাস করিতে লাগিল, ততই তাহার সদ্ভাব সকল ফুটিতে লাগিল। ঈশ্বর, জগৎ ও মানবের সহিত যেন তাহার সন্ধিস্থাপন হইল। সে দেখিল যে সে ঐ নারীর সঙ্গে বাঁধা; তাহারা উভয়ে সন্তান-গুলির সঙ্গে বাঁধা; এবং তাহার পরিবারটী জনসমাজের সঙ্গে বাঁধা; তখন সে জন-সমাজের কল্যাণে আপনার কল্যাণ দেখিতে লাগিল। যতই হৃদয় সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল, ততই শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবের কল্যাণদায়ক সমুদয় বিষয় তাহার প্রিয় হইতে লাগিল। ঈশ্বর দাম্পত্য-প্রেমের রথে আরোহণ করাইয়া নূতন ঘরে আনিলেন; সে গৃহের

হাওয়া ফিরিয়া গেল; দাম্পত্য-প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেই অপর গুণগুলি স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

কেবল দাম্পত্য-প্রেম যে অপরাপর প্রেমকে পোষণ করে তাহা নহে; প্রীতির স্বধর্ম্মই এই যে, এক প্রকার প্রীতি অপর প্রীতিকে পোষণ করে। সন্তান-বাৎসল্য হৃদয়কে কোমল করিয়া প্রতিবাসীর প্রতি সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়; পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি মানব-হৃদয়ে সাধুভক্তি ও ঈশ্বর-ভক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে। খ্রীষ্টীয় প্রচারক সেণ্ট্ পল একস্থানে বলিয়াছেন, "মানুষকে তোমরা চক্ষে দেখ, তাহাকে যদি ভাল না বাসিলে তবে যে ঈশ্বরকে চক্ষে দেখ না, তাঁহাকে কি প্রকারে ভাল বাসিবে?" অনেক সময় দেখা যায় দাম্পত্য-প্রেম, সন্তান বাৎসল্য, পিতৃ মাতৃ ভক্তি প্রভৃতি ঈশ্বর ভক্তিতে আরোহণের সিঁড়ী। এই কারণে মানব-হৃদয়ের ক্রিয়া বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মুখে শোনা যায়, যে ব্যক্তির ভাল বাসিবার কেহ বা কিছু নাই, এজগতে সে দুর্ভাগ্য; ভাল বাসিবার কিছু না থাকা অপেক্ষা কুকুর বিড়াল ভালবাসাও ভাল।

মানব-হৃদয়ের সর্ব্ববিধ প্রীতির যদি অপরাপর প্রীতির সহিত সখ্যভাব থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রীতির কি সে সখ্যভাব নাই? ঈশ্বর-প্রীতি বলিলে এই বুঝি যিনি সেতুস্বরূপ হইয়া সংসারকে ধারণ করিতেছেন, তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন করা; যিনি সকল মঙ্গলভাব, সকল পবিত্র ভাবের আদর্শ, তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন করা। যাঁহা হইতে সংসার, যাঁহার হস্তে সংসার,

যাঁহার প্রিয় সংসার, তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন করিলে সংসারও কি প্রিয় হয় না? ঘরের গৃহিণীকে যদি ভাল বাসি গৃহস্থালির সমুদয় বিষয়ে কি ভালবাসা যায় না? তেমনি মানব-সমাজের বিধাতাকে ভাল বাসিলে মানব-সমাজের প্রতি ভালবাসা যায়। ঈশ্বর-প্রীতির সহিত কাহারও বিরোধ নাই।

বিরোধ থাকা দূরে থাকুক, শরীরস্থ প্রত্যেক যন্ত্র যেমন অন্ন পিণ্ডের সহায়, তেমনি মান-বসমাজের অন্তর্ভূত প্রত্যেক ব্যাপার ধর্ম্ম-সাধনের সহায়। মানব-হৃদয়ের এক একটি প্রীতিকে যদি এক এক খানি বাদ্যযন্ত্রের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, ঈশ্বর-প্রীতি একতান বাদনের মধ্যে সেই বড় অর্গানটীর মত, যাহা অপর সকল যন্ত্রের খোঁচ খাঁচ সামলাইয়া লয়; আবার তাহারাও মিলিয়া অর্গানের ধ্বনিটীকে সুন্দর করিয়া তোলে। অথবা আর একটী উপমা দ্বারা যদি তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে চাও তবে বলি অপরাপর প্রীতি যেন শাখা প্রশাখা, ঈশ্বর-প্রীতি তাহার মূলের রস, যাহা সমুদয়কে পোষণ করে; অথবা অপর প্রীতি-গুলি যেন রবিখন্দ, ঈশ্বর-প্রীতি যেন স্বর্গের শিশির, তাহাদের উপরে পড়িয়া সকলকে জীবন্ত রাখে ও সতেজ করে।

তবে এক স্থানে ঈশ্বর-প্রীতির বিরোধ আছে। পাপের সহিত ইহার চির-বিরোধ। যেমন লঘু চিত্ততার সহিত দাম্পত-্য

ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে জাগে না। আত্ম-সুখেচ্ছা হইতেই পাপ। যে প্রেমাস্পদের সমক্ষে আপনার ক্ষুদ্র সুখকে বড় ভাবিতে পারে, সে প্রেমের কি ধার ধারে? যে বলিতে রাজি আছে—হে আমার প্রিয়! এমন কিছুই নাই যাহা তোমার জন্য ছাড়িতে পারি না—সেই ভক্তি-লাভের অধিকারী। ভক্তিপথের বৈষ্ণব কবিগণ যে বলিয়াছেন—"জগতের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"—ইহা অতীব সত্য কথা। অগ্রে মুক্তি, তৎপরে ভক্তি; ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গৃহে, পরিবারে ও সমাজে ঈশ্বর-প্রীতিকে স্থাপন করিতে গেলে, আমরা যে-সকল প্রীতি-সম্বন্ধে আবদ্ধ আছি তাহার কিছুই ছাড়িতে হয় না; ছাড়িতে হয় ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ও নিকৃষ্ট যাহা। আমরা যে এই সকলের মধ্যে থাকিয়া অনেক সময়ে অধোগতি প্রাপ্ত হই, তাহা এই সকল সম্বন্ধের দোষ নহে; দোষ যে ভাবে ইহাদিগকে ব্যবহার করি তাহার। ধর্ম্মসাধনের আনুকূল্যার্থে ইহাদিগকে বদলাইতে হইবে না; বদলাইতে হইবে হৃদয়ের সুরটাকে। ঈশ্বর করুন আমরা যেন সংসারকে ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র করিয়া লইতে পারি।

সহজ সাধন।—৩য়।

গত দুই বারে এই কথা বলা হইয়াছে যে, সহজসাধনের অর্থ সমগ্র মানবজীবনকে ও মানবসমাজকে ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র মনে করা ; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এদেশে অদ্বৈতবাদ-মূলক ব্রহ্মজ্ঞানের ভাব বহুল-প্রচার হওয়াতে এদেশের উচ্চ ধর্ম্ম সমাজ-বিমুখ হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণের মনে ব্রহ্মজ্ঞানের সমাজ-বিমুখতা বদ্ধমূল থাকাতে, একথা লোকে মানিতে চায় না যে, জন-সমাজকে ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র করা যাইতে পারে। জন-সমাজ ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম-সাধন বলিতে কি বুঝায়, এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধন কাহাকে বলে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, ধর্ম্ম-সাধনের ভাব দুই সম্প্রদায়ের একরূপ নহে। সাধারণতঃ একথা সত্য, যে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি অধিকাংশ সম্প্রদায়ের সাধনের লক্ষ্য। কেবল ভক্তি-পথাবলম্বিগণ মুক্তির অতীত ভক্তির অবস্থাকে সাধনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু মুক্তি সাধারণ ভাবে অধিকাংশের লক্ষ্য হইলেও, তাঁহারা এক একটী বিশেষ ভাবকে সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের অবলম্বিত সাধন-প্রণালী সেই বিশেষ উপায় হইতে নিজের বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি এইরূপ কয়েকটী বিশেষ ভাব প্রদর্শন করিতেছি।

মোটের উপরে এ কথা বলা যায় যে, "অনাসক্তি" বা বিষয়-বিরাগ জ্ঞানপথাবলম্বীদিগের সাধনের লক্ষ্য, "চিত্তশুদ্ধি" কর্ম্মপথাবলম্বীদিগের লক্ষ্য এবং "ভাবাবেশ" ভক্তিপথাবলম্বীদিগের লক্ষ্য। জ্ঞানপথাবলম্বিগণ ক্রমাগত এই চেষ্টা করেন, কিসে বিষয়কে অনিত্য জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া তাহা হইতে চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারেন। যে সকল চিন্তা বা ভাব বিষয়ের অনিত্যতা বোধের অনুকূল, তাহাই তাঁহারা পোষণ করেন; যে সকল পদার্থ তাহার প্রতিকূল, তাহাকে তাঁহারা বর্জ্জন করেন। এই গেল তাঁহাদের সাধন। কর্ম্মিগণ আত্মনিগ্রহ বা চিত্তশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন; এই জন্য তাঁহাদের সাধনে তপস্যার বহুলতা দৃষ্ট হয়। মন যাহাকে প্রিয় জ্ঞান করে, তাহা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা, এবং যাহাকে অপ্রিয় জ্ঞান করে, তাহার সহিত সংযুক্ত করা,—এই সাধনের প্রধান সঙ্কেত। মন কোমল শয্যায় শয়ন করিতে চায়, অতএব তাহাকে লৌহশলাকা-নির্ম্মিত শয্যাতে শয়ন করাও। এইরূপ বার বার প্রিয়ের বিয়োগ ও অপ্রিয়ের সংযোগের দ্বারা সুখাসক্ত মনকে কাবু করিয়া ফেল; সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লও; এই ভাবাপন্ন সাধকদিগের দৃষ্টি সর্ব্বদাই জপ, তপ, উপবাসাদি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের প্রতি থাকে।

তৎপরে ভক্তিপথাবলম্বিগণ; তাঁহারা বলেন, ভক্তিলাভ তাঁহাদের সাধনের লক্ষ্য। ভাগবতে ভক্তির দুইটি লক্ষণ আছে। প্রথম—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।

অর্থাৎ—অন্য বিষয়ে মমতা রহিত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রেমানুগত মমতা উপস্থিত হওয়াই ভক্তি। দ্বিতীয়—

তদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ,
মনোগতিরবিচ্ছিন্না—

অর্থাৎ—গঙ্গার বারি যেমন অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগরাভিমুখে যাইতেছে, তেমনি ঈশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ মাত্র যাঁহার চিত্ত অবিচ্ছিন্ন গতিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হয়, তিনিই ভক্ত।

এই দুইটী লক্ষণই অতি উৎকৃষ্ট। ইহা আধ্যাত্মিকতাতে পরিপূর্ণ, প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতির পরিচায়ক, ও সর্ব্বজনের গ্রাহ্য। কিন্তু মহাত্মা চৈতন্যের আবির্ভাবের পর অবধি ভক্তি বঙ্গ-দেশে যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ভাবাবেশই সাধকগণের লক্ষ্যস্থলে প্রধানরূপে থাকে; অর্থাৎ তাঁহারা ভাবাবেশের দ্বারাই আপনাদের সাধনের সফলতা বিফলতার বিচার করেন; ভাবাবেশের অল্পতা বা আধিক্যের দ্বারা ভক্তের বিচার করেন; এবং ভগবানের নামে ভাবাবেশ না হইলে, আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

এই যে "অনাসক্তি", "চিত্তশুদ্ধি" ও "ভাবাবেশ" এই ত্রিবিধ সাধনের ভাব আছে, তাহা যে ধর্ম্মসাধনের অনুকূল

নহে তাহা কে বলিবে? কিন্তু ইহার কোনওটী বা সম্মিলিত ভাবে তিনটীই 'সমগ্র সাধন নহে; সাধনের অঙ্গ ও অংশমাত্র। সাধনের লক্ষ্য ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, ও বহুদূরব্যাপী।

সাধনের লক্ষ্য কি? এই প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায়,—ঈশ্বরকে লাভ করা বা তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়াই সাধনের লক্ষ্য। এই সামান্য উক্তিটীর মধ্যে অনেক তত্ত্ব নিহিত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরকে লাভ করিতে বা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে গেলেই, আরও কিছু চাই। তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার উপযুক্ত হওয়া চাই। ঈশ্বরে মানবে যোগ, আত্মাতে আত্মাতে যোগ। এক আত্মা অপর আত্মার সহিত কিরূপে যুক্ত হয়? তুমি আমার সহিত কিরূপে যুক্ত হও? আমি তোমার সহিত কিরূপে যুক্ত হই? ভাবিলেই দেখিবে—জ্ঞানে জ্ঞানে যোগ, প্রেমে প্রেমে যোগ ও ইচ্ছাতে ইচ্ছাতে যোগ; এই ত্রিবিধ যোগই আধ্যাত্মিক যোগ। তোমার জ্ঞান যে পরিমাণে আমার জ্ঞানের অনুসারী হয়, তোমার প্রেম যে পরিমাণে আমার প্রেমকে ধরে, তোমার ইচ্ছা যে পরিমাণে আমার ইচ্ছার সহিত মিলে, সেই পরিমাণে তুমি আমার সহিত যুক্ত, তুমি আমার সহিত একীভূত। আমি যদি তোমা হইতে জ্ঞানে বড় হই, প্রেমে বিশাল হই, ও ইচ্ছাশক্তিতে প্রবল হই,—তুমি যে পরিমাণে ফুটিবে, অর্থাৎ যে পরিমাণে জ্ঞানে প্রেমে বাড়িবে, সেই পরিমাণে আমাকে চিনিবে, জানিবে ও ধরিবে; সেই পরিমাণে আমার সহিত

যুক্ত হইবার উপযুক্ত হইবে। ইহা অতি মোটা কথা, যাহা সকলেই বুঝিতে পারে। যদি দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও বিশদ করার প্রয়োজন হয়, তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, রামমোহন রায়। তিনি যে সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, তৎকালের লোকের, এমন কি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তীদিগের, কি তাঁহার সহিত যোগ হইয়াছিল? তাহারা কি সে যোগের উপযুক্ত ছিল? কোথায় ছিল তাঁহার বহু-বিস্তীর্ণ জ্ঞান, আর কোথায় ছিল তাহাদের সংকীর্ণ জ্ঞান! কোথায় ছিল তাঁর উদার বিশ্ব-প্রেমিক হৃদয়, আর কোথায় ছিল তাহাদের সংকীর্ণ প্রেম! তাহাদের মধ্যে কয়জন তাঁহার মহৎ ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? সুতরাং বলিতে হইবে, তাঁহার সহিত তাহাদের অতি অপূর্ণ যোগ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে যত উন্নত, ও অগ্রসর ছিল, তাহার তত অধিক যোগ হইয়াছিল। ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে যোগ তাহাও যেন কতকটা সেই প্রকার। তিনি কোথায়, আর আমরা কোথায়! তাঁহার সহিত আমাদের যোগ সর্ব্বদা অপূর্ণ থাকিবে, অথচ পূর্ণতার দিকে যাইবে— কখনই এই গতির বিরাম নাই। আমাদের জীবন যতই পূর্ণতা, বিশালতা ও গভীরতাতে অগ্রসর হইবে, ততই আমরা তাঁহার সহিত অধিক হইতে অধিকতর রূপে যুক্ত হইব।

পূর্ণতা, বিশালতা ও গভীরতা এই তিনটী শব্দের অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেই আমরা ধর্ম্ম-সাধনের বহুবিস্তীর্ণ ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ে ধারণ করি। পূর্ণতা বলিলেই

শূন্যতার অভাব মনে হয়। পূর্ণ জীবন বলিলে আমরা কি বুঝি? যে জীবনে জ্ঞানের অনেক বিষয় আছে ও অনেক অনুষ্ঠান আছে তাহাই পূর্ণ। এই পূর্ণতার দ্বারাই জীবনের প্রকৃত দীর্ঘতা হয়। অহোরাত্র বা পক্ষ, মাস বা বৎসরের সংখ্যা দ্বারা দীর্ঘতা হয় না। একজন লোক এই কলিকাতা সহরের দশ মাইলের মধ্যেই আছেন, তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু এই অশীতি বৎসরের মধ্যে সহরে আসেন নাই, রেলগাড়ী কখনও চক্ষে দেখেন নাই, এখানকার কোনও চর্চ্চা তাঁহার নিকট পৌঁছে নাই, কোনও উন্নতির সমাচার যায় নাই, কোনও অনুষ্ঠানে তিনি কখনও সহায়তা করেন নাই, অশীতিবর্ষ খাইয়া, শুইয়া, ঘুমাইয়া গল্প করিয়া কাটাইতেছেন;—শূন্য জীবন বলিলে এইরূপ জীবন বুঝায়। এরূপ জীবনের আট বৎসরও যাহা আর অশীতি বৎসরও তাহা। দুই, দশ, বিশ বৎসরের কম বেশীতে আসে যায় না। পূর্ণ জীবন ইহার বিপরীত; তাহা সর্ব্বদাই জ্ঞানের নব নব রাজ্য অধিকার করিতে চাহিতেছে, এবং কার্য্যশক্তিকে নব নব অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করিতেছে। তাহার মূলে প্রবেশ করিলেই দেখা যায়, এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, জীবন ঈশ্বরের গচ্ছিত সম্পত্তি, বিনা ব্যবহারে, বিনা তাঁর কার্য্যে নিয়োগে, এই সম্পত্তিকে নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের নাই; করিলে আমরা অপরাধী।

যে জীবন এইভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা ঈশ্বরের

অভিমুখে ছুটিতেছে; তাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছে; তাঁহাকে ধরিবার উপযুক্ত হইতেছে।

তৎপরে বিশালতা; জীবনের বিশালতার মূলে প্রেম। যাঁহার প্রেম যত বিস্তীর্ণ, যাঁহার প্রেম যতটা অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হয়, তাঁহার জীবন সেই পরিমাণে বিশাল। মানুষ এই পৃথিবীতে দুইভাবে বাস করিতে পারে। প্রথম কূপমণ্ডুকের ন্যায়, স্বখাত একটী কূপের মধ্যে থাকিতে পারে, সেই কূপে বাহিরের যতটুকু আলোক যায়, ততটুকুই ভোগ করিতে পারে; সেই কূপে বসিয়া জগতের যতটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে; অথবা সে মনে করিলে গগন-সঞ্চারী বিহঙ্গের ন্যায় হইতে পারে। মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গম যেমন নানা দেশ দেখে, নানা বৃক্ষে বসে, নানা ফলের রস আস্বাদন করে, নানা উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করে, তেমনি মানুষ উদার প্রেমে বিধাতার এই সুন্দর জগতে যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সকলকে ভাল বাসিতে পারে; প্রেমে সকল দেশের ও সকল শ্রেণীর মানবের উন্নতির সহিত একীভূত হইতে পারে।

ইহার মধ্যে কোন্ ভারটী ঈশ্বরের সহিত যোগের অনুকূল? তাঁহার প্রেম সকলকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; তাঁহার প্রেম পাপীকেও আবেষ্টন করিয়া আছে; তাঁহার প্রেম জগতকে রক্ষা ও পোষণ করিতেছে; তাঁহার প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সমুদয় চরাচরকে প্লাবিত করিতেছে। যাহার প্রেম বিস্তৃত সেই ত তাঁহাকে ধরিবার উপযুক্ত। এই জন্যই বলি,

তাঁহার সহিত যোগস্থাপন করিতে হইলে জীবনের বিশালতা চাই।

যেমন প্রেমের দ্বারা জীবনের বিশালতা হয়, তেমনি আত্ম-দৃষ্টির দ্বারা জীবনের গভীরতা লাভ হয়। অনেক জলাশয়ে দেখি বিশালতা ও গভীরতা এক সঙ্গে থাকে না। মানব-জীবনেও অনেক সময়ে সেই প্রকার ঘটে। হৃদয়কে বহুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করিতে গিয়া আমরা গভীরতা হারাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সভ্য জগতের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ যেন জীবনের গভীরতা-লাভের বিরোধী। বর্ত্তমান সময়ে মানব-সংসার এত দ্রুতগতিতে ছুটিতেছে যে ঘটনা ও জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যেন ছায়াবাজীর ছবির ন্যায় চক্ষের উপর দিয়া যাইতেছে! গূঢ়ভাবে কোনওটীকে দেখিব বা বুঝিব তাহার যেন সময় নাই। সকল বিষয়েই যেন মানুষের মনের ভাব এই—"মোটের উপরে কথাটা কি?" সভ্য জগতের মানুষ যেন সংবাদপত্রের দুইটা স্তম্ভ ভাল করিয়া পড়িবার ধৈর্য্যও হারাইতেছে। সেখানেও যেন, মন "মোটের উপরে কথাটা কি" তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র। আর লোকে যে ধীর ভাবে কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, তাহারও যো নাই, অন্নচিন্তাতে, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উদ্বেগে, সকলের চিত্তই উত্তেজিত। অতএব বর্ত্তমান সময় যেন জীবনের গভীরতা-লাভের অনুকূল নয়।

এখন প্রকৃত কথাটা এই—অনাসক্তি, চিত্তশুদ্ধি বা ভাবা-বেশ, ধর্ম্মসাধনের এই প্রাচীন ভাবই গ্রহণ কর, আর জীবনের

পূর্ণতা, বিশালতা ও গভীরতা-লাভের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া, এই উদার ও অভিনব ভাবই গ্রহণ কর, উভয়ের পক্ষেই জনসমাজ অনুকূল; অনুকূল কেন প্রয়োজনীয়।

প্রথম ধরি অনাসক্তি; সাধনা ও সিদ্ধি এই উভয় শব্দ ব্যবহার করিলেই বুঝিতে হয় তন্মধ্যে একটা সংগ্রাম ও জয়লাভ আছে। সাধক কিছুর জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন ও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন! যেখানে সংগ্রাম নাই সেখানে জয়লাভও নাই। তুমি যে বিষয় হইতে চিত্তকে অনাসক্ত করিবে, তাহার জন্য বিষয়ের সহিত সংগ্রাম চাই। তুমি বনে বসিয়া ভাবিতে পার অনাসক্ত হইয়াছ, কিন্তু যেই বিষয়ের নিকট আসিবে অমনি তোমাকে আসক্তির রজ্জুতে দৃঢ়রূপে বাঁধিবে। এইজন্য গীতার উপদেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;—বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়াই অনাসক্তি অভ্যাস কর। মহাত্মা চৈতন্যের উক্তি বলিয়া এদেশে একটা উক্তি প্রচলিত আছে; তাহা এই—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া,
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।

অতএব অনাসক্তি-সাধনের জন্য জনসমাজের প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি লাভেরও এই প্রধান ক্ষেত্র। চিত্তশুদ্ধির অর্থ আত্ম-সংযম, আপনার মুখে আপনি লাগাম দেওয়া। সংগ্রাম না থাকিলে, প্রলোভনের সহিত সংঘর্ষণ না হইলে, উত্থান ও পতন না দেখিলে, কি দুষ্ট অশ্বরূপ মনকে লাগামের অধীন করা যায়? সে জন্যও জন-সমাজের প্রয়োজন।

তৎপরে প্রেমাবেশ যদি চাও, সেজন্য জনসমাজ সহায়। অগ্রেই বলিয়াছি, প্রেম প্রেমকে পোষণ করে; নর-প্রেম ভগবৎ প্রেমকে গাঢ় ও বর্দ্ধিত করে। ভাল বাসিবার এত বিষয় চারিদিকে রহিয়াছে, আমাদের ভাবনা কি? এমন সুন্দর জগৎ, এমন চিরযৌবনা প্রকৃতি সম্মুখে রহিয়াছে, যাহাতে নয়ন মন দুই হরণ করে, ইহা কি ভালবাসিবার বিষয় নয়? এই প্রকৃতির অনুকৃতি দেখিয়া 'বাঃ বাঃ' করিবার জন্য চিত্রশালিকাতে যাও; যে সুনিপুণ চিত্রকর অবিকল চিত্র করিতে পারে, তাহাকে শিল্পি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা কর; তাহার হস্তের চিত্রাবলী বহু-মূল্যে ক্রয় কর;—আর সকলের আদি যে প্রকৃতি তাহাকে কি ভাল বাসিতে পার না? প্রকৃতিকে যদি ভাল না বাসিলে তবে প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি তাঁহাকে কিরূপে ভাল বাসিবে? সেটা শিক্ষার দোষ যাহাতে মানুষ প্রকৃতিকে ভাল বাসে না! এই প্রকৃতি-প্রেমের মধ্যে অপবিত্র কি আছে? ইহা পবিত্র ভাবের চির উৎস। যাহাতে হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে, সরস করে ও পবিত্র করে, তাহা কি ঈশ্বর-প্রেমে উঠিবার সিঁড়ী নহে? প্রকৃতি-প্রেম ত ঈশ্বরপ্রীতির অনুকূল বটেই, প্রকৃতির প্রতিকৃতি যে শিল্প তাহাও ধর্ম্মসাধনের অনুকূল, এবং প্রকৃতির ছায়া যে সাহিত্য তাহাও ধর্ম্মসাধনের অনুকূল।

প্রকৃতি-প্রেমের ন্যায় নর-প্রেমও হৃদয়ের ভাবের পোষক। দাম্পত্য-প্রেম, স্বজন-প্রেম, সৌহার্দ্দ্য সমুদয় ভাবের উত্তেজক। জনসমাজ না হইলে কি এ সকল পাওয়া যায়?

তবেই দেখিতেছি, প্রাচীন ভাবগুলি সাধনের পক্ষেও জন-সমাজের প্রয়োজন; উদার ও অভিনব ভাবগুলির পক্ষে তাহা কতদূর প্রয়োজন, তাহা বর্ণনাতীত। জীবনের পূর্ণতার অর্থ কি তাহা অগ্রেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার যেটীকে ধরা যাইবে তাহার জন্যই জনস-মাজের প্রয়োজন। জ্ঞানের উপকরণ-সামগ্রী ও জ্ঞান-লাভের উপায় সকল না থাকিলে কি জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-মন্দির, laboratory, মিউজিয়ম, পশুশালা প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্য জগতে জ্ঞান-লাভের যে সকল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে জীবনের পূর্ণতা-লাভের সহায়তা করিতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তৎপরে বিপন্নের বিপদুদ্ধার, রোগীর সাহায্য, দীনজনের রক্ষা, জন-সমাজের স্বাস্থ্য ও নীতির উন্নতি প্রভৃতির জন্য, হাসপাতাল, এসাইলম, সভাসমিতি প্রভৃতি যে স্থাপিত হইয়াছে, সে সকল যে জীবনের পূর্ণতা-লাভের অনুকূল তাহা কে অস্বীকার করিবে? যিনি জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে চান, তাঁহার এগুলির সাহায্য ত্যাগ করিলে চলিবে না।

পূর্ণতার ন্যায় জীবনের বিশালতা-লাভের পক্ষেও জন-সমাজ ও জনসমাজের বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার সকল অনুকূল। বর্ত্ত-মান সময়ে সংবাদপত্র ও তাড়িত বার্ত্তাবহের যোগে জগতের সকল দেশের ও সকল শ্রেণীর মানবের সুখ দুঃখ প্রতিদিন আমাদের হৃদয়-দ্বারে আনীত হইতেছে। প্রাতে উঠিয়াই শুনি কোনও ক্ষুদ্র প্রদেশের অল্পসংখ্যক লোক তৎদেশের

স্বাধীনতারক্ষার জন্য বহুসংখ্যক আততায়ীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, ও অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে; কোথাও বা সমগ্র জাতি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে; কোথাও বা প্রজাগণ অত্যাচারী রাজার হস্ত হইতে স্বীয় অধিকার লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে; কোথাও বা এক দেশের লোক অপর দেশের নরনারীকে দলে দলে ক্রীতদাস করিয়া লইয়া যাইতেছে; অপর এক দেশের লোক দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবার প্রয়াস পাইতেছে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়-ক্ষেত্রে যে দেবাসুরের যুদ্ধের অভিনয় চলিয়াছে, তাহাই বর্দ্ধিত আকারে জগতের মহা রঙ্গভূমিতে প্রতিদিন দেখিতেছি। দেখ আমাদের প্রেমের ক্ষেত্র কত বিস্তৃত। স্পেনদেশে স্বাধীন শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইলে, রামমোহন রায় কলিকাতাতে খানা দিয়াছিলেন; এবং ইটালীদেশের প্রজারা স্বাধীনতার যুদ্ধে হারিয়া গেলে কলিকাতায় বসিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন; আমরাও কি কিয়ৎ পরিমাণে জগতের সমগ্রজাতিকে আপনাদের প্রেমের ক্ষেত্রের মধ্যে লইতে পারি না? আমাদের হৃদয়কে কি কিয়ৎপরিমাণে এরূপ করিতে পারি না যে, যেখানে স্বাধীনতা-লাভের জন্য সংগ্রাম হইতেছে, যেখানে দীনজনের রক্ষার জন্য উপায় হইতেছে, যেখানে অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে, যেখানেই মানবের নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, সে সকলের সঙ্গেই আমরা আছি?

দেখ, বর্ত্তমান সভ্যজগৎ জীবনের বিশালতা লাভের কিরূপ অনুকূল।

সর্ব্বশেষে জীবনের গভীরতা; এক দিকে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান সভ্যজগৎ নির্জ্জন চিন্তারও অনুকূল। একটী বড় সহরে মনে করিলেই তুমি একাকী। যেখানে সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত সেখানে কেহ কাহারও দিকে মন দেয় না। তুমি একেলা বেড়াও, একেলা ভাব, একেলা কাজ কর, একেলা চিন্তা-সাগরে ডোব;—সকলি সম্ভব। কেবল শৃঙ্খলা ও পারিবারিক জীবনের সে প্রকার বন্দোবস্ত চাই। এই কারণে দেখিতেছি, বর্ত্তমান সভ্য জগতের কেন্দ্রস্থানে বাস করিয়া, ক্যাণ্ট, স্পিনোজা কার্লাইল, এমার্সন প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানিগণ, হিমালয়কন্দরবাসী, ঋষিদিগের ন্যায় গভীর ধ্যান ধারণার পরিচয় দিয়াছেন। সজনে চিন্তার উপকরণ সামগ্রী সঞ্চয় কর; নির্জ্জনে গিয়া ধ্যান ধারণা দ্বারা তদ্বিষয়ে চিন্তা কর; এই উভয়েরই বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের সামাজিক ও পারিবারিক বন্দোবস্ত এপ্রকার যে, কাহারই নির্জ্জনবাস ও ধ্যান ধারণার সুবিধা নাই; সুতরাং সে অভ্যাসও নাই। এদেশের সকল কাজই হাটের মধ্যে হয়; ছাত্রগণ গৃহে হাটের মধ্যে পড়ে; বিষয়ী হাটের মধ্যে বিষয়কার্য্য করেন; লেখকগণ হাটের মধ্যে লেখেন; সুতরাং সারবান, মূল্যবান, স্থায়ী কিছুই আমাদের দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে না। জগতের ইতি-বৃত্তে দেখিতেছি, মনুষ্যজাতি সারবান ও মূল্যবান যাহা কিছু

পাইয়াছে, সমুদয় নির্জ্জনবাসের ফল। ভারতীয় ঋষিগণ অরণ্যে বসিয়া উপনিষদ রচনা করিয়াছেন; যীশু অরণ্যমধ্যে একাকী পড়িয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, তাঁহার স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার পাইয়াছিলেন; বুদ্ধ, নিরঞ্জন নদীতীরে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া তাঁহার নবধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন; মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, নব ধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, শেষ কথা এই, আমরা জ্ঞানালোচনা, শিল্প, সাহিত্য, সদনুষ্ঠান, নর-প্রেম, নরসেবা ও নির্জ্জন-চিন্তাদি দ্বারা যতই জীবনের পূর্ণতা, বিশালতা ও গভীরতা লাভ করি, ততই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবার উপযুক্ত হই। এই জন্যই বলি, যে নবধর্ম্ম আমরা ঘোষণা করিতেছি, জন-সমাজই তাহার প্রধান সাধন-ক্ষেত্র; ইহা সর্ব্বতোভাবে সামাজিক ধর্ম্ম এবং জন-সমাজের এমন বিষয় নাই যাহা এ ধর্ম্মসাধনের অন্তর্ভুক্ত নহে।

গভীর অভিনিবেশ ও স্বার্থত্যাগের শক্তি।

বাইবেল গ্রন্থে মহাত্মা যীশুর যে জীবনচরিত পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার প্রধান কথা তাঁহার নিকটস্থ লোকেরা বুঝিতে পারে নাই। স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, তোমরা তাহার প্রজা হও, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কেহ তখন বুঝিতে পারিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। য়ীহুদীরা বুঝিল যে, শাস্ত্রে যে "মেসায়া"র আসিবার কথা আছে, যিনি য়ীহুদি-জাতিকে স্বাধীন করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন, তিনিই আসিয়াছেন। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, যীশু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন না, শত্রুকুলকে বিনাশ করা দূরে থাকুক, শত্রুর প্রতি মিত্র ব্যবহার করিতে উপদেশ দিলেন, তখন তাহারা যীশুর শত্রু হইয়া উঠিল। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার মাথায় কাঁটার টুপী দিয়া বলিল,—"এই দেখ য়ীহুদিদিগের রাজা" এবং অশেষ প্রকারে নির্যাতন করিয়া তাঁহাকে ক্রুশে হত্যা করিল। তাঁহার শিষ্যগণই বা স্বর্গরাজ্যের অর্থ কি বুঝিল? যীশু বলিলেন, স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে, কিন্তু নির্ব্বোধ শিষ্যেরা মনে করিতে লাগিল, প্রভু মৃত্যুর পর পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। তাহারা এই বিশ্বাসে

তাহাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বসিয়া রহিল। এই কল্পিত স্বর্গরাজ্যের প্রলোভনে শত শত নরনারী আপনাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিল; দলে দলে লোক প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিল। ইহার কারণ কি? কি দেখিয়া তাহারা এমন করিয়া ক্ষেপিয়া গেল? যীশুর কথা ত তাহারা বুঝিলই না; একটা ভুল স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করিল। যাহা তাহারা শুনিল, তাহা নাই বা বুঝিল, কিন্তু যাহা তাহারা দেখিল, তাহাতেই একেবারে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিল। ঐ যে যীশুর গভীর অভিনিবেশ ও স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা দেখিল, তাহাতেই তাহারা মোহিত হইয়া গেল।

বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে, যীশু যখন নবজীবন লাভ করিয়া, প্রচার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, তখন পাপপুরুষ সয়তান একদিন তাঁহাকে এক পর্ব্বতোপরি লইয়া গিয়া, চতুর্দ্দিকের জনপদ সকল দেখাইয়া, বলিল, "আমি তোমাকে এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর করিব; পৃথিবীর সকল সম্পদ তোমার হইবে; তুমি স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচার করিও না।" যীশু বলিলেন, "রে সয়তান, তুই দূর হ।" এই রূপকের অর্থ এই যে, যীশু এই স্বর্গরাজ্যকে এমন ভাবে দেখিয়াছিলেন, যে, সমস্ত পৃথিবীর সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল।

যীশু বলিয়াছিলেন, পাখীর কুলায় আছে; পশুর বিবর আছে; কিন্তু তাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই। লোকে

এ কথারও তাৎপর্য্য বুঝিল না। তাহারা বলিল, কি আর স্বার্থত্যাগ? কিই বা ছিল যে ত্যাগ করিয়াছিলেন? ছুতোরের ছেলে, রেঁদা ঠেলিতে ঠেলিতে প্রাণ বাহির হইত; ভারি ত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন! যেমন আমাদের প্রচারকদিগের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কি স্বার্থত্যাগই করিয়াছেন? চাকরী করিয়া খাইলে ত ৩০৲ টাকার বেশী বেতন পাইতেন না! তেমনই লোকেরা তাঁহার কথা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারিল না। কিন্তু যখন তিনি আর জীবনকে জীবন মনে করিলেন না, স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রাণ দিলেন, সেই মৃত্যুর দিন তাঁহার স্বার্থত্যাগ কি তাহা বুঝা গেল; গভীর অভিনিবেশ ও স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা দেখিয়া লোকে মোহিত হইল।

যীশু বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ মন, সম্পূর্ণ হৃদয় ও সম্পূর্ণ শক্তির সহিত ঈশ্বরের অর্চ্চনা কর;" "তোমরা বাহিরের ধূপ দীপ দ্বারা তাঁহার পূজা করিও না;" "তোমরা অপরের কাছে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরকে তদ্রূপ ব্যবহার দিও;" এই কথাগুলি ত নূতন নয়। প্রাচীন য়ীহুদি-শাস্ত্র ট্যালমডে এবং গীতাতে এমন কথা কত আছে; ভগবদ্‌গীতাতে কত কথা আছে; কিন্তু তাহাতে ত কেহ ক্ষেপে নাই; যদি বল ঐ কথাগুলিতেই লোকে মাতিয়াছিল; তবে বলি, উহার অনুরূপ কথা ত সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে; যীশুর কথায় এত শক্তি কেন হইল? তাই বলিতেছি, "ঐ যে গভীর অভিনিবেশ ও

স্বার্থত্যাগের শক্তি, উহাতেই জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মসমাজের শক্তি জীবনের শক্তি। ধর্ম্মসমাজে যদি জীবন না থাকে, গাঢ় অভিনিবেশ এবং স্বার্থত্যাগের শক্তি না থাকে, তাহা হইলে শক্তি থাকে না। যীশুতে এটা ছিল। অগ্নির ব্যাখ্যা ত কতই করা যায়; হাজার অগ্নির দাহিকা শক্তির ব্যাখ্যা কর, তাহাতে ঘরে আগুন লাগে না; একগাছি তৃণও জ্বলে না; কিন্তু একগাছি তৃণের আগুনে এই সহরকে ভস্মীভূত করিতে পারে। তেমনি ব্রহ্মকৃপার ব্যাখ্যায় কিছু হয় না; কিন্তু যদি একটা মানুষের প্রাণে ব্রহ্মকৃপার আগুন জ্বলে, তবে সেই আগুনে আর দশটা হৃদয় জ্বলিয়া উঠে। বিশেষতঃ, যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারে জীবন দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণে যদি আগুন না থাকে, তাহা হইলে কি প্রচার হইবে? প্রচারক হইয়া যখন বসিয়াছি, আমাকে ত ব্রহ্মকৃপার কথা বলিতেই হইবে; কিন্তু এই বলা আর ব্রহ্মকৃপা প্রাণে লাগা, এ দুইয়ে অনেক প্রভেদ! আমরা ইহার প্রমাণের জন্য কি দূরে যাইব? আমাদের জীবনই ইহার প্রমাণ। কোথায় আজ পর্য্যন্ত প্রাণে আগুন লাগিয়াছে, যাহা অপর প্রাণের আগুন থেকে লাগে নাই?

কেহ কেহ বলেন, সেণ্টপল না হইলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইত না; এ কথার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য অবশ্যই আছে। পল সেইকালে তাঁহার স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন; বিদ্যা বুদ্ধিতে তাঁহার সমান কেহ ছিল না;

তিনি যখন যীশুর প্রচারিত স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, তখন সমগ্র হৃদয়ের সহিত সেই স্বর্গরাজ্যকে প্রচার করিতে বাহির হইলেন। তিনি কতবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন; কতবার বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন; কতবার সাগরে ডুবিয়াছেন; কতবার কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন; তিনি সে সমুদয় বিবরণ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই গাঢ় অভিনিবেশ এবং স্বার্থত্যাগের শক্তি দেখিয়া লোকের প্রাণ চমকিয়া গিয়াছিল। প্রচারক জীবনে এই শক্তি চাই। যদি কোথায়ও ইহা আবশ্যক হয়, প্রচারক-জীবনে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপকরণ। ইহা যাহার চরিত্রে জম্মে নাই, প্রচারকের কার্য্যে সে ব্রতী হইতে পারে, কিন্তু সে কখনই প্রকৃত প্রচারক নহে।

আমাদের সাধনাশ্রমে এ কথা বার বার বলা আবশ্যক। প্রগাঢ় অভিনিবেশ এবং স্বার্থত্যাগের কথা এখান হইতে হাজার হাজার নিক্ষেপ কর, তাহাতে একটী পিপীলিকাও মরিবে না; যদি লোকে এখানে প্রগাঢ় অভিনিবেশ ও স্বার্থত্যাগ দেখে, বেশী কথা বলিতে হইবে না; ব্রাহ্মগণ আমাদের প্রতি আর ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আশ্রমের লোকদের দায়িত্ব এই জন্য বেশী যে, তাঁহারা ঈশ্বরের সেবক বলিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কেহ জোর করে নাই, তোমরা আপনা হইতেই বলিয়াছ আপনাদিগকে দিবে; তবে কেন,

তবে কেন,—আলস্য, জড়তা, উদাসীনতা! যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে না বদলাইল, তবে কেন সে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি? আজ লজ্জিত হইবার দিন! আর কেহ ডাকে নাই; ঈশ্বরের প্রেরণাতেই এই মহৎ ব্রত ধারণ। আজ উৎসবের দিনে তাহা ভাল করিয়া স্মরণ করি; এবং লজ্জিত হই। আজ আবার সেই প্রকার অভিনিবেশ ও স্বার্থত্যাগের বিষয় চিন্তা করি; আজ ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া সেই ভাবের জন্য প্রার্থনা করি। এ জীবনে সে বস্তু না পাইলে, অপরের জীবনে তাহা দিতে পারিব না। পরমেশ্বর কৃপা করুন; ভাইভগিনীগণ আমাদিগের জন্য প্রার্থনা করুন; এবং আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মানবজীবনের সার্থকতা।

আমাদের এই মানব-জন্ম কিরূপে সার্থক হয়? এই প্রশ্ন করিলে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিভিন্ন প্রকার উত্তর দিবেন। একজন কর্ম্মপথাবলম্বী নিষ্ঠাবান হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন, "কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই এ সংসারে বাস; বেদোক্ত বিধি সকল পালন করিয়া এখানে পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে, যে পুণ্যের ফলে স্বর্গবাস হইবে; অতএব পুণ্য কার্য্যের আচরণ করাই মানবজীবনের সার্থকতা।"

জ্ঞানপথাবলম্বী বৈদান্তিককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন, "এ জন্মে যদি বিবেক বুদ্ধির উদয় হইয়া জীবের আত্মজ্ঞান জন্মে, তবে সেই জ্ঞানাগ্নি তাহার কর্ম্মের বীজকে নষ্ট করিয়া দিবে। জন্ম কর্ম্মাধীন; কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে আর জন্ম হইবে না; আর তাহাকে এ জগতে আসিতে হইবে না; ইহার নামই মুক্তি; এই মুক্তি-সাধনেই মানবজীবনের সার্থকতা।" পূর্ব্বোক্ত উভয় মতেই দেখা যাইতেছে যে, উভয় শ্রেণীর লোকেই মানবজন্মকে কারাবাসের ন্যায় জ্ঞান করিতেছেন। এই ভাব গ্রহণ করিয়াই এদেশীয় একজন ভক্ত সঙ্গীতে গাইয়াছেন—

"তারা! কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্।"

সংসারটা যদি গারদই হইল, তবে এখানে স্পৃহা করিবার, ভাল বাসিবার, সম্ভোগ করিবার, উপযুক্ত বিষয় কি থাকিতে পারে? বরং যদি কেহ এখানে সম্ভোগ করিবার মত কিছু দেখে তাহা তাহার অন্ধতা, আত্মকল্যাণ-বিমুখতা মাত্র। শুনিয়াছি পোষা হস্তিনীকে দিয়া মানুষ পুরুষ হস্তীকে ভুলাইয়া খোঁয়াড়ের মধ্যে আনে। সে খোঁয়াড়ের মধ্যে আসিয়া স্বচ্ছন্দে কদলীবৃক্ষ আহার করে ও হস্তিনীর সহিত ক্রীড়া করে; একবার ভাবে না, শেষ মুহূর্ত্ত না আসিলে বুঝিতে পারে না, যে, বন্ধন-দশাতে পড়িয়াছে। যে মানুষ এ সংসারে সম্ভোগের বিষয় পায়, এ জীবনকে স্পৃহণীয় মনে করে, এখানকার খেলা ধুলায় ভুলিয়া থাকে, তাহারও দশা যেন কতকটা সেই প্রকার; সে জানে না যে বন্ধনদশাতে পড়িয়াছে। জীবনে সজাগ থাকা, বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া জানা, ও তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় বিধান করাই মানবজীবনের সার্থকতা।

এই গেল মানবজীবনের এক প্রকার ভাব; আস্থাবান খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন, মানবজীবন পরীক্ষার অবস্থা। এই জীবনের এই কয়েকটা বৎসরের সুকৃতি দুষ্কৃতির উপরে অনন্ত জীবনের সুখ বা দুঃখ নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর দেখিতেছেন, সহিতেছেন, সতর্ক করিতেছেন, —মুক্তির পথ বার বার সম্মুখে আনিতেছেন; কিন্তু ঈশ্বরের সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। তিনি আর কত সহিবেন?

ষাটি বৎসর বা আশী বৎসর সহিলেন, তদন্তেও যদি মানুষ তাঁহার প্রদর্শিত মুক্তির পথ অবলম্বন না করিল, তখন তাহাকে অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অতএব এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মতে জীবন থাকিতে থাকিতে ঈশ্বর-প্রদর্শিত মুক্তির পথ আশ্রয় করিয়া, অনন্ত নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাওয়া ও অনন্ত পুণ্য শান্তির অধিকারী হওয়াই জীবনের সার্থকতা।”

ইহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে, যে, এই ভাব যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহারা যাহাকে ঈশ্বর-প্রদর্শিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন, তদ্ভিন্ন জীবনের অপরাপর কার্য্যকে চক্ষে দেখিতে পান না; বরং সর্ব্বদাই এই আশঙ্কাতে বাস করেন, না জানি পাপ-পুরুষ সয়তান কোন্ পথে কোন্ জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে; কোন্ সুখ ভোগ করিতে গিয়া কোন্ ফাঁদে পা দিয়া ফেলি তাহার স্থিরতা নাই। অতএব ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত বিষয় সকল ভিন্ন অপর সকল বিষয়ের প্রতি ভ্রুকুটী করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

এই সকল প্রাচীন ধর্ম্মের শিক্ষা হইতে চক্ষু তুলিয়া যখন বর্ত্তমান সভ্যজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মানবজীবনের আর এক ভাব প্রাপ্ত হই। বর্ত্তমান সভ্যজগতের অনেক জাতি যে প্রকার ভাবে মানবজীবনকে দেখিতেছে ও ব্যবহার করিতেছে, তাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে মনে হয়, তাহারা ভাবিতেছে মানবজীবন যেন নাট্যশালা। নাট্যশালাতে যাহারা যায়, তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য থাকে আমোদ; আমোদ পাইব

ও আমোদ দিব। 'সুখ'শব্দ ব্যবহার না করিয়া যে 'আমোদ' শব্দ ব্যবহার করিতেছি, ইহার মধ্যে একটু অর্থ আছে। সুখ ও আমোদ এই উভয় শব্দে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুখ অতি পবিত্র ও অতি মহৎ হইতে পারে। আমোদ শব্দের সহিত তত পবিত্রতা বা মহত্ত্বের সংস্রব নাই। সুখ অতি দীর্ঘ-কাল স্থায়ী ও অতি গভীর হইতে পারে; আমোদ ক্ষণিক ও অগভীর। যাহারা জীবনকে নাট্যশালার ন্যায় মনে করে, তাহারা সুখ চায় না, আমোদ চায়। তাহাদের ভাব যেন এই —"নাচ, গাও, ক্রীড়া কর; দুঃখ হাসিয়া উড়াইয়া দও; ধর্ম্মাধর্ম্ম চিন্তা পশ্চাতে ফেলিয়া রাখ: এ জীবনে যে যত মজা লুটিতে পারে তাহার জীবন তত সার্থক।"

ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, যে সকল মানুষের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে জীবনের এই ভাব, তাহাদের চরিত্র স্বভাবতঃ অতি অসার হয়।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে মানবজীবনের আর এক প্রকার ভাব আছে, তাহা এই,—জীবন যেন পান্থশালা। জীবনকে পান্থ-শালার সহিত তুলনা করিবার অভিপ্রায় এই,—পান্থশালাতে লোকে দুই ঘণ্টা বা দুই দিনের জন্য থাকে; সেখানে যে সময়ের জন্য থাকে, তন্মধ্যে কিছু ব্যয় করিতে হয়; খাটখানি ব্যবহার করিবে সে জন্য কিছু দিতে হয়; ঘরটীতে থাকিবে সে জন্য ভাড়া চাই; খাদ্যদ্রব্য লইবে তাহার মূল্য চাই; কিন্তু মানুষ যেমন ব্যয় করে তেমনি চায়; মনে ভাবে, আমি ভাড়া

যখন দিয়াছি, তখন ভাল ঘর পাইব না কেন? মূল্য যখন দিতেছি, তখন ভাল খাইব না কেন? দুই তিন দিন পরে ত যাইবই, ইহার মধ্যে যতটা পারি সুখভোগ করিয়া লই। সেইরূপ বর্ত্তমান সভ্য জগতের বহুসংখ্যক নরনারী মনে করে, ভোগের সামগ্রী দিয়াই জীবনের বিচার। কে কি হইল, কে কি করিল, তদ্দ্বারা জীবনের বিচার নহে; কিন্তু কে কত পাইল তদ্দ্বারাই বিচার করিতে হইবে। এই সকল বিষয়াসক্ত লোকের বিচারে বড় লোক কে? কাহার জীবন সার্থক ভাবিতে হইবে?—না, ভোগের সামগ্রী যে যত অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। অমুক বড় লোক, কারণ তাহার সহরে দুই দশখানা বাড়ী আছে; সহরের প্রান্তে দুই খানা বাগান বাড়ী আছে; অন্তঃপুরবাসিনীর গায়ে দুই দশ হাজার টাকার গহনা আছে; তাহার বড় জুড়ী সহর কাঁপাইয়া যায়। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে যে যত বড় বাড়ী করে ও টম্‌টম্ হাঁকায়, সেই তত বড় লোকের দলে প্রবেশ করে। জীবনের আভ্যন্তরীণ উন্নতির দ্বারা জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা নহে; কিন্তু জীবনের বিলাসবিভবের দ্বারাই সার্থকতা। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, জীবনের এই ক্ষুদ্র ভাব, সাংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বর্ত্তমান সভ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এমন কি ধর্ম্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণও ইহার গ্রাস হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

এই নানাশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর মানব দেখিতেছি, যাঁহারা জীবনের একটা মহৎ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপন আপন চরিত্রের মহত্ত্ব সাধন করিতেছেন; তাঁহারা অনুভব করেন যে, জীবন একটা ন্যস্ত সম্পত্তি; ঈশ্বর এই জীবনকে ও এই জীবনের সমুদয় শক্তিকে ন্যস্ত সম্পত্তির ন্যায় আমাদের হস্তে রাখিয়াছেন; আমরা এই সকল শক্তিকে তাঁহার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য দায়ী। ইহাও অতি প্রাচীন ভাব। মহাত্মা যীশু এই ন্যস্ত সম্পত্তির দৃষ্টান্ত দিয়াই শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন,—যে ঈশ্বরদত্ত শক্তি সকলকে বর্দ্ধিত না করে, ও তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ না করে, সে অপরাধী। আর এ কথাও সত্য যে স্বদেশে বিদেশে যে-কোনও মহাজন জগতে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, লোকহিতের জন্য দেহমনকে নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরের ভাব এই ছিল। তাঁহারা জীবনের একটা দায়িত্ব সর্ব্বদা অনুভব করিয়াছেন; জীবনটাকে তাঁহারা অতি উচ্চ চক্ষে দেখিয়াছেন; সর্ব্বদা ভাবিয়াছেন,—যে পরিমাণে এ জীবনকে ঈশ্বর ও মানবের সেবাতে নিয়োগ করিতে পারি, সেই পরিমাণে ইহার সার্থকতা। ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহা পরার্থেই নিয়োগ করিতে হইবে। আমরা সকলেই জানি, এই ভাব মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চালক ছিল। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা; এবং তদনুসারে তিনি কার্য্য করিতেন।

সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারেন যে, এই ভাবাপন্ন মনুষ্যদিগের পক্ষে কর্ত্তব্যশ্রেণীর মধ্যে বাস করাই জীবনের সার্থকতা। কেবলমাত্র নিজের ভোগের জন্য জীবনের যে অংশ ব্যবহৃত হয়, তাহাই অপব্যবহার; তাহা সূক্ষ্ম পাপ। গচ্ছিত সম্পত্তির দুই চারি আনা যে নিজে লয়, সে যেমন অপরাধী, তেমনি এ জীবনে যে নিজের জন্য কিছু চায় সেও অপরাধী। তবে নিজে যে খাই পরি, সুস্থ থাকিবার চেষ্টা করি, সে কেবল ঈশ্বর ও মানবের সেবা করিতে পারিব বলিয়া।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহা জীবনের অতি উচ্চ ভাব। কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম ইহাপেক্ষাও উচ্চ ভাব আনিয়া দেয়। তাহা এই যে, জীবন দেবপ্রসাদ বা মাতৃদত্ত পরমান্ন। দেবপ্রসাদ বলিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। লোকে যখন জগন্নাথক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসে, তখন জগন্নাথের প্রসাদ সঙ্গে আনে; তখন তাহারা কি করে? সমুদয় প্রসাদ কি নিজের উদরে দেয়? না তাহা নয়; প্রসাদ কেবল নিজের জন্য আনে না। নিজেও খায়, অপরের মুখেও তুলিয়া দেয়; যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার মুখে তুলিয়া দেয়। বণ্টন করাই দেবপ্রসাদের সমুচিত ব্যবহার। তেমনি এ জীবন যে কেবল কর্ত্তব্যশ্রেণীর পরম্পরা মাত্র, কেবল পরসেবার আয়োজন মাত্র, কেবল যূথবদ্ধ ভারবাহী জন্তুর ভার বহন মাত্র, কেবল অনুগত ভৃত্যের প্রভুর আজ্ঞা পালন মাত্র, তাহা নহে। ঈশ্বর এ

জীবনকে প্রসাদ স্বরূপ দিয়াছেন, যে আমরা ইহার সুখসম্পদ নিজে ভোগ করিব ও অপরকে বিলাইব।

দেবপ্রসাদ অপেক্ষাও মাতৃদত্ত পরমান্নের দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত। দেবপ্রসাদ যে সব সময়ে মিস্ট হয়, তাহা নহে, তিক্তও হইতে পারে; পর্যুষিত ও দুর্গন্ধময়ও হইতে পারে। দেবপ্রসাদ তিক্ত হইলেও সেব্য ও অপরকে দেয়। কিন্তু মাতৃদত্ত পরমান্ন অন্য প্রকার: মা পায়স রাঁধিয়া দিলে কোনও সন্তান ভাবিতে পারে না যে, তাহা একমাত্র তাহার জন্য। মা পায়স রাঁধিলেই ভাবিতে হইবে, যে তাহা সকলের জন্য। নিজে খাইতে হইবে ও অপরের মুখে তুলিয়া দিতে হইবে। আবার পরমান্নের স্বভাব এই, যখনি খাই মিস্ট; অপরকে খাওয়াইলে আরও মিস্টতা; আবার মার সমক্ষে বসিয়া সকলে খাইলে তদধিক মিস্টতা। জীবন যেন কতকটা সেইরূপ। এই জীবন জগজ্জননীর প্রেমের নিদর্শন; ইহা তাঁহার প্রদত্ত পরমান্ন। একা খাইতে নাই, বণ্টন করিয়া খাইতে হয়। অপরে খাইবে, আমি কেবল যোগাইব তাহা নহে; আমিও খাইব, অপরেও খাইবে। কেবল তাহাও নহে; আমি যে এ জগতে আসিয়াছি ও রহিয়াছি, আমি অপর দশজনের জীবনকে মিস্ট করিয়া দিব এই জন্য; আমি জগতে মিস্টতা পরিবেশন করিব। আমি যখন এখান হইতে চলিয়া যাইব, যাঁহাদের মধ্যে এত দিন বাস করিতেছিলাম, তাঁহারা যেন অনুভব করেন, তাঁহাদের জীবনকে মিস্ট করিবার

উপযুক্ত একজন মানুষ চলিয়া গেল। আমরা প্রত্যেকে যেন অপরদিগকে বলিতে পারি, তোমরা চাহিয়া দেখ, আমার জীবন মাতৃদত্ত পরমান্ন।

অলঙ্কার পরিহার করিয়া বলিলে, বলিতে হয়, জগদীশ্বর এই জন্য আমাদিগকে এ জীবন দিয়াছেন যে, এখানে থাকিয়া তাঁহাকে জানিয়া, ও তাঁহাকে প্রীতি করিয়া, আমরা সুখী হইব; এবং অপর সকলকে হৃদয়ের প্রীতি দিয়া সুখী করিব। অবশ্য একথা সর্ব্বদাই স্মরণীয়, যে নিজে সুখী হইতে না পারিলেও, অপরকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু প্রেমের এমনি মহিমা যে অপরকে সুখী করিতে গেলেই মানুষ নিজে সুখী হয়। ঈশ্বর মানুষকে প্রচুর সুখ দেন বটে, কিন্তু চাহিলে দেন না। তিনি এই এক আশ্চর্য্য নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যে, যে আপনার সুখ চায়, তাহার সুখ উবিয়া যায়; যে আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অপরকে সুখী করিতে চায়, সে অপরকে সুখী করে নিজেও সুখী হয়।

তবে এই প্রকারে উপসংহার করা যাইতে পারে, যে যিনি প্রীতি ও ভক্তিযোগে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া নিজ, হৃদয়ের প্রীতি দিয়া, অপর সকলের জীবনকে সুস্থ, সুখী ও উন্নত করিতে পারেন, তাঁহার জীবন সার্থক।

এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলে, মানবজীবনের সকল প্রকার অস্বাভাবিক ভাব হৃদয় হইতে চলিয়া যায়; এবং এই জীবনের

জন্য ও এই জগতের জন্য হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উদয় হয়; যাহা মানষের পক্ষে স্বাভাবিক তাহা ধর্ম্মের অনুগত হয়; যাহা ধর্ম্মের অনুগত তাহা স্বাভাবিক হয়; এবং জীবনের কর্ত্তব্য সকল মিষ্ট হইয়া যায়। আমরা যত দিন জগতে আছি, তত দিন মহাসংকটে বাস করিতেছি; পদে পদে ধর্ম্মধন হারাইবার আশঙ্কা; এই ভাব হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকাতে অনেক মানুষ এ জগতের ঈশ্বরপ্রদত্ত নির্দ্দোষ সুখ সকলও ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারে নাই; অকারণ অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে; এবং অকারণ নিজ নিজ প্রকৃতির সহিত বিবাদ বাধাইয়াছে। এই ভাব হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া মানবজীবনকে স্বাভাবিক চক্ষে দেখা আবশ্যক হইয়াছে। আমরা এখানে সঙ্কটের মধ্যে বাস করিতেছি না; কিন্তু পিতার ও মাতার গৃহে বাস করিতেছি। আমাদিগকে সুস্থ, সুখী ও উন্নত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তবে কেন ভয়ে ভয়ে বাস করিব? তিনি কি একখানি খাতা খুলিয়া বসিয়া আছেন, যেই আমাদের একটু ভুল ভ্রান্তি হইতেছে, বা পা পিছলাইতেছে, অমনি তাহা জমার ঘরে লিখিয়া রাখিতেছেন? তিনি এমন করিয়া আমাদের অপরাধ ত্রুটি ধরিলে কে বাঁচিতে পারে? আমরা যখনি অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিতেছি, তখনি কি তাঁহার বাণী শুনিতেছি না, "যাও যাও আর কাঁদিও না, এমন কাজ আর করিও না"? জীবনের এই ভাব বলে, 'উন্নতির প্রতি আশা রাখ; পাপকে চিরসঙ্গী মনে করিও না।" ঈশ্বর করুন, এই আশা,

বিশ্বাস, ও সুস্থতার ধর্ম্মে আমরা যেন চিরদিন বাস করিতে পারি।

বিনয় ও শ্রদ্ধা।

বল দেখি মানুষ কখন আপনাকে একাকী বোধ করে?—আমি বলি প্রথমতঃ গভীর সুখে মানুষ একাকী হয়। যে সুখটা সমুদয় চিত্তকে আপ্লুত করে, হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সিক্ত করে, মর্ম্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, সে সময়ের জন্য আর সমুদয় অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষাকে তিরোহিত করে,—সে সুখে মানুষকে একাকী করে; অর্থাৎ, তাহার অগ্রে কে, বা পশ্চাতে কে, বা পার্শ্বে কে, তাহার পদ বা গৌরব কি, তাহার ক্ষমতা বা প্রভুত্ব কি, এ সমুদয় ভুলাইয়া দেয়; অদ্ভুত তন্ময়তার আবেশে তাহাকে আচ্ছন্ন করে; তাহার মনকে যেন গ্রাস করে, মগ্ন করে ও পরিব্যাপ্ত করে!—ইহাকেই বলে সুখের একাকিত্ব। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। আপনাকে কল্পনার সাহায্যে পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পূর্ব্বে লইয়া যাও; কল্পনার বলে একখানি ছবি চিত্রিত কর; মনে কর ভারতসাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পতি প্রিন্স কনসর্ট আলবার্ট বহুদিন বিদেশে ভ্রমণে যাপন করিয়া, ইংলণ্ডে স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যার সন্নিধানে ফিরিয়া আসিয়াছেন; এবং ভিক্টোরিয়া ধাবিত হইয়া তাঁহার আলিঙ্গন পাশের মধ্যে পড়িয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তে কি দেখিতেছ? তখন ভিক্টোরিয়া একাকী কি না? অর্থাৎ তখন কি তাঁর ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডের প্রজা, রাজমুকুট বা রাজগৌরব, কিছু

মনে আসে? সেই গভীর প্রেমের উদ্বেলিত মুহূর্ত্তে, সেই পতিপত্নীর সম্মিলন ক্ষেত্রে, আলবার্ট ও ভিক্টোরিয়া অথবা ঐ অরণ্যবাসী সাঁওতাল ও তাহার পত্নীতে প্রভেদ কি? কেবল যে সম্মিলনের ব্যাপারটাতে প্রভেদ নাই, তাহা নহে; ভিক্টোরিয়ার হৃদয়-নিহিত ভাবেও প্রভেদ নাই: প্রভেদ থাকিলে হৃদয়ে প্রেম নাই, এবং পতিসমাগমে মনে আনন্দ নাই। কেহ হয় ত বলিতে পারেন, ভিক্টোরিয়ার ঐ আনন্দের মধ্যে একাকিত্ব কৈ? এখানেও ত দুই জন; আর একজনের সত্তাতেই ত এই আনন্দ! নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, দ্বিত্বজ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আনন্দের প্রকৃত সান্দ্রতা হয় না। ঐ একজন আর এই আমি একজন, এরূপ উৎকট দ্বিত্বজ্ঞান ঘনীভূত প্রেমের বিরোধী। প্রেমের স্বধর্ম্ম একীভূত করা; এক অপরে মিশিলে, পশিলে, ডুবিলে ও তাহার সহিত একীভূত হইলেই, সান্দ্রানন্দ উথলিত হয়। ঐ সান্দ্রানন্দের মুহূর্ত্তে রাজ্যেশ্বরী রাণী, শ্রীসম্পদ্, রাজগৌরব, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রভুত্ব সমুদয় ভুলিয়া, একাকিনী; সে সমুদয় একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির অঙ্গের বস্ত্রের ন্যায় খসিয়া পড়ে, তিনি জানিতেও পারেন না। রাজ্যেশ্বরীর দৃষ্টান্ত এই জন্য দিলাম যে সান্দ্রানন্দের একাকিত্ব ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

যেমন হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলনের সুখে মানবাত্মা সকল ভুলিয়া যায়, তেমনি জ্ঞানিগণ গভীর জ্ঞানালোচনাতে যখন

তন্মনস্ক হন এবং তজ্জনিত সুখে তাঁহাদের চিত্তকে আপ্লুত করে, তখনও তাঁহারা একাকী হন; বাহ্যজগতের শ্রী-সম্পদ্ পদগৌরব ভুলিয়া যান। এক পুরাতন দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসে এরূপ কথিত আছে যে রোমানগণ একবার সিসিলি দ্বীপস্থ সাইরেকিউজ নগর আক্রমণ করে। তখন সে নগরে আর্কিমিডিস নামে এক মহাজ্ঞানী বাস করিতেন। সে সময়ে তিনি বিজ্ঞান কৌশলের দ্বারা নগর রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। রোমীয় সেনাপতি বলিয়া দিয়াছিলেন, নগরবাসীদের মধ্যে যে বশ্যতা স্বীকার না করিবে তাহাকেই হত্যা করিবে, কেবল আর্কিমিডিসকে হত্যা করিবে না। এই জন্য রোমীয় সৈন্যগণ অগ্রে প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তাহাকে হত্যা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা আর্কিমিডিসের নিকট উপস্থিত। তিনি তখন অঙ্ক শাস্ত্রের একটি কঠিন সমস্যা লইয়া ব্যস্ত আছেন; নানা প্রকার অঙ্কপাত করিয়া একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছেন। শত সহস্র ব্যক্তির প্রাণ যাইতেছে; নগর রক্তস্রোতে ভাসিতেছে; চারিদিকে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে; সংগ্রামের ধ্বনিতে গগন ফাটিতেছে; সে সব দিকে তাঁহার চিত্ত নাই; তাঁহার চিত্ত ঐ সমস্যার আনন্দে নিমগ্ন। রোমীয় সৈনিক আসিয়া নিষ্কোষিত অসি তাঁহার উপরে ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে? তোমার নাম কি?" আর্কিমিডিস বিরক্তি-সূচকস্বরে বলিলেন, "স্থির হও, আর একটু বাকি আছে।" এই উত্তর শুনিয়াই অস্ত্র

সৈনিক তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। দেখ জ্ঞানানন্দের কেমন একাকিত্ব-বিধানের শক্তি !

কেবল যে গভীর সুখেই মানুষকে একাকী করে তাহা নহে ; গভীর দুঃখেও একাকী করে। কিছুদিন হইল আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, রুষিয়ার সম্রাটের বংশধর ও সমগ্র সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজকুমার হঠাৎ গতাসু হইয়াছেন। ইহার পরেই শুনিলাম সম্রাট সাম্রাজ্যভার হস্তান্তরে ন্যস্ত করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইতে চাহিতেছেন। ইহার ভিতরের কথা কি আমরা বুঝিতে পারি না ? গভীর শোকের মুহূর্ত্তে মানুষের সম্পদ ঐশ্বর্য্য, পদ-গৌরব এ সকল কি মনে থাকে ? পুত্রবিয়োগে গরীবের মা ধূলায় পড়িয়া কাঁদে, রুসিয়া সাম্রাজ্যেশ্বরী কি তেমনি কাঁদে না ? গভীর শোকে মানুষকে একাকী করিয়া দেয় ; বিষয় বিভব ভুলাইয়া দেয় ; গর্ব্বিত মস্তককে ধূলায় ধূসর করিয়া দেয়।

গভীর শোকের ন্যায় অপরাপর মানসিক ক্লেশেরও একাকী করিবার শক্তি আছে। কেবল তাহাও নহে : শারীরিক ব্যাধিতেও মানুষকে অনেক সময়ে একাকী করিয়া থাকে। যিনি দারুণ শূল বেদনাতে ছট ফট করিতেছেন, তিনি দরিদ্রের জীর্ণ কন্থাতে না শুইয়া, দুগ্ধফেননিভ শয্যাতে শুইয়া আছেন ; ইহাতে তাঁহার কি পরিতোষ ? আপনাকে কি একাকী ও অসহায় মনে করেন না ? বরং এই কথাই কি সত্য নয় যে, সেই মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার শ্রীসম্পদের কথা দৈবাৎ স্মরণ হয়, তাহা

হইলে তাঁহার চিত্ত বিরক্ত ও উত্যক্ত হইয়া বলে,—"দূর হোক্ বিষয় বিভব ! ও ছাই থাকিয়া আমার কি ? এখন যে প্রাণ যায় ?"

শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশের ন্যায় পাপবোধ ও আধ্যাত্মিক অভাববোধেও আত্মাকে একাকী করিয়া দেয়। মানুষ আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য সমুদয় ভুলিয়া যায়। বরং যদি এ সকল স্মরণ হয়, তাহা হইলে মন অবজ্ঞার সহিত এ সকলকে উপেক্ষা করিতে থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার-ত্যাগে উন্মুখ হইয়া স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, "যদি তুমি ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষা কর, আমাকে বল আমি তাহা তোমাকে দিব"; তখন মৈত্রেয়ী উত্তর করিলেন,—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"।

অর্থাৎ, যদ্দ্বারা আমি পরিত্রাণ লাভ করিতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? ধন সম্পদকে তিনি উপেক্ষা করিলেন। ভগবদ্গীতাতে দেখি, অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিতে দাঁড়াইয়া যখন পাপ-ভয়ে ভীত হইলেন, তখন কৃষ্ণকে বলিলেন,—

"ন চ শ্রেয়োনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ"॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া কল্যাণ দেখিতেছি না ; আমি জয় চাই না, আমি রাজসম্পদ ও তৎসংক্রান্ত সমুদয়

সুখের প্রত্যাশা রাখি না। আত্মার সদ্গতির সহিত তুলনায় জয়শ্রী বা রাজ্যসম্পদ্ তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল।

আমরা কি নিজ নিজ অন্তরে অনেকবার অনুভব করি নাই, যে, যখনি আমাদের চিত্ত স্বকৃত কোনও দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে, তখন আমরা ঘোর একাকী হইয়া পড়ি? বহু জনাকীর্ণ নগর বিজন অরণ্য সমান মনে হয়; বোধ হয় যেন ঘোরারণ্য মধ্যে একাকী কাঁদিতেছি, কেহ কোথাও নাই। বরং ইহা কি তখন প্রত্যক্ষ করি নাই যে, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা যত অধিক, এবং যে অপরাধটী হইয়াছে সেটি যত ক্ষুদ্র, যাতনাটা তত অধিক হয়? মন অধীর হইয়া বলিতে থাকে, "হায়, আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতা থাকিয়া কি হইল? আমি ত এই একটি ক্ষুদ্র প্রলোভনকেও অতিক্রম করিতে পারিলাম না"!

কেবল যে স্বকৃত দুষ্কৃতির চিন্তাতেই মানুষকে ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা নহে, নিজের সম্মুখস্থ আদর্শের সহিত আপনাকে তুলনা করিয়া যে হীনতা অনুভূত হইতে থাকে, তাহাতেও আত্মাকে একাকী করে; বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতা, সমুদয় ভুলাইয়া দেয়। যদি বা ঐ সকল স্মরণ হয়, মন বলিতে থাকে—"আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতার মুখে ছাই, আমি কি মানুষ!"

এই যে আত্মার নিজের হীনতা-বোধের মুহূর্ত্তের একাকিত্ব, এই যে আপনাকে দুর্ব্বল জানিয়া তাহার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়া,

ইহাকে বলে দীনতা বা বিনয়। দীনাত্মাতে এক প্রকার শৈশব-সুলভ সরলতা আছে, যাহা অতীব স্পৃহণীয়? জ্ঞানাভিমান বা বিদ্যাভিমান বা বুদ্ধির অভিমান সেখানে নাই। সে চিত্ত আপনাকে আপনি হীন জানিয়া সর্ব্বদাই নত। প্রকৃত দীনতার দৃষ্টান্ত সকল ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে রূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। রূপ ও সনাতন দুই ভাই উচ্চ রাজকীয় পদ ত্যাগ করিয়া দীনের দীন হইয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস ধনীর সন্তান, রাজবিভব পায়ে ঠেলিয়া, কুকুরের ন্যায় পাত কুড়াইয়া খাইতে লজ্জা বোধ করিতেন না।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ে সেণ্টপলের দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। পল নিজের বিদ্যা ও সম্ভ্রমে স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে এরূপ উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, যে যখন তিনি তরুণবয়স্ক তখন সমাজ-পতিগণ তাঁহাকে সমুদয় খ্রীষ্টীয় নরনারীকে ধৃত করিবার অধি-কার পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে য়িহুদী শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া জানিতেন। কেবল য়িহুদী শাস্ত্রে নহে, তিনি তৎকাল প্রচলিত গ্রীক বিদ্যাতেও এরূপ অগ্রসর ছিলেন যে, যে রোমান রাজপুরুষগণ য়িহুদীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ফেষ্টস্ (Festus) বিচারালয়ের মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার অতিরিক্ত বিদ্যা থাকাতে তুমি পাগল হইয়াছ।" ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে! যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতাতে এত অগ্রগণ্য ছিলেন, সেই

পলকে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ওই সকলকে অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'আমি যদি পাপী নই, তবে পাপী কে? "হায় রে, হতভাগ্য আমি! কে আমাকে এই পাপময় মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে?" এত যাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতা, মানুষ তাঁহাকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় সহর হইতে সহরে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, চোর ডাকাতের ন্যায় হাতে দড়ি দিয়াছে, নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিয়াছে, তিনি অম্লানচিত্তে সকলই সহিয়াছেন! এই খানেই সেণ্টপল, এইখানেই বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্মদাতা, এইখানেই এই লোকটীর মহত্ত্ব! এই জন্যই পলকে ভালবাসি; তাঁহার কথা যখন শুনি, তখন মনে হয়, উত্থান পতনে আন্দোলিত একটা হৃদয় তদ্রূপ আর এক হৃদয়ের সহিত কথা কহিতেছে।

যে আধ্যাত্মিক অবস্থার এক পৃষ্ঠের নাম দীনতা বা বিনয় তাহার অপর পৃষ্ঠের নাম শ্রদ্ধা। পতি পত্নীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, বিনয় শ্রদ্ধার মধ্যে সেই সম্বন্ধ: যেখানে বিনয় সেইখানেই শ্রদ্ধা। তোমার ঘাড়টা যদি বুদ্ধির অভিমানে বা বিদ্যার অভিমানে বা ধর্ম্মের অভিমানে উঁচু হইয়াই রহিল, তবে আর আমার কথা শুনিবে কি? জগতে কি ভাল লোক নাই, ভাল কথা নাই?—ঢের আছে; কিন্তু কার জন্য আছে?—বিনয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যই আছে।

বিনয় শ্রদ্ধাতে মানব-চরিত্রে দুইটী গুণ প্রধানরূপে পোষণ

করেঃ—প্রথম গুণ উন্মুখতা; অর্থাৎ, ইহাতে মানবচিত্তকে উপদেশ পাইবার জন্য, সাধুতাকে আদর করিবার জন্য, সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা উপকৃত হইবার জন্য উন্মুখ করে। তাড়িতের যেমন সঞ্চালক আছে, এই উন্মুখভাবও তেমনি সাধুতার সঞ্চালক। ইহাকে অবলম্বন করিয়া এক হৃদয়ের সাধুতা অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। বিনয়-শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ ও উপদেষ্টার অভাব কখনই হয় না। স্পঞ্জ যেমন চারিদিকের জল শুষিয়া লয়, তেমনি তাঁহার মন চারিদিক হইতে উপদেশ শুষিয়া লইতে থাকে। প্রত্যেক দিন প্রাতে সংবাদপত্র তাঁহার জন্য উপদেশ সকল বহন করিয়া আনে। ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধুচরিত্রের ত কথাই নাই! সংবাদপত্রের কয়েকটী পংক্তিতে কোনও সাধুজনের উক্তি বা কোনও সদনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাঁহার চিত্ত আনন্দ-রসে প্লাবিত হয়, মন উন্নত হয়, এবং সাধুতার আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এমন কি অসাধু ব্যক্তিদিগের অসাধুতাও তাঁহার সাধুতা-প্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করে। এই সকল পথ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে হইবে এবং ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন হইতে হইবে, অসাধুতা হইতে তিনি এই উপদেশই প্রাপ্ত হন। এরূপ ব্যক্তির নিকট কোনও ভাল কথা ছোট কথা নহে, কোনও উৎকৃষ্ট বিষয় লঘুভাবে উড়াইবার জিনিষ নহে।

উন্মুখ-ভাবহীন ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার গর্ব্বিত

চিত্ত কোনও স্থানে উপদেশ পাইবার মত কিছু দেখে না। সাধুচরিত্রের কীর্ত্তন করিয়া সকলে 'আহা আহা' করে, তাহার মন গোপনে গোপনে বলে—"কৈ, আমি ত এমন কিছু দেখি না যাহাতে এতটা আহা আহা করা যায়!" সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া লোকে পদ্গদ হয়, তাহার পড়িতে বা শুনিতে ধৈর্য্য থাকে না। সে উপাসনা মন্দিরে যায়; অন্যে উপকৃত হয়, তাহার মন বলে "ও ত পুরাতন কথা, ঢের শুনেছি।" এইরূপে বিনয় শ্রদ্ধার অভাবে সর্ব্বত্রই সে বঞ্চিত হয়। অপরাপর ব্যাধি অপেক্ষা এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই আপনাদিগকে নীরোগ মনে করে এবং যদি কেহ তাহাদিগের ব্যাধি দেখাইয়া দেয়, তবে তাহা সহ্য করিতে পারে না।

বিনয় শ্রদ্ধা যেমন উন্মুখ ভাব আনিয়া দেয়, তেমনি মানব-চরিত্রে আর একটি গুণকে উদিত করে; তাহা ষট্‌পদবৃত্তি। ষটপদবৃত্তি কাহাকে বলে তাহা একটু ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। ভাগবতে একস্থানে আছে :—

"অণুভ্যশ্চ মহদ্‌ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
অসারাৎ সারমাদত্তে পুষ্পেভ্য ইব ষটপদঃ।"

অর্থাৎ ষটপদ বা ভ্রমর যেমন পুষ্পের অসার ভাগ পরিহার করিয়া সারভাগ যে মধু তাহাকেই গ্রহণ করে, তেমনি ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্রের অসার ভাগ হইতে সারকেই সংকলন করেন।

হংস নীরকে ফেলিয়া ক্ষীরকেই গ্রহণ করে, ভ্রমর বিষকে

বর্জ্জন করিয়া অমৃতকেই আহরণ করে। ইহার ঠিক বিপরীত একটী বৃত্তি আছে, তাহা মক্ষিকাবৃত্তি। তোমার সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোথায় ক্ষত স্থানটী আছে, মক্ষিকা তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবে ও তাহাতেই বসিবে। মানব-সংসারেও দুই চরিত্রের লোক দেখি, কেহ বা মক্ষিকার ন্যায়, কেবল ক্ষতই অন্বেষণ করে, অপরের গুণভাগ ভুলিয়া দোষভাগ দেখিতে ও ও কীর্ত্তন করিতে সুখ পায়, সর্ব্বদা পর দোষের চর্চ্চাতেই থাকে; আর কেহ বা ষটপদের ন্যায় দোষকে ভুলিয়া গুণই দেখে, অপরের গুণের চিন্তাতে সুখী হয়, অপরের গুণের আলোচনাই ভাল বাসে এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হয়। যদি আমাকে কেহ দুই কথায় সাধুর লক্ষণ দিতে বলেন তবে আমি বলি—যিনি মানুষের দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক দেখিতে পান, তিনিই সাধু। যে সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজন জগতে বিশেষ-ভাবে সাধুনামে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষত্ব কোথায়? তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, যেখানে অপরে শুষ্ক বালুকাময় মরু দেখিয়াছে, তাঁহারা দেখিয়াছেন তাহার মধ্যে সুশীতল বারির উৎস লুকাইয়া আছে; যেখানে অন্যে পাপের দুর্গন্ধময় পঙ্কিল হ্রদ দেখিয়াছে, তাঁহারা সেখানে দেখিয়াছেন নবজীবনের আশা। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহা-দের অসীম আশাশীলতা ছিল; এই জন্যই তাঁহারা মানব প্রকৃতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এমন কি মানুষ নিজে আপনাতে যে জিনিষটুকু দেখিতে পায় নাই, তাহা

তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন ও সেইটুকুকেই সমুচিত শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন। একজন কুলটা নারী যীশুর চরণ প্রক্ষালন করিতে আসিলে, তাঁহার শিষ্যেরা বাধা দিল; যীশু বলিলেন, "আহা, বাধা দিও না, উহার প্রেম ও ব্যাকুলতাই উহাকে উদ্ধার করিবে"; সে নারী ভাবিল "তবে ত আমারও উদ্ধার আছে"; অমনি তাহার মনে আশা জাগিল, সেই সঙ্গে নবজীবনও জাগিল। এই গুণগ্রাহিতাই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। মানুষ ষটপদবৃত্তিসম্পন্ন হইবে কি মক্ষিকাবৃত্তিসম্পন্ন হইবে, তাহার অনেকটা অভ্যাসের উপরে নির্ভর করে। যদি মানুষ এমন স্থানে বা এমন সঙ্গে বাস করে, যেখানে পরের দোষের সমালোচনাই অধিক হয়, তবে তাহার অন্তরের বিনয় শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। যে গৃহের অভিভাবকগণ অসাবধানতা বশতঃ বালক বালিকাদিগের সমক্ষে তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র ব্যক্তিদিগের দোষের সমালোচনা করেন ও সর্ব্বদা পরচর্চ্চাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সে গৃহের বালক বালিকারা বিনয়-শ্রদ্ধাহীন, পরছিদ্রান্বেষী ও আত্মম্ভরী হইয়া উঠে।

বিনয় শ্রদ্ধাহীন চরিত্রে গভীরতা থাকে না; বিনয়-শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জন্মে না। এই জন্য সকল দেশের ঈশ্বর-প্রেমিকগণ বার বার বলিয়াছেন, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের দ্বারে দীনতা। যে প্রাণের ব্যাকুলতাতে আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, পদ, গৌরব, ক্ষমতা, যোগ্যতা সমুদয়কে তুচ্ছ মনে করে না, ধর্ম্মরাজ্য তাহার জন্য নহে; সদুপদেশ, সাধুচরিত্র, সৎপ্রসঙ্গ, সৎসঙ্গ কিছুই

তাহার হৃদয়ে কাজ করে না। আমরা একবার স্বীয় স্বীয় হৃদয় পরীক্ষা করি। আমাদের অন্তরে কি প্রকৃত ব্যাকুলতা আছে? তাহা হইলে দীনতাও থাকিত, তাহা হইলে পরচর্চ্চা অপেক্ষা আত্মপরীক্ষাতে অধিক সময় দিতাম, এবং ভগবৎকৃপার প্রার্থী হইয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিতাম।

আশা, আনন্দ ও বল।

সময়ে সময়ে একটা কথা বড়ই মনে হয়। সে কথাটা এই ঃ—মনে কর, একজন একটী উদ্যান করিযাছেন; নানা দেশ হইতে অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট ফলের গাছ আনিয়া তাহাতে রোপণ করিয়াছেন; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, একটী ফলের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। মাটীতে কিরূপ দোষ আছে, অথবা বৃক্ষের মূলে কিরূপ কীট লাগে, যে জন্য বৃক্ষগুলি ভাল করিয়া বাড়ে না; এবং যদিও বা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, তাহাতে ফল ধরে না। ইহা দেখিলে সকলে কি বলেন? সকলেই কি বলেন না, মাটী "খুঁড়িয়া দেখ, মূলে কি দোষ আছে, নূতন মাটী লাগাও, ভাল করিয়া সার দেও; যে বৃক্ষে কিছু হইবে না, যাহাতে সাংঘাতিক রোগ লাগিয়াছে, তাহাকে উৎপাটন করিয়া ফেল; নূতন বৃক্ষ বসাও, তবে উদ্যান ভাল হইবে?" সেইরূপ যদি দেখিতে পাই, একটা ধর্ম্মসমাজ রহিয়াছে, নরনারী নিয়মিতরূপে উপাসনাতে আসিতেছে, যাইতেছে, বাহিরে দেখিতে সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা করিতেছে; অথচ, জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন নাই, চরিত্রে কোনও সুফল দেখা যাইতেছে না, তাহারা সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা হইতে জীবনের সংগ্রাম মধ্যে যে কোনও সহায়তা পাইতেছে এরূপ মনে হয় না; বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, তাহাদের কোনও

মানুষ যে গড়িয়া উঠিতেছে, ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা লাভ করিতেছে, বিশ্বাস, বৈরাগ্য সেবাতে অগ্রসর হইতেছে, সাধুতার গুণে মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে, এরূপ বোধ হয় না। তাহা হইলে সকলে কি বলিবেন? সকলেই কি বলিবেন না যে, সে সমাজের লোকেরা সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা করিতেছে না? অথবা মাটীর মধ্যে কোনও দোষ আছে, জীবন-তরুর মূলে নিশ্চয় কোনও কীট লাগিয়াছে, যাহাতে সুফল ফলিতেছে না? বাগানের বৃক্ষটী যে বাড়িতেছে না বা যথা সময়ে ফল দিতেছে না, তাহা জল বায়ুর দোষে নয়, আলোক ও উত্তাপের অভাবজন্যও নয়, জল বায়ু আলোক উত্তাপ ত রহিয়াছে, যাহার গুণে অপর উদ্যানের বৃক্ষ সকল বাড়িতেছে; তবে তাহা ঐ মূলস্থিত কীটের দোষ। জীবন-তরুর মূলে সে কীট কি তাহা সকলে চিন্তা করুন; বিশেষতঃ সাধুভক্তিহীন সমালোচনাপ্রিয় ব্যক্তিগণ চিন্তা করুন।

এখানে কি এমন কেহ নাই, যিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন যে সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা করিয়া,ঈশ্বরের সন্নিধানে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, তিনি কিছু পাইয়াছেন? আপনার জীবনে কিছু সুফল দেখিয়াছেন? আমি ত সে সাক্ষ্য দিতে পারি। আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আমি নিরাশ, বিষাদপূর্ণ ও দুর্ব্বলহৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; তিনি আশা, আনন্দ ও বল বিধান করিয়াছেন।

আশা, আনন্দ ও বল এই তিনটী শব্দের প্রতি প্রণিধান

কর। আরও কিছু ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। আমি প্রার্থনার দ্বার দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম ; সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াই আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাইয়াছি। আমি যে অবস্থাতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, সে অবস্থার বিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তখন আমার মন গভীর নিরাশা, ঘনবিষাদ ও শোচনীয় দুর্ব্বলতাতে পূর্ণ ছিল। এ জীবনে কখনও যে ঈশ্বরের সত্তাতে সন্দিহান হইয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না ; কিন্তু তিনি যে মানবাত্মার সঙ্গী ও সহায়, ইহা পূর্ব্বে অনুভব করিতাম না। সেজন্য নিজ দুর্ব্বলতাতে যখন অভিভূত হইতাম, তখন মনে করিতাম, আমার পরিত্রাতা কেহ কোথাও নাই ; এবং বোধ হয় মনে মনে একটু অহমিকাও ছিল যে, আমার পরিত্রাতা আমি স্বয়ং। অপরে যাহা করিয়াছে তাহা কেন আমি পারিব না, আমি স্বীয় বলেই উঠিব, স্বীয় শক্তিতেই দাঁড়াইব, স্বীয় চেষ্টাতেই সাধুতার শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিব। কিন্তু বিধাতার মঙ্গলবিধানে এমন দিন আসিল, যখন আমার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা ও আমার প্রবৃত্তিকুল সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। বুঝিলাম, আপনি আপনার রক্ষক ও উদ্ধারকর্ত্তা নই ; আর একজন আছেন, যাঁহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতে হইবে ! তখন ঘোর নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে প্রার্থনা-পরায়ণ হইলাম। বলিলাম—এত দিন ত বুঝি নাই যে তোমার করুণা চাহিতে হইবে ; তোমার উপরে নির্ভর করিতে হইবে ; এখন তাহা বুঝিয়াছি, এখন তুমি আমাকে তোলো, নতুবা আমি

ডুবিতেছি! আমার সে প্রার্থনা কি বিফলে গেল? আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—"না!" দেখিলাম, যেখানে ছিল নিরাশা, সেখানে আসিল আশা; যেখানে ছিল বিষাদ, সেখানে আসিল আনন্দ; যেখানে ছিল দুর্ব্বলতা, সেখানে আসিল বল। যেমন কোকিলের ডাক শুনিলে ও সুমন্দ মলয়ানিলের আলিঙ্গন পাইলে সকলে মনে করে, এইবার আমের মুকুল ফুটিবে, তেমনি আমি এমন কিছুর সংস্পর্শ পাইলাম, যাহাতে মনে হইল, এই-বার এ পাপী বাঁচিবে। তাঁহার করুণার বাতাস গায়ে লাগিল; বহুদিনের বিষাদ চলিয়া গেল; আশার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার নিরাপদ ভাব মনে আসিল। ঝড়ে পড়িয়া ছিন্ন হইয়া পাখী কুলায়ে পৌঁছিলে যেমন ভাবে আমি বাঁচিলাম, আন্দোলিত সাগর-তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিলে আরোহিগণ যেমন অনুভব করে যে আর বিপদ নাই, তেমনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া মনে হইল জীবনের বন্দরে পৌঁছিয়াছি। কেবল যে আনন্দ হইল, তাহা নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নব বলও পাইলাম। যে ব্যক্তি স্রোতোমুখে দণ্ডায়মান তৃণের ন্যায় লোকভয়ে কাঁপিতেছিল, সেই ব্যক্তি সিংহের ন্যায় বিক্রমে সত্যপথে দণ্ডায়মান হইল।

এ সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নয়, যে এই নব-জীবন লাভ করিবার পর আমার পক্ষে পরীক্ষা বা প্রলোভন আসে নাই, অথবা আর আমার পদস্খলন হয় নাই, বা আমাকে অনুতপ্তচিত্তে ঈশ্বরচরণে কাঁদিতে হয় নাই; বরং এ কথা বলিতে

পারি, আমাকে নিজ প্রবৃত্তিকুলের সহিত যেরূপ সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে ; এবং সে সংগ্রামে কখন কখনও পরাজিত হইয়াছি ও সে জন্য অশ্রুজল ফেলিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে প্রার্থনাতে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম, সে বিশ্বাস একদিনের জন্যও হারাই নাই ; এবং যে দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার চরণ ধরিয়াছিলাম, সে মুষ্টি এক দিনের জন্যও শিথিল করি নাই।

আশা, আনন্দ ও বল,—সকলে হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ তিনটী হৃদয়ে জাগিতেছে কি না ? বিশেষতঃ, মহোৎসবের মহামেলার পর জাগিতেছে কি না ? ইহার ভিতরে একটু নিগূঢ় কথা আছে। সেটী এই,—যেমন আমাদের প্রত্যেকের দৈহিক জীবন অনন্ত গগনব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই বায়ুমণ্ডলের দ্বারা বিধৃত, সেই বায়ুমণ্ডলের দ্বারা পরিপুষ্ট, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক জীবন এক পূর্ণ সত্তার ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহা দ্বারাই বিধৃত, তাঁহার শক্তির দ্বারাই পরিপুষ্ট। তিনি আমাদিগের আত্মার সহিত মিশিয়া রহিয়াছেন, একীভূত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মজীবন আর কিছুই নহে, আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাবের প্রকাশ মাত্র, তাঁহার শক্তির বহিরাবির্ভাব মাত্র। তবে আর ধর্ম্মজীবনের জন্য ভাবনা কি ? তুমি আপনাকে তাঁহার সঙ্গে একীভূত কর, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ কর, তিনি তোমাকে তুলিবেন, গড়িবেন, কাজে লাগাইবেন।

ধর্ম্মজীবনের যে আশা, তাহা এই জন্য যে, তিনি ধর্ম্মাবহ, ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য; ধর্ম্মজীবনের যে আনন্দ, তাহা এই জন্য যে, জীবন অনন্ত শক্তির ক্রোড়ে শায়িত; তাহার জন্য ভাবনা কি? এই ভাবেই ঋষিরা বলিয়াছেন,—

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

অর্থাৎ, মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই অনন্ত সত্তার আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না।

ধর্ম্মজীবনের শক্তির কারণ এই যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক বল তোমার নহে, তাহা সেই পরম পুরুষের সহিত যোগ হইতে উৎপন্ন; তুমি তাঁহার প্রকাশের যন্ত্র মাত্র। ঐ যে সূক্ষ্ম লোহার তারটি দেখিতেছ, যাহা একজন বলবান পুরুষে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, তাহাকে থর থর কাঁপাইতেছে, অভি-ভূত করিয়া ফেলিতেছে, ওশক্তি ওতারের নয়, ওশক্তি তাড়ি-তের; ব্যাটারিটার সহিত যোগ না থাকিলে ও তারটাতে কোনও শক্তিই দেখিতে না: তেমনি আমাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতেছ, তোমাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিতেছে, তাহা আমার নহে, তোমারও নহে, তাহা সেই শক্তির পারাবার হইতে আসিতেছে। জড়জগতে যে শক্তির অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিতেছ, যে শক্তি অশনির আঘাতে গিরিশৃঙ্গ বিদারণ করি-তেছে, যে শক্তি ঘনকবাঘাতে সাগরতরঙ্গে নৃত্য তুলিয়া অট্ট-

হাস্য হাসিতেছে, যে শক্তি মেদিনীর কুক্ষিতে থাকিয়া তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপাইতেছে, যে শক্তি দাবানলে প্রজ্বলিত জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছে, সে শক্তি কি কেবল জড়েই আবদ্ধ ? ইহা স্থূলদর্শী লোকের কথা, জড়বাদীর মহা ভ্রম ! ভক্তিভাজন ঋষিগণ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন,—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।

যে তেজোময়, অমৃতময়, সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আকাশে সেই তেজোময়, অমৃতময়, সর্ব্বান্তর্য্যামি পুরুষ আত্মাতে।

তিনি জড়ে ও চেতনে। জড় যদি যন্ত্ররূপে তাঁর শক্তিকে প্রকাশ করে তবে চেতন আত্মা কি তাঁর শক্তিকে প্রকাশ করিতে পারে না ? বিশ্বাস কর, ধর্ম্মজীবনের যাহা কিছু শক্তি তাঁহারই শক্তি ; তুমি যন্ত্রমাত্র। তুমি কেবল এই দেখ যাহাতে তাঁহার সঙ্গে যোগটা বিচ্ছিন্ন না হয়।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে যোগটা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, ইহা বলিলে চলিবে না ; তাঁহার সঙ্গে যোগ কাহাকে বলে, এবং কিরূপেই বা তাহা বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাও বলিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি, যে ব্যক্তি আপনার কিছু না দেখিয়া, আপনার কিছু না রাখিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মকেই অন্বেষণ করিতেছে, এবং ঈশ্বরে অকপট প্রীতি স্থাপন করিয়াছে, সেই তাঁহার সহিত যুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে সর্ব্বান্তঃকরণে অন্বে-

বর্ণনা করিয়া, আপনার কিছু দেখিতেছে বা রাখিতেছে সেই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে মানুষের আর ভ্রমপ্রমাদ হইবে না, বা তাহার পদস্খলন হইবে না, বা সে স্বীয় প্রকৃতির সমুদয় দুর্ব্বলতাকে একেবারে অতিক্রম করিবে; কিন্তু তাহার অর্থ এই যে, সেরূপ আত্মা সর্ব্বোপরি তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; তিনিই তাহার গতিকে চরমে ফিরাইয়া লইবেন।

আশা, আনন্দ ও বল এই তিনটীরই গতি গড়িবার দিকে। যার আশা আছে, তার বিশ্বাস আছে; যার আনন্দ আছে, তার প্রেম আছে; যার বল আছে, তার বৃদ্ধি আছে। বিশ্বাস ও প্রেমে বর্দ্ধিত হওয়ার নামই ধর্ম্মজীবনের উন্নতি। সাধুদের জীবনের আর কোন্ গূঢ় কথা আছে? তাঁহারা উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় ধর্ম্মকে দেখিয়াছিলেন এবং হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি তাহাতে স্থাপন করিয়াছিলেন, এই ত ভিতরকার কথা। ঐ বিশ্বাস, ঐ প্রেমই আসল; ধর্ম্মজীবনের আর সকল লক্ষণ ইহা হইতেই প্রসূত হয়। ঐ বিশ্বাস, ঐ প্রেমেই আত্মাকে স্বাধীনতা দেয়। মৎস্য জলে গিয়া, পক্ষী আকাশে উড়িয়া যেমন ভাবে, "আমি স্বাধীন, এই ত আমার স্থান", সেইরূপ ঐ বিশ্বাস ও প্রেমের গুণেই আত্মা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া অনুভব করে, এই ত আমার স্থান। এ অবস্থাতে ধর্ম্ম আর সাধনের বা শাসনের বিষয় থাকে না; তখন ধর্ম্ম হয় আত্মার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আত্মার

আহার বিহার, আত্মার শয়ন উপবেশন, আত্মার বলবুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য—সমস্ত। ধর্ম্মকে এই ভাবে পাওয়াই আসল পাওয়া ; আর যত পাওয়া, তার নকল মাত্র।

উপসংহারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, যদি দেখা যায় বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, একটী বিশেষ বাগানের গাছে ফল ফলিতেছে না, তাহা হইলে কি ভাবিতে হইবে? ভাবিতে হইবে যে মূলে কীট লাগিয়াছে। তেমনি যদি দেখা যায় যে, বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, এক ব্যক্তি ধর্ম্মসমাজে বাস করিতেছে, উপাসনা মন্দিরে যাতায়াত করিতেছে, বাহিরে দেখিতে সত্য স্বরূপের অর্চ্চনা করিতেছে, কিন্তু আশা, আনন্দ ও বল বাড়িতেছে না ; হৃদয়ে বিশ্বাস ও প্রেম জাগিতেছে না ; তাহা হইলে ভাবিতে হইবে যে, তাহার জীবন-তরুর মূলে কীট লাগিয়াছে : হয় কোনও গূঢ় আসক্তি তাহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, না হয় কোনও ধর্ম্মবিরোধী ভাব তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে ; সে হয়ত ধর্ম্মাভিমানে স্ফীত হইতেছে, অথবা কোনও ব্যক্তি বা দলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে, অথবা সেই দুরারোগ্য ব্যাধি, যাহাকে সাধুভক্তিহীন সমালোচনাপ্রিয়তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা তাহার অন্তরাত্মাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে ; উৎকট ব্যক্তিত্বের উষ্মা তাহার মনে ভক্তিকে জমিতে দিতেছে না।

আশা, আনন্দ ও বল এই তিনের দ্বারা ধর্ম্মজীবনের উন্নতির বিচার করিতে হইবে। তাঁহাতে আশা, তাঁহাতে আনন্দ ও

তাঁহাতেই শক্তি, ইহা যাঁহার হইয়াছে, তিনি অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধাম দেখিয়াছেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম না দেখিলে, ধর্ম্ম নিরাপদ ভূমিতে দণ্ডায়মান হয় না।

সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম।

এ কথা এ স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ের যুগধর্ম্মে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভাবের সমাবেশ চাই। চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যে সেই যুগধর্ম্মে কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাবের সমাবেশ করিলে চলিবে না; আরও অনেকগুলি পরস্পর বিসম্বাদী ভাবের সমাবেশের প্রয়োজন। তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম, জগতের ধর্ম্ম সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নীতিপ্রধান ও অপর কতকগুলি ভাবপ্রধান। নীতিপ্রধান ধর্ম্মের মধ্যে য়িহুদী ধর্ম্মের ও তৎপ্রসূত খ্রীষ্টধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই উভয় ধর্ম্মের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা নীতিমূলক। য়িহুদী ধর্ম্মের আদি পুরুষ মুষা ঈশ্বরের নিকট যে দশাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নীতিমূলক। ইহার প্রধান প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের উপদেশ নীতিমূলক। ইহাদের যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের মধ্যে একজন আইসেয়া (Isaiah) তিনি ঈশ্বরের বাণীরূপে বলিতেছেন—"Wash you; make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease

to do evil ; learn to do well ; seek judgement ; relieve the oppressed ; judge the fatherless ; plead for the widow ; come now and let us reason together saith the Lord."—অর্থাৎ, ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা আপনাদের পাপ-মলা ধৌত করিয়া পরিষ্কার হও ; আমার দৃষ্টি হইতে তোমাদের পাপাচরণকে অন্তর্হিত কর ; পাপ করিও না ; সদনুষ্ঠান শিক্ষা কর ; ন্যায় বিচার অন্বেষণ কর ; অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য কর ; পিতৃহীনদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ কর ; বিধবাদিগের পক্ষাবলম্বন কর ; তদনন্তর আমার সন্নিধানে এস ; আমি তোমাদের কথা শুনিব।" আইসেয়ার ন্যায় অপরাপর ধর্ম্মোপদেষ্টারাও স্বদেশ-বাসীদিগের চিত্তকে অনুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম্মের দিক হইতে নীতি-প্রধান ধর্ম্মের দিকে বার বার আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

য়িহুদীধর্ম্মের অনুষ্ঠান-বহুলতা, নিয়মাধিক্য ও কঠোর নীতিপরায়ণতার মধ্যে প্রেম ও আত্ম-সমর্পণের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম মহাবিপ্লব সাধন করিয়াছেন। যীশুর প্রধান শিষ্য সেণ্টপল গ্যালেশিয়াবাসীদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে বলিতেছেন :—"But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance."—অর্থাৎ, মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি কার্য্য করিলে

নিম্নলিখিত কতকগুলি ফল উৎপন্ন হয়—প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, নিরীহতা, দাক্ষিণ্য, বিশ্বাস, বিনম্রতা, মিতাচার। আইসেয়ার প্রদর্শিত ধর্ম্মের আদর্শ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রদর্শিত আদর্শে যে কত প্রভেদ তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন। তাহা হইলেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নীতিপ্রধানতা চিরপ্রসিদ্ধ। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ অপেক্ষা মানবে মানবে যে সম্বন্ধ তাহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়াছেন; সে বিষয়ে ইহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যীশু তাঁহার উপদেশের মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন—"Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and thou rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift."—অর্থাৎ, তুমি যখন তোমার নৈবেদ্য সামগ্রী পূজার বেদীর সন্নিধানে আনিয়াছ, তখন যদি স্মরণ কর, যে কোনও মানুষের কোনও প্রকারে অনিষ্ট করিয়াছ, তাহা হইলে সেই নৈবেদ্য ঐ পূজার বেদীর সম্মুখে রাখিয়াই গমন কর, অগ্রে গিয়া সেই মানুষের সহিত বিবাদ ভঞ্জন কর, তৎপরে আসিয়া ঈশ্বর চরণে নৈবেদ্য অর্পণ কর।" এই উপদেশের অর্থ এই যে, মানবে ও ঈশ্বরে যে সম্বন্ধ, তাহা মানবে মানবে সম্বন্ধের উপরে স্থাপিত,—অর্থাৎ, ধর্ম্ম নীতিমূলক।

য়ীহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নীতিপ্রধান ভাব এক দিকে, প্রাচীন

হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা বা ভাব-প্রধানতা অপর দিকে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস সকলের-শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই,—আত্মা আসক্তি-হীন হইয়া, সমুদয় অনিত্য বিষয়কে বর্জ্জন করিয়া, নিত্য বস্তু যে পরমাত্মা তাঁহাতে স্থিতি করিবে।

উপনিষদ বলিয়াছেন,—

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনং॥

অর্থাৎ, হৃদয়ের সমুদয় আসক্তি-পাশ যখন ছিন্ন হয়, তখন মানব মুক্তিলাভ করে, সংক্ষেপে ধর্ম্মের এই অনুশাসন। আসক্তি-ছেদনই মুক্তির পথ। আসক্তি আত্মার মধ্যে, মানবে মানবে সম্বন্ধের মধ্যে নহে; সুতরাং উন্নত হিন্দুধর্ম্মের সাধন-ক্ষেত্র আত্মমধ্যে; আধ্যাত্মিকতা ইহার প্রধান লক্ষণ।

এই আধ্যাত্মিকতা এতদ্দেশীয় বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবুকতার আকার ধারণ করিয়াছে। ভাববিশেষের চরিতার্থতা-কেই তাঁহারা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করেন; এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া ব্যবহারিক নীতির প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন।

যুগধর্ম্মে এই উভয়েরই সমাবেশ চাই; ভাবুকতা ও নীতি উভয়েরই সংমিশ্রণ চাই; নীতিহীন ভাবুকতা ও ভাবুকতা-হীন নীতি উভয়ই বর্জ্জন করা চাই। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মে এই উভয়েরই সমাবেশ দৃষ্ট হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, যুগধর্ম্মে আর দুইটী পরস্পর-বিসম্বাদী ভাবের

সমাবেশ আবশ্যক, তাহা সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা। বাস্তবিক সাধুভক্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই; অথচ ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে দেখি, ইহাদের মধ্যে যেন এক প্রকার বিবাদ দাঁড়াইয়াছে। একদিকে অতিরিক্ত সাধুভক্তি স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের গতি অবরুদ্ধ করিয়া মানুষকে অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী করিয়াছে; অপর দিকে স্বাধীনতা উৎকট ব্যক্তিত্বের আকার ধারণ করিয়া হৃদয়কে সাধুভক্তিহীন ও ধর্ম্মভাবশূন্য করিয়াছে। অনেকের মতে সাধুভক্তির অর্থ, কঠিন শৃঙ্খলে আত্মার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে অসহায় করা; আবার কাহারও কাহারও নিকটে চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ, সমালোচনার শাণিত ছুরিকা দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমুদয় পবিত্র বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার গৌরব নষ্ট করা। এই উভয়ের মধ্যস্থলে একটী পথ আছে, তাহাতে আপনাকে না হারাইয়া সাধুভক্তিতে নত হওয়া যায়; বরং এই কথাই বলি, সে পথে সাধুভক্তির দ্বারা নিজের আলোককে আরও উজ্জ্বল করা যায়; সেই পথ যুগধর্ম্মের পথ।

তৃতীয়তঃ, সাধুভক্তি ও স্বাধীনতার ন্যায় আর দুইটী বিষম্বাদী ভাব আছে, তাহা সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি। ধর্ম্মের একটা সামাজিকতা আছে। কাহার কাহারও মতে সেইটাই সর্ব্বপ্রধান; কোন কোনও সম্প্রদায়ের মতে সেইটাই সর্ব্বেসর্ব্বা। দশজনে না মিলিলে তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন হয় না; দশজনে বসাই তাঁহাদের সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়; ধর্ম্মের

এই সামাজিক দিকের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়াতে, আত্মদৃষ্টি, ধ্যান, নির্জ্জন উপাসনা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সাধনের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা দৃষ্ট হয়। সামাজিকতা হইতে যেসকল ভাব স্বতঃ মানব অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেই সকল ভাবই তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ; ধ্যান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা যে গভীরতা ও চিন্তাশীলতা মানবচরিত্রে জন্মিয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের জীবনে দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ের যুগধর্ম্মে এই উভয় ভাবেরই সমাবেশ চাই; তাহাতে সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি উভয় তুল্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া চাই; ভাবের তরঙ্গও চাই, চিন্তার গভীরতাও চাই; নির্জ্জন ও সজন সাধন দুইএর প্রতিই দৃষ্টি রাখা চাই; ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উভয়কেই আপনাতে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

চতুর্থতঃ, আর একটী বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমাবেশ আবশ্যক, তাহা ভূত ও বর্ত্তমানের মিলন। ধর্ম্মরাজ্যে দেখিতে পাই, যাঁহারা ভূত কালের প্রতি অধিক আস্থাবান তাঁহারা যেন বর্ত্তমানকে এক প্রকার অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বর্ত্তমানের সহিত তুলনাতে ভূতকাল সর্ব্বদাই অধিকতর সুন্দর দেখায়; কারণ বর্ত্তমান বলিলে আমাদের চতুর্দ্দিকে ভাল মন্দ মিশ্রিত যে সকল মানুষ, যে সকল বিষয় ও যে সকল ঘটনা দেখিতেছি তাহাই বুঝায়; বর্ত্তমানে আমরা যেমন একদিকে সাধুতা দেখি, তেমনি অপর দিকে অসাধুতা দেখি; এক দিকে যেমন নিঃস্বার্থ পরোপকার দেখি, তেমনি

অপর দিকে কুটিল স্বার্থপরতা দেখিতে পাই; সুতরাং বর্ত্তমানের ভাব আমাদের হৃদয়ে সাধুতা-অসাধুতা-মিশ্রিত; বরং অসাধুতার দ্বারা সঙ্কুচিত। ভূতকালের ভাব ওপ্রকার নহে; ভূতকালের লোকের দৈনিক জীবনের অসাধুতা, নিকৃষ্টতা, অধমতার কথা কেহ লিখিয়া রাখে নাই; তাহার চিত্র রাখিয়া যাইবার জন্য কেহ প্রয়াস পায় নাই; পাইলে বোধ হয় আমরা দেখিতাম যে, সাধুতা ও অসাধুতার সংমিশ্রণ ব্যাপারে ভূতকাল বর্ত্তমানেরই অনুরূপ ছিল; কিন্তু তাহা হয় নাই; বরং তদ্বিপরীতে ইহাই হইয়াছে যে, মানুষ বাছিয়া বাছিয়া ভাল কাজ, ভাল কথা, ভাল ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এখন ভূতকালের সহিত বর্ত্তমানের তুলনার অর্থ, ভূতকালের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলির সহিত বর্ত্তমানের নিকৃষ্ট বিষয়গুলির তুলনা; এই কারণে বিগত যুগ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান কলিযুগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, এই যে অতীতের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা, ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। মানুষ আপনার চরণ হইতে এই অতীতের শৃঙ্খল আর খুলিতে পারিতেছে না। আমরা বর্ত্তমান সময়ে এক শোচনীয় দৃশ্য দেখিতেছি। চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতেছে; আজ যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, মানুষ কাল তাহাকে অতিক্রম করিতেছে! নব নব রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে; নব চিন্তার প্রভাবে কি রাজনীতি, কি

সমাজনীতি, সর্ব্বত্রই মহা বিপ্লব ঘটিয়া যাইতেছে; মানব-সমাজের পুরাতন ভিত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া নবতর ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে। এই বহুদূরব্যাপী ও বহুফলপ্রদ বিপ্লবের মধ্যে পুরাতন ধর্ম্ম সকলই কেবল ভূতকাল লইয়া রহিয়াছে। তেরশত বৎসর পূর্ব্বে আরবদেশের অধিবাসীদিগের জন্য সে দেশীয় ভাষায়, তদানীন্তন অবস্থার উপযোগী যে সকল ধর্ম্ম-নিয়ম স্থাপিত ও প্রার্থনাদি রচিত হইয়াছিল, তাহা আজিও লক্ষ লক্ষ নরনারীর দ্বারা আচরিত হইতেছে। জগত আলোকে ভরিয়া যাইতেছে, প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বিগণ এক এক খণ্ড অন্ধকার বুকে ধরিয়া পোষণ করিতেছেন। এই যে অতীতের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা, প্রাচীনের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম, ইহা দেখিলে একটী ঘটনার কথা মনে হয়। একবার আলিপুরে পশুশালাতে একটা বানরীব একটী শিশু মরিয়া গিয়াছিল: হতভাগ্য জীব মৃত শিশুটাকে কোনরূপেই ছাড়িল না; তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বাধিয়া বুকে ধরিয়া ঘুরিতে লাগিল; কেহই তাহার আলিঙ্গন হইতে মৃত শিশুটী ছাড়াইতে পারিল না! অবশেষে সেই মৃত শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল, পচিয়া, গলিয়া, খসিয়া পড়িতে লাগিল, তবু সে সেদেহ ছাড়িল না। ইহা দেখিলে কে চক্ষের জল রাখিতে পারে? সেইরূপ দেখিতেছি, এক একটা সম্প্রদায় কতকগুলি মৃত মত ও অনুষ্ঠান বুকে ধরিয়া রহিয়াছে; বিজ্ঞানের নবালোক যতই সে গুলিকে আলিঙ্গন-পাশ হইতে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে,

ততই যেন তৎ তৎ সম্প্রদায় অধিকতর আগ্রহের সহিত সে গুলিকে বুকে চাপিয়া ধরিতেছে; বিজ্ঞানের হস্তে দংশন করিতেছে; আপনার মৃত শিশুটীকে জীবন্ত বলিয়া রক্ষা করিতেছে; শেষে মৃত বস্তুগুলি টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। বানরীর মৃত শিশু রক্ষা যেমন মাতৃ-স্নেহের নিদর্শন; ধর্ম্মসম্পদায় সকলের প্রাচীনতা রক্ষাও তেমনি মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগের নিদর্শন।

কিন্তু প্রাচীনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা অস্বাভাবিক স্থিতি-শীলতার কারণ হইলেও আমরা কি প্রাচীনকে বিস্মৃত হইয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারি? যেমন কলিকাতার সন্নি-কটবর্ত্তী গঙ্গা প্রবাহের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া কেহ হরিদ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী প্রবাহকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, কারণ সেই ধারাই এই সহরের সমীপগামিনী ধারার আকার ধারণ করিয়াছে, তেমনি হে মানব, তুমি যে কিছু জ্ঞানসম্পদের অধিকারী হইয়াছ, যে কিছু তত্ত্ব দেখিতেছ বা শিখিতেছ, তন্মধ্যে প্রাচীনদের শ্রমের ফল যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং বহু বহু শতাব্দী ও বহু বহু দূর হইতে জ্ঞানিগণ যে তোমার জ্ঞানাঙ্গ পোষণ করিয়াছেন, তুমি তাহা অস্বীকার করিতে করিতে পার না। তুমি যে প্রাচীন অপেক্ষা আপনাকে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিতেছ, ইহাও প্রাচীনদিগের সাহায্যে। শিশু যেমন পিতার স্কন্ধোপরি বসিয়া বলে, "বাবা, দেখ আমি তোমা অপেক্ষা কত বড়," ইহা তেমনি।

একবার কল্পনার সাহায্যে মনে কর, রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যদি বিষয়, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাচীনের যে কিছু কীর্ত্তি আছে, সমুদয় বিলুপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়, এবং কল্য প্রাতে আমাদিগকে নব জগতে নবজীবন আরম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলে কিরূপ অবস্থা ঘটে? প্রাচীন হইতে বর্ত্তমানকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না; সুতরাং প্রাচীনের প্রতি সমুচিত আস্থা ধর্ম্ম-জীবনের প্রধান পরিপোষক।

যাঁহারা প্রাচীনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থাবান তাঁহারা বর্ত্তমানের প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন; তাহাও যুগধর্ম্মের বিরোধী ভাব। মানব-জীবনরূপ তরু হইতে বর্ত্তমানে যে সকল শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছে, যুগধর্ম্ম সে সকলকেও প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহাতেই প্রমাণ মানব-জীবন এক মঙ্গলময় পুরুষের হস্তে, তিনি ইহাকে উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে লইয়া যাইতেছেন। আমরা কি ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি না, যে বর্ত্তমান সভ্যতা মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির অনুকূল অবস্থা সকল আনিয়া দিতেছে? পুরাকালেএক-জনকে বিদ্যালাভ করিতে হইলে, কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গুরু-সন্নিধানে যাইতে হইত, নিজ হস্তে লিপি করিয়া গ্রন্থ সকল আয়ত্ত করিতে হইত, একটা জ্ঞানের তত্ত্ব, জানিবার উপায় অভাবে চিরদিন জ্ঞান চক্ষুর নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিত। এখন বিদ্যার উপাদান সকল সকলেরই হাতের নিকট। তুমি জ্ঞানানুরাগী

হও, বা সত্যানুসন্ধায়ী হও, বা বিজ্ঞানানুরাগী হও, বা নরপ্রেমিক হও, বর্ত্তমান সভ্যজগত সর্ব্ববিষয়ে তোমার অনুকূল। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের লাভের আশা যেমন অদ্ভুত শক্তির সহিত স্বকার্য্য করিতেছে, নব নব অর্থাগমের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে, তেমনি সর্ব্ববিধ উন্নতির আশা ও আপনাকে প্রবল-রূপে ব্যক্ত করিতেছে।

অতএব যুগধর্ম্ম ভূতকালের ন্যায় বর্ত্তমানকেও অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত আলিঙ্গন করিবে; বর্ত্তমানকে বিধাতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে; সর্ব্ববিধ মানবীয় উন্নতির মধ্যে আপনাকে সোৎসাহে নিক্ষেপ করিবে; এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে সহায় হইবে; পরা বিদ্যার ন্যায় অপরা বিদ্যাকেও আদর করিবে; বলিতে কি, পরা অপরা বিদ্যার প্রভেদ ঘুচাইয়া দিবে; সকল বিদ্যাকেই পরা বিদ্যার চক্ষে দেখিবে!

বর্ত্তমানকেই যে কেবল আগ্রহের সহিত ধরিবে তাহা নহে, আশার বাসস্থান ভবিষ্যতে; আশাকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবে। উচ্চ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করাই জীবন। ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় বিধাতার হস্তে, সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বদা আশা বিদ্যমান। এই আশা হৃদয়ে শান্তি আনে, প্রতিজ্ঞাতে বল আনে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে দৃঢ়তা আনে। বিশ্বাসী মনের যে এই আশা, ইহা যুগধর্ম্মের মধ্যে প্রধান শক্তিরূপে বাস করিবেই। ঈশ্বর করুন, সেই শক্তিশালী ধর্ম্মভাব আমরা প্রাপ্ত হই।

রাজসিকধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকধর্ম্ম।

গতবারে পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মভাবের একত্র সমাবেশের বিষয়ে কিছু বলিয়াছি। এবারে সে বিষয়ে আরও কিছু দেখাইব। সেটা এই, আমরা সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানি এবং ধর্ম্মনামে অভিহিত করি, তাহার মধ্যে দুইটী ভাব আছে ;—এক রাজসিক অপর সাত্ত্বিক। রাজসিক ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকধর্ম্ম উভয়ের প্রকৃতি ও লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং উভয়ের কার্য্য এবং ফলও স্বতন্ত্র। রাজসিক ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিক ধর্ম্মে প্রভেদ কোথায়, তাহা ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি।

রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই শ্রেণীবিভাগ অতি প্রাচীন। প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যগণ মানবপ্রকৃতি অনুশীলন করিয়া মানব-চরিত্রের ত্রিবিধ ভাব ও ত্রিবিধ কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; এবং সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয় কল্পনা করিয়া, ঐ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেম, সত্ত্ব ; অহং বুদ্ধিজাত কর্ম্মস্পৃহা, রজ এবং অজ্ঞতাপ্রসূত মোহ, তম।

গীতাকার বলিয়াছেন,—

> জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।
> লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
> রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥

অপ্রকাশোপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥

অর্থাৎ হে কুরুনন্দন, সত্ত্বগুণের আধিক্য হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, রজোগুণের আধিক্য হইলে, লোভ, উদ্যোগ, চেষ্টা, অবিশ্রান্ত কর্ম্মস্পৃহা প্রভৃতি প্রবল হয়; তমোগুণের আধিক্য হইলে অজ্ঞানতা, কর্ম্মে বিতৃষ্ণা, আত্মার কল্যাণকর বিষয়ে অমনোযোগ এবং পাপে আসক্তি প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে রজোগুণের প্রধান লক্ষণ অহং-বুদ্ধি-প্রসূত কর্ম্ম-স্পৃহা। এই মূল লক্ষণটী মনে রাখিয়াই ধর্ম্মকে রাজসিক ও সাত্ত্বিক দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছি।

রাজসিক ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ,—তাহাতে সাধক নিজের গৌরব অন্বেষণ করে। ইহা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আত্মপরীক্ষার একটী প্রধান বিষয়। কোনও কোনও মানুষের প্রকৃতিতে একপ্রকার আত্ম-শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, যাহার প্রভাবে তাঁহারা এ জগতে অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। স্বাবলম্বন তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যে সকল বিঘ্ন বাধা সচরাচর সাধারণ মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহা তাঁহাদিগকে দমাইতে পারে না; রোগ, শোক, দারিদ্র্য কিছুতেই তাঁহাদিগকে স্বীয় অভীষ্ট পথ হইতে নিরস্ত করিতে পারে না; তাঁহাদের সমক্ষে বিপদ্-তরঙ্গ যতই উচ্চ হইয়া উঠুক না কেন, তাঁহারা স্বীয় আত্ম-শক্তির প্রভাবে তদুপরি উত্থিত হন। এই প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যখন সাধনে

মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁহাদের আত্ম-নিহিত শক্তি অবি-শ্রান্ত কার্য্যশীলতাতে প্রকাশ পায়; তাঁহারা সর্ব্বদাই কিছু করিতেছেন। কিন্তু সেই কার্য্যের পশ্চাতে অহং বুদ্ধি বিরাজ-মান থাকে। অনেক সময় অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া, নিজ গৌরব অন্বেষণ করিতে থাকেন। যখন তাঁহাদের হস্তের কার্য্য সফল হইতে থাকে, তখন তাঁহাদের দৃষ্টি ঈশ্বরের উপরে না পড়িয়া অজ্ঞাত-সারে নিজের উপরেই পড়িতে থাকে। সত্যের রাজ্য বিস্তার হইতেছে, ধর্ম্মের জয় হইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার জয় হইতেছে, এজন্য আনন্দিত না হইয়া, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে নিজ শক্তির কার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে থাকেন। যীশুর শিষ্য সেণ্ট পল একস্থানে বলিয়াছেন, "আমি কিছুই নহি, আমি ধূলি ও ভস্ম মাত্র, প্রভু যীশুই সকল।" হয় ত এই রাজসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণও বলিতে থাকেন, "আমি কোথায়? আমিত্ব উড়িয়া গিয়াছে, আমার যাহা কিছু কাজ দেখিতেছ তাহা ঈশ্বরের," কিন্তু দুই উক্তির মধ্যে প্রভেদ থাকে। পলের উক্তির অর্থ এই, আমাকে সরাইয়া নিয়াছি, যীশু সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছেন; দ্বিতীয় উক্তির অর্থ এই, আমি ফুলিয়া উঠিয়া ঈশ্বরের সহিত মিশিয়াছি। এখন যাহা কিছু করিতেছি সকলি ঈশ্বরের কাজ।" দেখ দুইটি ভাবে কত প্রভেদ। এই রাজসিক ভাবাপন্ন ধর্ম্মসাধকগণের প্রকৃত ভাব তখনি ধরা পড়ে, যখন কেহ সাহসী হইয়া তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপরে আঘাত

করে। তখন তাঁহাদের প্রকৃতিনিহিত রাজসিক ভাব পদাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠে; তাঁহারা মনে মনে বলিতে থাকেন, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার শক্তিতে আঘাত, দেখি তোমরা কি করিতে পার। এই বলিয়া এক দিকে তাঁহারা নিজ অবলম্বিত পথে আরও দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হন, অপর দিকেবিরোধীদিগের প্রতি দন্তঘর্ষণ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকেন। তখন জগদ্‌বাসী বুঝিতে পারে যে, এতদিন তাঁহারা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া নিজেদেরই গৌরব অন্বেষণ করিতেছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে রাজসিক ভিত্তির উপরে কিছু দাঁড়ায় না; সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু গড়িয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

এই গেল রাজসিক ধর্ম্মের ভাব। সাত্ত্বিক ধর্ম্মের লক্ষণ আর এক প্রকার। সেখানে উদ্যোগ আছে, চেষ্টা আছে, কার্য্য আছে, আত্মশক্তি-প্রয়োগ আছে, স্বীয় বিশ্বাসে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হওয়া আছে, অথচ আত্ম-গরিমা নাই। সে মানুষ সত্য-রাজ্যের বিস্তার ও ধর্ম্মের জয় ভিন্ন কিছুই অন্বেষণ করিতেছেন না। তাঁহার যে দৃঢ়তা, তাহা অহং-বুদ্ধি প্রসূত নহে, কিন্তু ঈশ্বরাদেশে প্রগাঢ় নিষ্ঠাপ্রসূত। তাঁহার বিরোধ আছে, কিন্তু বিদ্বেষ নাই; বিচার আছে, কিন্তু পরনিন্দা নাই; স্বমতপোষণ আছে, কিন্তু পরমতের প্রতি উপেক্ষা নাই; চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা আছে, পরের কার্য্যের সমালোচনা নাই। তিনি যাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন,

তাহাকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, কে কি বলিল কে কি করিল, তাহার প্রতি আর দৃষ্টি করেন না। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে আত্ম-গৌরব অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরেরই গৌরব অন্বেষণ করেন।

যাহার প্রধান নির্ভর নিজ শক্তির উপরে, যাহার প্রধান দৃষ্টি নিজের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপরে, সে মুখে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিলেও অন্তরে অন্তরে তদুপরি নির্ভর করে না। কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় তাহার চক্ষু আত্মশক্তির উপরেই পড়ে, নিজ দলবলের উপরেই পড়ে, ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্যের উপর পড়ে না। তাহার মন এ কথা বলে না, ঈশ্বর আমার সহায় আমার ভয় কি, বরং এই কথাই বলে, আমি ঢের বিঘ্ন বাধা দেখিয়াছি, আমাকে কে বাধা দিতে পারে? এজন্য সে মানুষ নূতন কর্ত্তব্যের পথে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে অগ্রসর হয় না; বিনয়ের সহিত কার্য্য করে না; অহঙ্কারে ফাটিতে থাকে; চারিদিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকে; মনে মনে যেন নিজ বাহুতে তাল ঠুকিতে থাকে।

আর একটী বিষয়ে রাজসিক ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিক ধর্ম্মে প্রভেদ আছে। গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গার দিকে রাজসিক ধর্ম্মের অধিক গতি। এরূপ মানুষ সর্ব্বদাই যেন প্রতিবাদের শিং পাতিয়া রাখিয়াছে, লড়াই করিতে প্রস্তুত! অপরের যাহা আছে সকলি মন্দ, আমার যাহা আছে সকলি ভাল, এই তাহার মনের ভাব। জীবন্ত প্রাণীকে অভিভূত করিয়া তাহার দেহ

বিদারণ করিতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ যেমন সুখ পায়, সে মানুষ তেমনি বিরোধীদিগের মত ও বিশ্বাস ছিন্ন ভিন্ন করিতে সুখ পায়। মানব-হৃদয়ের পবিত্র ও সুকোমল ভাব-গুলির প্রতি, প্রাচীন কাল হইতে সমাগত কল্যাণকর বিষয়গুলির প্রতি, তাহার দয়া মায়া নাই; কেবল ভাঙ্গ, কেবল ভাঙ্গ ঐ যেন তাহার উক্তি। এই ভাঙ্গা কাজটা সর্ব্বদা করিয়া করিয়া মানবপ্রকৃতিতে একপ্রকার উষ্মা প্রস্তুত হয়! যেমন জীবন্ত প্রাণীকে সর্ব্বদা হত্যা করিয়া ব্যাঘ্রাদির প্রকৃতিতে একপ্রকার উগ্রতা জন্মে, হত্যা করিতে, রক্তপাত দেখিতে, তাজা রক্তপান করিতে তাহারা ভাল বাসে, তেমনি সর্ব্বদা প্রতিবাদপরায়ণ প্রকৃতিতে একপ্রকার উগ্রতা জন্মে যাহাতে বিনয়, শ্রদ্ধা, সাধুভক্তি প্রভৃতি আর থাকে না; সুতরাং ধর্ম্মভাব আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

যেমন সামাজিক বিধিব্যবস্থাদি সম্বন্ধে তেমনি ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে। রাজসিক ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি মানুষকে গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গিতে ভাল বাসে। একজন মানুষকে ভাঙ্গিতে অনেক দিন লাগে না, গড়াই বড় কঠিন। যে হতভাগ্য ব্যক্তির পা একবার পিছলাইয়াছে, তাহাকে তুমি ধাক্কা দিয়া আরও ফেলিয়া দিতে পার, আবার মনে করিলে হাতখানা ধরিয়া তুলিতেও পার। বাড়ীর ছাদে বা রাজপথে কেহ যদি পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়, তখন যাহারা নিকটে থাকে, তাহারা কি করে? দেখিতে পাই সকলেই বলিয়া উঠে "হাঁ হাঁ গেল,

গেল, গেল, পড়িয়া গেল, ধর ধর মানুষটাকে ধর।" এইটা দয়ার কাজ, সত্ত্বগুণের কাজ। জীবন সম্বন্ধে ইহার বিরুদ্ধ যদি দেখি, যদি দেখিতে পাই, যেই একটু ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, অমনি দশজনে শকুনির ন্যায় চারিদিক হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার সেই দুর্ব্বলতা ধরিয়া পা দিয়া চাপিয়া ঠোট দিয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, যে দুর্ব্বলতাতে পড়িয়া নিরাশ হইতেছিল, তাহাকে আরও নিরাশ করিয়া ফেলিতেছে, তাহাকে ঈশ্বরের প্রেম-মুখ স্মরণ না করাইয়া, মানুষের কোপে আরক্ত ভীষণ মুখই দেখাইতেছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, সেখানে রাজসিক প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে। আমরা বলি মানুষকে গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গা অতি সহজ।

সাত্ত্বিক ধর্ম্ম গড়িতে ভাল বাসে; ইহা বিনয়, শ্রদ্ধা, সাধুভক্তি প্রভৃতিকে পোষণ করিয়া প্রাচীনে যাহা ভাল, নবীনে যাহা ভাল সকলকে সংরক্ষণ ও গঠন করে। প্রেম সাত্ত্বিক ধর্ম্মের প্রাণ, প্রেমের কার্য্য গঠন করা, সুতরাং সাত্ত্বিক ধর্ম্মে চারিদিক গড়িয়া তোলে।

সাত্ত্বিক ধর্ম্ম মানুষকে ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়িতে ভাল বাসে; সহস্র দুর্ব্বলতাতে যাহাকে ঘিরিয়াছে, তাহার ভিতরে যে একটু সাধুভাব আছে, তাহাকে ধরিয়া সে মানুষটাকে তুলিতে চায় সৎ যাহা তাহাকে ফুটাইয়া, সবল করিয়া, মানুষটাকে বাঁচাইতে চায়; যে অসাধুতাতে পা দিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া সাধুতাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র হয়।

তৃতীয়তঃ, রাজসিক ব্যক্তি পরের গুণ অপেক্ষা দোষের সমালোচনা করিতে অধিক ভাল বাসে; সাত্ত্বিক ব্যক্তি পরের দোষ অপেক্ষা গুণের আলোচনা করিয়া অধিক সুখী হয়। ইহার ভিতরকার কথা এই; রজোগুণের লক্ষণ অহঙ্কার, সুতরাং এই প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অজ্ঞাতসারে পরকে হীন করিয়া আপনারা বড় হইতে ভাল বাসে। এই পরদোষ চিন্তা হইতে এক প্রকার সমালোচনাপ্রিয়তা জন্মে, যাহার ন্যায় মানবচরিত্রের বিকার অতি অল্পই আছে। পরদোষ সমালোচনা একবার যাহার অভ্যাস-প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্তরের বিনয় শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্মজীবন গঠনোপযোগী ভাবগুলি শুকাইয়া যায়; চিত্তে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ বার বার উদিত হওয়াতে, মনে একপ্রকার রুক্ষতা ও তিক্ততা জন্মিতে থাকে; প্রেমের ভাব ম্লান হইয়া মানুষকে মানুষ হইতে দূরে লইয়া যায়; সুতরাং এরূপ মানুষ ঈশ্বর ও মানুষ দুই হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। রাজসিক ধর্ম্ম তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু সাত্ত্বিক ধর্ম্মের ভাব অন্য প্রকার। পরের দোষ অপেক্ষা গুণের প্রতি ইহার অধিক দৃষ্টি; মানুষকে ভাল ভাবিয়া ইহা সুখী হয়। পরের গুণ দেখিলে মন কোমল হয়, বিনীত হয়, প্রেমের উদয় হয়; ইহা হৃদয়কে উন্নত করে ও ঈশ্বর-প্রীতিকে পোষণ করে।

রাজসিক ধর্ম্মের আর একটী লক্ষণ আছে, ইহাতে দিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবার প্রবৃত্তিই অধিক। ধর্ম্মসম্বন্ধে এক

শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অপরের সাহায্য লইতে প্রস্তুত, অপরকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়। ইহাদের মুখে সর্ব্বদাই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়, অপরের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাহারা করে না। আমাকে কেহ দেখে না, আমার খবর কেহ লয় না, আমার সাহায্য কেহ করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি যাহারা এরূপ অভিযোগ সর্ব্বদা করে, তাহারাই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী; তাহারাই অপরের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদাসীন। যাহারা অপরের সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র যাহারা দিতে প্রস্তুত, তাহাদের মুখে এরূপ অভিযোগ শুনা যায় না; কেহ দেখিল কি না, সাহায্য করিল কি না, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার তাহাদের সময় নাই। অথচ বোধ হয় তাহারা স্বতঃই লোকের সাহায্য পায়। সাত্ত্বিক ধর্ম্মের ভাব এই, ইহাতে পাওয়া অপেক্ষা দিবার প্রবৃত্তি অধিক। অপরে তাহাদের কর্ত্তব্য করিতেছে কি না, এ প্রশ্ন অপেক্ষা আমি অপরের প্রতি যাহা কর্ত্তব তাহা করিতেছি কি না, এই প্রশ্নই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে অধিক উদিত হয়। নিজের অভাব ও ত্রুটির কথা এতই তাঁহার মনে জাগে যে, অপরের ত্রুটির কথা মনে তুলিবারও সময় হয় না। আপনার অপরাধ স্মরণ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, পরের অপরাধ ভাবিবেন কখন?

এক্ষণে অনেকে হয় ত প্রশ্ন করিবেন, সাত্ত্বিক ধর্ম্মের যে

সকল লক্ষণের কথা শুনিতেছি, তাহা লাভ করিবার উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিরা বলিয়াছেন:—

মহান্ প্রভুর্ব্বৈঃ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।

সেই মহান্ পুরুষই সত্ত্বের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ তাপকে যেখানেই দেখ, আর যে আকারেই দেখ, সূর্য্যই যেমন তাহার প্রবর্ত্তক, তেমনি সত্ত্বগুণকে যেখানেই দেখ, আর যে আকারেই দেখ, সেই পূর্ণ পবিত্রতার আকর পুরুষই তাহার প্রবর্ত্তক। তাঁহাকে লইয়াই ধর্ম্ম, ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসমাজ। যতটা তাঁহার সঙ্গে যোগ ততটাই সাত্ত্বিক ধর্ম্মের আবির্ভাব। গীতাকার বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ জ্ঞানই সত্ত্ব। আমি তাহার সঙ্গে একটু যোগ করি, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ প্রেমই সত্ত্ব। ঈশ্বরে অকপট প্রীতি সঞ্চারিত হইলে, তাহা মানব-চরিত্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সিক্ত করে, মানবের চিন্তা ও ভাবকে অনুরঞ্জিত করে, মানবের আকাঙ্ক্ষাকে পবিত্র করে; সুতরাং সেরূপ চরিত্রে সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তখন আর সে মানুষ আত্মগৌরবের প্রতি লক্ষ্য করে না, ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করে; নিজ শক্তি অপেক্ষা ব্রহ্মকৃপার উপরে অধিক নির্ভর করে; সে মানুষ ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে অধিক মনোযোগী হয়; পরদোষ অপেক্ষা পরের গুণের অধিক পক্ষপাতী হয়; সে মানুষ পাবার অপেক্ষা দিবার জন্য অধিক ব্যগ্র হয়; বিনয় শ্রদ্ধাতে নত থাকে; নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে; এবং জগতকে প্রীতির চক্ষে

দর্শন করে। এই প্রেমের ধর্ম্মের দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া আমাদের সকলের পক্ষে উচিত।

ধর্ম্মে শ্রেণীভেদ।

গতবারে ধর্ম্মকে রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ ধর্ম্মের আর এক প্রকার শ্রেণীভেদ প্রদর্শন করিতেছি।

জগতে মানুষ যত প্রকার ধর্ম্মের যাজন করিতেছে ও যত প্রকার ভাবকে ধর্ম্মভাব বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে সমুদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে, স্থূলতঃ অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্থূলতঃ বলিবার অভিপ্রায় এই, ঐ পার্থক্য ধর্ম্মের স্বরূপগত নহে; কেবল বহিঃপ্রকাশে ও লক্ষণ বিশেষের আতিশয্যে। জগতের পরস্পর-বিসম্বাদী ধর্ম্ম সকলের বিবাদ কোলাহলের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, ইহা যেন অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়। চারিজন অন্ধ হস্তী দেখিতে গেল; কেহ স্পর্শ করিল পদ, সে বলিল ভাই হস্তী স্তম্ভের ন্যায়; কেহ স্পর্শ করিল শুণ্ডটা, সে বলিল, ভাই হস্তী কদলীবৃক্ষের ন্যায়; কেহ স্পর্শ করিল লাঙ্গুল, সে বলিল হস্তী মোটা কাছির ন্যায়; কেহ স্পর্শ করিল কর্ণ, সে বলিল, না না হস্তী কুলোর ন্যায়। কাহারও কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, অথচ প্রত্যেকের উক্তির মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে সত্য আছে। এই খণ্ডঅংশ সকলকে জোড়া দিলে যে জিনিষটা দাঁড়ায় বরং সেটাকে একদিন হস্তী বলিলেও বলা যাইতে পারে। জগতের ধর্ম্ম সকলের দশা দেখি যেন সেই

প্রকার। এক একজন সাধক সত্যের এক এক দিক্ দেখিয়াছেন; তিনি অন্ধ হইয়া ভাবিয়াছেন, আর কোনও দিক্ নাই; সেইটীকেই পূর্ণ সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারই উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দিয়াছেন। এই জন্যই এতটা বিবাদ।

প্রথম, জগতে এক প্রকার ধর্ম্ম দেখিতেছি, যাহাকে ঐতিহাসিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সকল ধর্ম্ম অতীতের প্রতি সম্পূর্ণ বা অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন প্রাচীনকালে ঈশ্বর ঋষিবিশেষের বা ঋষিবর্গের নিকটে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন; ঋষিদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া বেদকে প্রকাশ করিয়াছিলেন; মুষাকে গিরিশৃঙ্গে লইয়া গিয়া দশাজ্ঞা শুনাইয়াছিলেন; মহম্মদের নিকটে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। এখন যদি তাঁহার বাণী জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার বিধি নিষেধ মানিতে ইচ্ছা হয়, তবে ঐ বেদ বা বাইবেল বা কোরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এক্ষণে ঈশ্বরের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিয়ম সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব জানিতে হইলে, আপ্তবাক্য ভিন্ন উপায় নাই।

এই মতাবলম্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয়। মানব-মনের এমন কোনও দিক্ নাই, এমন কোনও শক্তি নাই, যদ্দ্বারা মানব ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তবে যে ঈশ্বরজ্ঞান জগতে রহিয়াছে, ইহার কারণ কেবল আপ্তবাক্য।

এক সময়ে ঋষিগণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন, আমরা তাহা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। যেমন লণ্ডন সহর এ দেশের অনেকে দেখে নাই, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, লণ্ডন নামে সমৃদ্ধিশালী এক সহর আছে, সে কেবল যাহারা লণ্ডন দেখিয়াছে তাহাদের মুখে শুনিয়া, তেমনি ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই, সকলেই বিশ্বাস করে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর একজন আছেন, তাহা কেবল ঋষিদের মুখে শুনিয়া। এই ধর্ম্মমত হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে কতকগুলি ভাব আসিয়াছে, যাহাতে জীবন্ত আধ্যাত্মিক প্রেমের ধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। প্রথম, এই ধর্ম্মভাবে এই উপদেশ দিয়াছে, যে এক্ষণে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার ও প্রাণে পাইবার প্রয়াস বৃথা; প্রাচীন গ্রন্থে ঈশ্বর-প্রদত্ত যে সকল বিধিব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা পালন করাই ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের সাধনের এক দিকে শাস্ত্র, অপর দিকে ক্রিয়াবহুলতা। শাস্ত্র বলিলেই তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তার প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়ে। কথাটা এই দাঁড়ায়, মানবাত্মার মুক্তির জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা চাই, এবং একদল টীকাকার পুরোহিত ও যাজকের অধীন হওয়া চাই। এই কারণেই দেখা যায় যে, সমুদয় ঐতিহাসিক ধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রধান ও পৌরহিত্যপ্রধান ধর্ম্ম।

আধ্যাত্মিক প্রেমের ধর্ম্ম অন্য কথা বলে, ঈশ্বর যে এককালে মানব-হৃদয়ে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে জানিবার জন্য আপ্তবাক্যই যে একমাত্র অবলম্বন তাহা নহে;

আপ্তবাক্য আকাঙ্ক্ষাকে প্রস্ফুটিত করে, বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে. নিজ অন্তরের আলোকের সাক্ষ্য প্রদান করে, এ সকল কথা সত্য ও স্বীকার্য্য; কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ ভূমা আপনাকে মানব-অন্তরে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই অভিব্যক্তি এখনও চলিয়াছে। ব্যাকুলাত্মা ও পবিত্রচিত্ত ব্যাক্তিমাত্রেই এই অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন এই অভিব্যক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

ঐতিহাসিক ধর্ম্মের পরে আর এক প্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাহা পৌরাণিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম উপন্যাস ও কল্পিত ঘটনাবলীতে পূর্ণ বলিয়া ইহাকে পৌরাণিক ধর্ম্ম বলিতেছি। এ ধর্ম্মে বলে, ঈশ্বর ভূভার হরণ ও পাপীর উদ্ধারের জন্য রক্তমাংসময় দেহ ধারণ করিয়া মানবকুলের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে বা জুডিয়াতে নারীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং অপর মানবে যেমন হাস্য-ক্রন্দনময়, সুখদুঃখময়, রোগ-শোক-জরা-মরণাধীন জীবন যাপন করে, সেইরূপ জীবন যাপন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার ঐশী শক্তির প্রকাশক অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন; বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপরে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন; বা সাগর-তরঙ্গের উপরে পাদচারণা করিয়াছিলেন; দ্রৌপদীর একমাত্র পাকপাত্রের অন্নের দ্বারা সহস্রাধিক ঋষিকে খাওয়াইয়াছিলেন; বা পাঁচ খানি রুটি ভাঙ্গিয়া পাঁচ হাজার বুভুক্ষু ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছিলেন; এ সমুদয়ই

পৌরাণিক কথা। সমুদয় পৌরাণিক ধর্ম্মের মধ্যে এরূপ কথার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক প্রেমের ধর্ম্ম আর এক কথা বলে। এই ধর্ম্ম বলে, ভগবান ভূভার হরণ ও পাপীর উদ্ধারের জন্য একবার নামিয়া তাঁহার অবতরণ ক্রিয়া শেষ করিয়াছেন. ইহা কিরূপ? এখন কি ভূভার নাই? এখনও কি জগতে পাপী নাই? পৃথিবী যে এখনও দুষ্কৃতিভারে অবনত হইতেছে! মানব-সমাজে এখনও পাপীতাপীর অপ্রতুল নাই! বৃন্দাবনের রাখালগণ বা জুডিয়ার মৎস্যজীবিগণ এমন কি করিয়াছিল, যে জন্য তাঁহার সন্দর্শন পাইল? তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতে, বা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জুডিয়াতে, এমন কি পাপের আধিক্য হইয়াছিল, যে জন্য ভগবান সেখানে নামিয়াছিলেন? তিনি এক সময়ে জগতের কোনও প্রান্তে নামিয়াছিলেন, এই মাত্র শুনিলে কি মানিলে কি আমাদের পরিত্রাণ হইতে পারে? কেহ যদি কলিকাতায় আসিয়া লোকমুখে শুনিয়া যায় যে ১৮৮০ সালে আলিপুরের পশুশালাতে রুশিয়া দেশের একটা শুক্ল ভল্লুক আনা হইয়াছিল, তাহা শোনাই যেমন শুক্ল ভল্লুক দেখা নয়, তেমনি ঈশ্বর কোনও বিশেষ স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা মানাও ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনে ও প্রেমে।

আর এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহাকে দার্শনিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই ধর্ম্মের একদিকে জড়বাদ

অপর দিকে আত্মবাদ। জড় বিজ্ঞানের দিক দিয়া যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা বলেন, জড় ও জড়ের শক্তিই সর্ব্বস্ব; সৃষ্টি-লীলার মধ্যে আত্মার উদ্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না; সৃষ্টি রাজ্যে সর্ব্ববিভাগেই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা। ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অপর পার্শ্বে রহিয়াছেন। অথবা তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কল চালাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন; কারণ আর তাঁহার কাজ নাই। এ ধর্ম্মমতে স্তুতি প্রার্থনা প্রভৃতি অনাবশ্যক। কারণ যাহা হইবার হইবেই; কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে এই ধর্ম্মমতের প্রবলতা দৃষ্ট হইয়াছিল।

এই দার্শনিক ধর্ম্মের আর এক ভাব আছে, তাহা বলে সকলই আত্মা। যাহাকে জড় বলিতেছ তাহা জ্ঞানবস্তু মাত্র, সুতরাং তাহাও আত্মার প্রকাশ। দর্শনের এই মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এদেশীয় বৈদান্তিকগণ জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ অদ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। জড় ও আত্মা মূলে এক কি না, এ তত্ত্বের বিচারে চিন্তা ও সময়কে নষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। ইহা সকলেই জানে যে, অনাদি অনন্ত, স্বয়ম্ভু ও নিরপেক্ষ সত্তা, দুই দশটা, বা বিশ পঁচিশটা হইতে পারে না। আমরা ব্যবহারিক জ্ঞানে জড় ও চেতনকে যেরূপে দেখিতেছি, তন্মধ্যে দেখিতে পাইতেছি যে, তাহারা পরস্পর-সাপেক্ষ, জড় বলিলেই চেতন সেই সঙ্গে আছে; চেতন বলিলেই জড় সেই সঙ্গে আছে। উভয়ে যখন পরস্পর-সাপেক্ষ,

তখন উভয়ের সত্তা নিরবলম্ব সত্তা নহে; উভয়ের অন্তরালে, উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া, উভয়কে সম্ভব করিয়া, আর কোনও সত্তা রহিয়াছে। সেই পরমার্থ সত্তা এক, জড় ও চেতন তাহা হইতেই উদ্ভূত, তাহারই বিকাশ। ব্যবহারিক জগতে, অর্থাৎ সৃষ্টিলীলার মধ্যে, কিন্তু জড় ও চেতন পরস্পর-সাপেক্ষ, পরস্পরবিসম্বাদী অথচ পরস্পর-পোষক হইয়া রহিয়াছে। আমাদের পদদ্বয় সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করি। তিনি আমাদিগকে সত্তা না দিলে আমরা কিরূপে সৎ হইতাম, সুতরাং আমরা তাঁহারই আশ্রিত ও অনুগত জীব।

আর এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহাকে নৈতিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মহাত্মা বুদ্ধ এই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ব্রহ্মস্বরূপ অজ্ঞেয়, তাহার পশ্চাতে ছুটিও না; যাহা বিচারের দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে না, তাহাতে শক্তি পর্য্যবসিত করিও না; যে ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা মানবজীবন শাসিত, যাহাকে প্রতিনিয়ত নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছ, তদুপরি পদদ্বয়কে দৃঢ়রূপে স্থাপন কর; পাপকে পরিহার কর, কারণ শাস্তি অনিবার্য্য; পুণ্যকে আশ্রয় কর, কারণ পুণ্যের ফল অনুল্লঙ্ঘনীয়! এই মূল ভাব অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আত্ম-পরমাত্ম-বিচার বর্জ্জন করিয়া, চিত্তশুদ্ধি, অনাসক্তি, সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রভৃতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ইহার

ফল এই হইল, যে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্বরায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নৈতিক নিয়ম পালনে পর্য্যবসিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত বিসম্বাদী ধর্ম্মভাব সকলকে অন্ধের হস্তী দর্শনের সহিত তুলনা করিবার কারণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য আছে। ঐতিহাসিক ধর্ম্মের মূল কথার মধ্যে কি সত্য নাই? প্রাচীনকালে ঈশ্বর কি ঋষিগণের হৃদয়ে আপনাকে অভিব্যক্ত করেন নাই? বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকলে ঈশ্বরাভিব্যক্ত সত্য সকল কি সঞ্চিত নাই? আমরা জগতের ঋষিগণের উক্তি সকল কি অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারি? আমরা তাহা কখনই দেখিতে পারি না। জড়জগতে যেমন দেখিতে পাই যে, বৃক্ষের বীজটীকে বিকাশ করিবার জন্যই তাপ, বায়ু, আলোক প্রভৃতির বিধান, তেমনি তোমার আমার হৃদয়ে যে ধর্ম্মের বীজ রহিয়াছে, তাহাকে বিকাশ করিবার জন্যই সাধু ও শাস্ত্রের বিধান। এক একজন ঋষি ধর্ম্মের এক একটী মহৎ তত্ত্ব অভিব্যক্ত করিয়া মানবজাতিকে উন্নতির মঞ্চের এক এক সোপানে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন; এইটুকু সত্য।

এইরূপ পৌরাণিক ধর্ম্মের মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে দর্শনীয় সত্য আছে। ঈশ্বর যুগবিশেষে বা দেশবিশেষে মানবকুলের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা মিথ্যা হইলেও, ইহার ভিতরকার কথাটা মিথ্যা নয়; অর্থাৎ মানবের মধ্যেই ঈশ্বর সন্নিহিত হইয়া রহিয়াছেন; দেব ও মানব এক সঙ্গেই বাস

করিতেছেন! মানবকুলের মধ্যে যাঁহারা উন্নতাত্মা সাধু, তাঁহাদিগকে এক অর্থে ঈশ্বরাবতার বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মানবের আত্মনিহিত ঈশ্বরের মঙ্গলভাব, পবিত্র ভাব তাঁহাদের চরিত্রে ফুটিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরীয় ভাবের পরিচায়করূপে জগতে দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়াই সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ে পাইয়াছে; তাঁহাদের চরিত্রে ঈশ্বরীয় শক্তি ঘনীভূত আকারে বাস করিয়াছে ও জগতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবতারবাদের এই সত্যটুকুকে অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্ম তাহাতে শাখা প্রশাখা যোজনা করিয়া প্রকাণ্ড ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিয়াছে।

দার্শনিক ধর্ম্মের মধ্যেও কি সত্য নাই? জগৎ কি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা আবদ্ধ নহে? ঈশ্বর কি আপনাকে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে বাঁধিয়া কার্য্য করিতেছেন না? জড় ও চেতন এই উভয় আবরণের মধ্যে থাকিয়া কি তিনি সৃষ্টিকে ধারণ করিতেছেন না? তবে তিনি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের মধ্যে রহিয়াছেন বলিয়া কি ভাবিতে হইবে, যে তিনি সৃষ্টিকার্য্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহা নহে। তিনি যদি আপনাকে নিয়মাধীন না রাখিয়া পৃথিবীর রাজাদিগের ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত ও যথেচ্ছাচারী হইতেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সত্তার অধিক প্রমাণ পাইতাম, বা তাঁহার মহত্ত্ব অধিক অনুভব করিতাম? বরং এই কথাই কি সত্য নহে যে, আমরা যে সর্ব্বাবস্থাতে তাঁহার অবিচলিত সংকল্পের উপরে নির্ভর করিতে পারি,

ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব। আর এ কথাও কি সত্য নহে যে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলানুসারে জগৎ চালাইবার অনুরূপ কোনও শক্তি জড়ে নাই। যে নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চলিতেছে, সে নিয়ম এক, আর যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সে শক্তি আর এক এরূপ নহে; উভয় নিয়মই সেই আদি শক্তির কার্য্যের প্রণালী মাত্র। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল যতই দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকুক না কেন, সেই শক্তি সর্ব্বত্র বিরাজিত। নবোদিত সূর্য্যালোকের প্রত্যেক স্ফুরণে সেই শক্তি, প্রবাহিত বায়ুসাগরের প্রত্যেক তরঙ্গে সেই শক্তি, অনন্ত প্রসারিত বিশ্বব্যাপী তাড়িত তরঙ্গের প্রত্যেক স্পন্দনে সেই শক্তি, উদ্যত অশনির ঘোর নির্ঘোষে সেই শক্তি, ধরা-বিদারী ভূকম্পের ঘন কম্পনে সেই শক্তি, উত্তাল তরঙ্গাকুল মহাসিন্ধুর মহানৃত্যে সেই শক্তি, আবার মানবচিন্তার প্রত্যেক বিকাশে সেই শক্তি, মানব-হৃদয়ের প্রত্যেক সুকোমল ও পবিত্র ভাবে সেই শক্তি, সংক্ষেপে বলি, সেই শক্তির মহাপ্লাবনে, জলস্থল শূন্য, স্থাবর জঙ্গম, জড় ও চেতন, সমুদয় প্লাবিত। ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তাঁহাকে দূরে রাখিয়া কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলকে ভাবিবার উপায় নাই।

নৈতিক ধর্ম্মের মধ্যে কি সত্য আছে, তাহা অগ্রে আলোচনা করিয়াছি। মানবের সঙ্গে মানব-সমাজ বাঁধা, মানবের সঙ্গে ধর্ম্ম বাঁধা, সুতরাং মানব-সমাজের সঙ্গে ধর্ম্ম বাঁধা। নীতির সঙ্গে ধর্ম্ম বাঁধা, এই সত্য পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি।

নীতিকে ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নহে; কিন্তু যাহা অর্দ্ধেক তাহাকে সম্পূর্ণ বলিলে যে ভ্রম হয়, কেবল মাত্র নীতিকে ধর্ম্ম বলিলে সেই ভ্রম হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় নৈতিক ধর্ম্ম সেই ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন।

অন্ধের হস্তীদর্শনের ন্যায় এই সকল ধর্ম্মের ভ্রমাংশ বর্জ্জন করিয়া সত্যাংশ যোড়া দিলে, পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মভাব পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক —এরূপ প্রণালীতে কেহ কখনও ধর্ম্ম লাভ করে নাই। প্রকৃত জীবন্ত ধর্ম্মের পথ ইহাও নহে। যেমন আলু পটল প্রভৃতি তরকারীর খোসা ছাড়াইয়া, পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া মশলা ও লবণ মাখাইয়া, একত্র রাখিলেই তাহাকে ব্যঞ্জন বলে না; এ সকল ব্যঞ্জনরূপে পরিণত হইতে আরও কিছু চাই, অগ্নির ক্রিয়া চাই; তেমনি প্রাচীন ও বর্ত্তমানের সমুদয় ভাল কথা ও ভাল বিষয় বাছিয়া একত্র রাখিলেই তাহা ধর্ম্ম হয় না। আরও কিছু চাই,—অগ্নির ক্রিয়া চাই। ঈশ্বরের প্রেমানল যখন হৃদয়ে জ্বলে, জ্বলিয়া তাহাকে নব জীবন প্রদান করে, যখন প্রেমোজ্বল হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত সত্য সকল প্রতিভাত হয়; তখনি তাহা পরিপক্ক হইয়া ধর্ম্মজীবনের আকার ধারণ করিতে পারে। বরং এই কথাই বলা উচিত, প্রকৃত ভগবৎপ্রেম একবার হৃদয়ে জন্মিলে পূর্ব্বোক্ত সত্য সকল স্বতঃই সে হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। জীবন্ত প্রেমই ধর্ম্মের উৎস।

মানব-জীবনের একতা।

মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ মানবের মনোবৃত্তি সকলকে সমুচিতরূপে বিচার করিবার জন্য যতই কেন মানবাত্মাকে বিভিন্ন ভাগে বিভাগ করুন না, বাস্তবিক মানবাত্মার মধ্যে খণ্ড ভাব নাই; সেখানে অখণ্ড একতা। আমরা সচরাচর বলি, মানবাত্মা জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত। তাহার অর্থ এই নয় যে গৃহস্থের বাড়ীতে যেরূপ অন্দর মহল, সদর মহল প্রভৃতি থাকে, তেমনি মানবাত্মাতে জ্ঞানের একটী মহল ও কার্য্যের একটী মহল আছে; অথবা এক মহলের জিনিস যাহাতে অপর মহলে না যায়, আমরা এরূপ কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারি। বরং এ বিষয়ে এই কথাই সত্য যে, দুইটী জলাশয়ের জল যদি উচু নীচু থাকে, আর প্রণালী খনন করিয়া যদি তাহাদিগকে সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে যেমন উভয় জলাশয়ের জল সমান উচু হইয়া এক জলাশয়রূপে পরিণত হয়, তেমনি মানব-মনেরও সমতার দিকে গতি আছে। যাহা চিন্তাকে প্রগাঢ়রূপে অধিকার করে, তাহা ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে; যাহা ভাবকে আশ্রয় করে, তাহা কার্য্যে পরিণত হয়; যাহা কার্য্য দিয়া প্রবেশ করে, তাহা ভাবরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা চিন্তাতেও যায়। মানবাত্মা বা

মানব-চরিত্রের মধ্যে আলি দিয়া কেহই তাহাকে দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত করিতে পারে না। মানবাত্মার মধ্যে সমতা-বিধানের একটী নিয়ম আছে, যাহাকে ইংরাজীতে law of adjustment বলা যাইতে পারে। একটী সত্য যদি চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া বসিয়া যায়, তবে তাহা অপরাপর চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সমগ্র চিন্তারাজ্যকে আপনার অনুসারে গঠন করিতে থাকে; তাহা ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে ও ভাবকে আপনার অনুযায়ী করিতে থাকে; এইরূপে অনেক সময়ে সমগ্র প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তোলে।

এই উক্তির প্রমাণ কি মানব-ইতিহাসে কি ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বত্রই কি প্রাপ্ত হওয়া যায় না? অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞানের যে অদ্ভুত বিকাশ, রাজনীতির যে আশ্চর্য্য উন্নতি, সামাজিক ভাব সকলের যে অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হইতেছে, সকলের মূলে সুপ্রসিদ্ধ মার্টিনলুথার প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সংস্কার রহিয়াছে। এ কথার যুক্তিযুক্ততা আমরা অনুভব করিতে পারি। যখন ইউরোপীয় জাতি সকল বিবিধ দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইয়া, মোহ-নিদ্রায় অভিভূত ছিল, যখন রাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সমুদয় নীতিই শাসন ও বাধ্যতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন লুথার দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"মানবের আত্মা স্বাধীন ভাবে মুক্তিবিষয়ক

তত্ত্ব সকলের বিচার করিতে সমর্থ; সে বিষয়ে ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মচার্য্যদিগের মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন নাই।" এ কথাটী শুনিতে সামান্য কথা, কিন্তু ইহার ফল বহুদূরে ব্যাপ্ত হইল। লোকে জাগিয়া চক্ষু খুলিয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিল, সে কি কথা, মানুষ আপনার মুক্তিবিষয়ক পরমতত্ত্ব সকলের বিচার প্রভৃতি আপনি করিতে পারে, তবে কেন সমাজনীতি, রাজনীতি বিষয়ে সে বিচারশক্তিকে প্রয়োগ করিতে পারিবে না?" এরূপে যে স্বাধীন বিচারশক্তি ধর্ম্মের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাই দ্বিগুণিত উৎসাহ ও স্বাধীনতার সহিত লৌকিক বিষয়ে প্রযুক্ত হইল। তাহারই ফলে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়। লোকে বলিল—ধর্ম্মবিষয়ে যদি আমাদের বিচারে যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই অবলম্বনীয়, তবে রাজনীতি বিষয়ে আমরা যাহা ভাল বলিয়া বুঝি, তাহাই করিতে হইবে। অমনি রাজনীতি বিষয়ে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল। মানুষ অনেক বিচারের পর যে সকল সত্য হৃদয়ঙ্গম করিল, অর্দ্ধ শতাব্দী না যাইতে যাইতে তাহা দম্বলের ন্যায় হৃদয়পাত্রের সমগ্র ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। তিনশত বৎসর পুর্ব্বে যাঁহারা ইউরোপীয় সমাজে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি আজ আবার ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তবে চমৎকৃত হইয়া দেখিবেন, সে ইউরোপ আর নাই। কিন্তু এই সুমহৎ পরিবর্ত্তন সকল স্থলে ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় বিবাদ, বিদ্রোহ, রক্তপাত করিয়া ঘটে নাই; নিঃশব্দ, নিস্তরঙ্গ বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার

গুণে ঘটিয়াছে। নবাবিষ্কৃত সত্য সকল দম্বলের ন্যায় কার্য্য করিয়া অনেক বিধি ব্যবস্থাকে বদলাইয়া ফেলিয়াছে! বিজ্ঞান যখন মাথা তুলিল তখন ধর্ম্ম তাহাকে বাধা দিল, জোরে বসা-ইবার চেষ্টা করিল; বিজ্ঞান বলিল না বসিব না, উঠিয়া দাঁড়াইল, শেষে ধর্ম্ম বলিল, এস তবে আমরা কোলাকুলি করি, শত্রু না থাকিয়া পরস্পরের মিত্র হই; কিন্তু কোলাকুলি করিতে গিয়া ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; বিজ্ঞানের রং ধর্ম্মের গায়ে লাগিয়া ধর্ম্ম ও মানব-সমাজের মহাবিবর্ত্তন-প্রক্রিয়ায় একটী অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। দেখ কেমন সাম্যবিধানের প্রক্রিয়া। কেমন law of adjustment! ইহা চিন্তা করিলে কি মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয় না? যে সকল সত্য ও যে সকল মত নির্ব্বাণ করিবার জন্য রোমানক্যাথলিক পুরোহিতগণ জীবন্ত মানুষ পোড়াইয়াছিলেন, জীবন্ত মানুষকে ঘৃত কটাহে ভাজিয়াছিলেন, দলে দলে গলে রজ্জু দিয়া মারিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন, মানববুদ্ধিতে যাতনা দিবার ও হত্যা করিবার যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, সমুদয় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্য ও সেই সকল মত এক্ষণে বিনা রক্তপাতে, বিনা বিবাদে, জনসমাজের চিন্তার অস্থি মজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নব সভ্যতা ও নব জ্ঞান যেন হাসিয়া বলিতেছে, তোমরা যে সকল সত্য প্রতি-ষ্ঠার জন্য এত রক্তপাত করিয়াছিলে, দেখ আমরা চক্ষে ধূলি দিয়া, বিনা রক্তপাতে সে সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছি।

বাস্তবিক ইহা চক্ষে ধুলি দেওয়ার ন্যায়! আমরা একটী সত্যকে প্রবলরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার প্রভাবে নিজেরা বদলাইবার সময় বুঝিতে পারি না যে বদলাইতেছি; সামাজিক জীবনে যেরূপ, ব্যক্তিগত জীবনেও সেইরূপ। ইতিহাসবর্ণিত একটী চরিত্র অবলম্বন করা যাউক। মনে কর সেণ্টপল। ইহাঁর পূর্ব্বজীবনে ও পরবর্ত্তী জীবনে কি সুমহৎ প্রভেদ লক্ষিত হইয়াছিল! যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যেন শোণিতপিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় যীশুর শিষ্যগণের অনুসরণ করিতেছেন! বার্দ্ধক্যে তিনি যীশুর অনুগত শিষ্যরূপে ঘাতক-হস্তে প্রাণ দিতেছেন! উভয় ছবিতে কতটা প্রভেদ! কিন্তু এই প্রভেদ কিরূপে ঘটিল? প্রক্রিয়াটী স্বাভাবিক ও অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। ষ্টিফেনকে হত্যা করিয়া যখন তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ডামস্কাসবাসী যীশু-শিষ্যদলকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে সেই নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটী কথা সত্যরূপে তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইল, যাহা তিনি এতদিন দেখিয়াও দেখেন নাই। সে কথাটী এই,—যীশুই প্রাচীন য়িহুদী শাস্ত্রের বর্ণিত ঈশ্বর-প্রেরিত মেসায়া। এই বিশ্বাসটী যখন তিনি হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা বদলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি এতদিন ভাবিতেছিলেন, মেসায়া যিনি হইবেন, তিনি য়িহুদীরাজ হইবেন, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদেশীয় রাজাদিগের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবেন, তিনি লৌকিক সম্পদ ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন।

এখন বুঝিলেন, স্বর্গরাজ্য অন্তরে, তাহা আধ্যাত্মিকতাতে, এবং যীশু সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি লৌকিক সম্পদ হইতে আধ্যাত্মিকতার উপরে গিয়া পড়িল; চিরাগত ক্রিয়াবহুল ধর্ম্ম হইতে উঠিয়া প্রেমের ধর্ম্মের উপরে স্থাপিত হইল; জীবনের আদর্শ যেমন বদলিয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাও বদলিয়া গেল; যে আগ্রহের সহিত তিনি য়িহুদীধর্ম্মের শত্রুদিগকে দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই আগ্রহের সহিত তিনি নূতন প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার সমগ্র চিন্তা ও ভাবের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

এই জন্যই বলি, ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে যখন নব আদর্শ ও নব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তখন তাহার প্রভাব মানব আত্মার বা মানব জীবনের এক বিভাগে আবদ্ধ থাকে না, সর্ব্ব বিভাগেই ব্যাপ্ত হয়। ঈশ্বর মানবাত্মা ও জগৎ এই তিনের স্বরূপ ও সম্বন্ধ বিষয়ে যে সকল সত্য, তাহা আমাদের সর্ব্ববিধ চিন্তার মূলে থাকে, এবং সর্ব্ববিধ চিন্তাকে অনুরঞ্জিত করে; সুতরাং সেই সকল সত্য বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার প্রভাব আমাদের জীবনের সকল বিভাগেই পরিব্যাপ্ত হয়। তুমি যদি ঈশ্বরকে নির্গুণ সত্তামাত্র বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা হইলে জীবনে এক প্রকার ভাব ঘটিবে, আর যদি তাঁহাকে জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন পুরুষরূপে জান, আর এক প্রকার ভাব ঘটিবে; ইহা স্বাভাবিক। প্রাচীন হিন্দুগণ এ জগতকে

ও মানবজীবনকে কারাবাসের ন্যায় মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের সাধন যে প্রকার হইবে, যাঁহারা এ জগতকে করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতার গৃহ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সাধন সে প্রকার হইতে পারে না। ইহা আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি।

এ সকল বিষয়ে যে এত বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য ইহা প্রদর্শন করা যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে কয়েকটী গুরুতর ও মৌলিক বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে; এবং সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যেই সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের বীজ নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন সাকারবাদের শিক্ষা এই ছিল, উপাস্য দেবতা বাহিরে; ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, উপাস্য দেবতা অন্তরে। প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, মানবের সাধনক্ষেত্র জনসমাজ হইতে দূরে; ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, মানবের সাধনক্ষেত্র জনসমাজে; প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, নিয়ম বিধি ও বাহিরের ক্রিয়াই প্রকৃষ্ট সাধন প্রণালী; ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, "প্রীতিঃ পরম সাধনং" প্রেমই প্রকৃষ্ট সাধন। এই তিনটী মহাসত্য মানব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়াতে লোকের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ঈশ্বর অন্তরে অর্থাৎ মানবের ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিলেই স্বাভাবিকরূপে এই কথা আসিয়া পড়ে যে, চিত্তশুদ্ধিতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। সাধনক্ষেত্র জনসমাজে এ কথা বলিলে

স্বভাবতঃ এই কথা আসিয়া পড়ে, গার্হস্থ্য ও সামাজিক ভাব সকলকে ধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে না, কিন্তু ধর্ম্মের সহায় জানিয়া পোষণ করিতে হইবে, এবং মানব-সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতিকে ধর্ম্মের সাধন-ক্ষেত্রের মধ্যে আনিতে হইবে। প্রীতিই ধর্ম্মের সাধন বলিলে এই কথা স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে যে, জগৎ ও মানবকে প্রেমের আলিঙ্গনের মধ্যে আনিতে হইবে। দেখ জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা কি আকার ধারণ করিল !

ঈশ্বর অন্তরে, মানবের সাধনক্ষেত্র জনসমাজে, ও প্রীতিই প্রকৃষ্ট সাধন, এই তিনটী সত্য যদি আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তবে ইহার প্রভাবেই ভাবী ভারতের ধর্ম্ম-জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যে সকল সত্য ইহার প্রতি-কূল, তাহা আপনাপনি খসিয়া পড়িবে। মানবপ্রকৃতির স্বাভা-বিক রক্ষণশীলতা বশতঃ, বিশেষতঃ ধর্ম্মভাবের রক্ষণশীলতা বশতঃ, এবং মানব-হৃদয়ের উৎকণ্ঠাবিমুখতা বশতঃ অনেক সময়ে দেখা যায়, মানব জীবনের অপর সকল বিভাগে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াও ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মের আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটে না। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগত যখন আলোকে ভরিয়া গিয়াছে, তখন ধর্ম্মাচার্য্যগণ এক এক খণ্ড অন্ধকার বুকে ধারণ করিয়া পোষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহা চিরদিন চলিতে পারে না। সাম্যবিধানের নিয়মানুসারে এক-দিন সমতা আসিবেই আসিবে। যিনি মানবকে উন্নতির মুখে

ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই মানব প্রকৃতিতে এই স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা দিয়াছেন ; নতুবা অতীতের কিছুই থাকে না ; মানব এক সময়ে বহু শ্রমে ও আয়াসে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সকল বিভাগেই দেখা যায় বিবর্ত্তনের প্রক্রিয়া বড় ধীর গতিতে চলে। একজন রোগী ঘোর বিকারে আচ্ছন্ন ছিল ; ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে ; ঔষধের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু বিকারের সকল লক্ষণ কি একেবারে কাটে ? যখন ঔষধ কার্য্য করিতেছে, তখনও আমরা দেখিতে পাই, বিকারের কোন কোন লক্ষণ রহিয়াছে।

মানবাত্মা এক ; ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মহল নাই ; এ কথা বলিবার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। অনেক সময়ে মানুষ জীবনকে দ্বিখণ্ড করিয়া সাধন করিয়া থাকে ; মনে করে ধর্ম্ম আমার জ্ঞানে থাক্, বা ভাবে থাক, অনুষ্ঠানে গিয়া কাজ নাই ; আমি ধর্ম্মের উদার ও আধ্যাত্মিক মত জ্ঞানে ধারণ করিব, ভাবে ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিব, কিন্তু অনুষ্ঠানে বিশ্বাসানুসারে আচরণ করিব না। এইরূপে মানুষ অনেক বিষয়ে জীবনের মধ্যে একটা আলি দিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করে ; মনে করে কার্য্যের ফল জীবনের এক বিভাগেই বদ্ধ থাকিবে ; কিন্তু তাহা থাকে না। একজন মনে করে, কর্ম্ম স্থানে যখন থাকিব, তখন মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি গণিব না ; কিন্তু গৃহ-পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে, ঠিক ব্যবহার করিব। তাহা ফলে দাঁড়ায় না। মানুষ প্রত্যেক আচরণের দ্বারা আপনাকে গড়ে। যে মিথ্যাচারী

হয়, মিথ্যাচার নিবন্ধন তাহার প্রকৃতির এমন পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহাতে সর্ব্ববিভাগেই মিথ্যাচারী হওয়া তাহার পক্ষে সহজ-সাধ্য হয়। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন "পাপকারী পাপো ভবতি" যে পাপাচরণ করে, তাহার প্রকৃতি পাপ হইয়া যায়। পাপাচরণের এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি। যে ছুতার আজ জুয়াচুরি করিয়া আমার টাকাটি লইয়া কাজটী খারাপ করিয়া দিতেছে, সে মনে করিতেছে সে কি চালাক, আর আমি কি বোকা, কিন্তু সে যদি জানিত যে তাহার ঐ কার্য্যের দ্বারা আমার অপেক্ষা সে নিজেরই অধিক ক্ষতি করিতেছে, তাহা হইলে বোধ হয় সেরূপ করিত না। একটী পুরাতন উপমা দিব। যেমন একজন ঔদরিকের প্রতিদিন গুরুতর আহার না যুটিতেও পারে, কিন্তু গুরুতর আহার নিবন্ধন উদরের যে পরিসর বাড়ে, সেটুকু থাকিয়া যায়, তেমনি আমাদের ভদ্রাভদ্র কাজের ফল-স্বরূপ আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন একটু পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহা স্থায়ী হইয়া যায়! সেইটুকুই গুরুতর চিন্তার বিষয়।

অভয়-প্রতিষ্ঠা।

(০)

উপনিষদের মধ্যে একটী বচন আছে, যাহাতে ঋষিগণ এক-দিকে ঈশ্বরকে অরূপ, অনির্ব্বচনীয় বলিতেছেন, অথচ আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন যে, তাঁহাতে যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সে আর ভয় প্রাপ্ত হয় না। সে বচনটী এই—

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে
ঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি

অর্থ—যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাকার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হঁন।

পূর্ব্বোক্ত উভয় উক্তিকে একত্র পাঠ করিলে, আপাততঃ পরস্পর-বিসম্বাদী বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ঈশ্বরের যে কিছু স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সমুদয় নিষেধ-মুখে। তিনি কিরূপ? না তিনি নিরবয়ব, অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার ইত্যাদি। ইহার প্রত্যেক শব্দই যেন ঈশ্বরকে মানব-হৃদয় হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধির অগোচরে স্থাপন করিতেছে। তৎপরে এই প্রশ্ন সহজেই উঠে, যিনি ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধির অগোচরে রহিলেন, তাঁহাতে মানবাত্মা অভয়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে কিরূপে? এ বিষয়ে মানবের জ্ঞান ও

হৃদয়ের প্রীতি উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে। জ্ঞান অসীমতা দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পারে; কিন্তু হৃদয় ধরিবার, ছুঁইবার, সম্ভোগ করিবার মত জিনিস চায়। এইজন্য সর্ব্বদেশেই ও সর্ব্বাবস্থাতেই নারীহৃদয় সূক্ষ্ম সত্য অপেক্ষা স্থূল মানুষকে বেশী ভাল বাসে। প্রেমের স্বভাব তাহা প্রতিদান-প্রয়াসী; যেখানে প্রতিদান নাই, সেখানে প্রতিদানের কল্পনা করিয়াও মন সুখী হয়। প্রেম যদি প্রেমকে ধরিতে না পারে, তবে তাহা ভাল করিয়া জাগে না। একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যযুক্ত, পাষাণ-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা একটী জীবন্ত কুকুরও ভাল, কারণ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেই তাহার প্রেমোজ্জ্বল চক্ষুদুটী দেখিতে পাই। এই যদি মানব-হৃদয়ের ধর্ম্ম হয়, তবে যাঁহার বিষয়ে এইমাত্র বলা যাইতেছে, যে তিনি অদৃশ্য, অরূপ, অনির্ব্বচনীয় নিরাধার, তাঁহাকে লইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে কিরূপে? তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া হৃদয় দাঁড়াইবে কিরূপে? আর যদি হৃদয় না দাঁড়াইল, তবে প্রাণে অভয় ভাব আসিবে কিরূপে?

কোনও কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের অনন্ত ভাব মানব মনে প্রবল হওয়াতেই অবতারবাদের সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইয়াছিল। যিনি জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, যিনি অদৃশ্য, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য তাঁহাকে লইয়া আমরা কি করিব? আমরা এমন ঈশ্বর চাই, যিনি আমাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, যাঁহাকে ভয়ে বিপদে ধরিতে পারি; তাঁহাতে অনন্ততা থাকে থাক, সে অনন্ততাকে কিয়ৎপরিমাণে

আবৃত করিয়া আমাদের মত হইয়া আমাদের কাছে না আসিলে আমরা কিরূপে ধরিব ? রাজ-রাজেশ্বর পিতা ক্ষণকালের জন্য রাজ-সম্পদ্ ও রাজ-ভাব ভুলিয়া যদি শিশুত্ব প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে কি তাঁর শিশু সন্তান তাঁহার সঙ্গে খেলিতে পারে ? এরূপ ভাব হইতেই অবতারবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। জ্ঞান যখন ঈশ্বরকে দূরাৎ সুদূরে স্থাপন করিল, তখন প্রেম তাঁহার মঙ্গল ভাবের সূত্র ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে ধরাধামে নামাইল; বলিল, করুণাময় করুণা করিয়া ভূভার হরণ করিতে আসিলেন !

এই উক্তির মধ্যে কিছু যুক্তি থাকিতে পারে। ঈশ্বরকে মানব-হৃদয় হইতে দূরে লইয়া গেলেই প্রেম মরিয়া যায়। তবে ঋষিগণ এরূপ বাক্য কেন বলিলেন ? আর এক দিকে ইহার গভীর অর্থ আছে। মানুষকে এই কথা বলা—তুমি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ যে অনন্তশক্তির ক্রোড়ে ব্রহ্মাণ্ড শায়িত, যে শক্তি দ্বারা চরাচর বিধৃত, তুমিও সেই শক্তির ক্রোড়ে শায়িত ও তদ্দ্বারাই বিধৃত হইয়া রহিয়াছ, তবে কেন ভীত হও ? অসীম গগনে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত গ্রহ নক্ষত্র ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে, কৈ একদিনও ত ভয় কর না, পাছে তাহারা পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তবে কেন নিজের বিষয়েই এত ভীত হও ? যে শক্তি বা যে জ্ঞান লক্ষ লক্ষ চন্দ্র সূর্য্যকে স্বীয় কক্ষে রাখিতেছে, তাহা কি তোমাকে রাখিতে সমর্থ নয় ?

ইহার উত্তরে মানব বলিতে পারে, চন্দ্র সূর্য্য ত স্বীয় স্বীয়

নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদীয় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না, এই জন্য তাঁহার দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছে, আমি যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারি, এইখানেই আমার ভয়ের কারণ। ইহার উত্তরে ঋষিগণ বলিতেছেন—"তুমি একবার অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর, তাহা হইলে তোমারও ভয় থাকিবে না।" অর্থাৎ তুমি একবার সেই মহাসত্যকে জ্ঞানে ধারণ করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হও।

এই প্রতিষ্ঠা শব্দটির অতি গভীর অর্থ। মানুষ কখন স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারে ও কিসের উপর দাঁড়াইতে পারে? যাহা চঞ্চল তাহার উপরে কি মানুষ স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে? পদতলের মৃত্তিকা প্রতি মুহূর্ত্তে সরিয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে কি দাঁড়াইতে পারে? নদীর চর, যাহা আজ উত্তর-তীরে উঠিয়াছে, আগামী বর্ষে তাহা দক্ষিণতীরে উঠিতে পারে, তদুপরি কি কেহ পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারে? পাখী যখন বাসা বাঁধে, তখন কিরূপ স্থান অন্বেষণ করে? যেখানে মানুষ সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে, তাহাকে একটু সুস্থির হইয়া বসিতে দেয় না, এরূপ স্থানে কি কুলায় নির্ম্মাণ করে? তাহা করে না; সে নিভৃত, নিরুপদ্রব স্থান অন্বেষণ করে। চঞ্চলতার মধ্যে একটা পাখীরও বাসা বাঁধা হয় না, আর চঞ্চলতার মধ্যে কি মানব-জীবনের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হইতে পারে? অতএব মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবিনশ্বর সত্যভূমি চাই; আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভূমিস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহাকে

ভাল করিয়া ধরা চাই; তৎপরে তাঁহার স্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহার সহিত একীভূত হইয়া তাঁহার ইচ্ছার অধীন হওয়া চাই; তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়মের সহিত একীভূত হওয়া ও স্বভাবে বাস করা চাই। যে স্বভাবে বাস করে ব্রহ্মাণ্ডপতি তার রক্ষক। বৃক্ষটী ত মাথা তুলিবার সময়ে ভাবে না আমার রক্ষার কি হইবে? যতক্ষণ সে স্বভাবে আছে ততক্ষণ তার রক্ষার ব্যবস্থাও আছে। পৃথিবীর রস, সূর্য্যের তাপ, আকাশের বায়ু তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে দুইটী পাতা বাহির করিয়া মাথা তুলিয়া উঠিতে না উঠিতে, ইহারা আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে, ফুটাইয়া তুলিতেছে, পূর্ণতালাভে সহায়তা করিতেছে। তেমনি মানুষ যদি স্বভাবে বাস করে, যদি হৃদয়টি পবিত্র রাখিতে পারে, যদি জগতের প্রতি প্রেম ও মানবের প্রতি প্রেমকে ধারণ করিতে পারে, যদি সমুদয় অভদ্রভাবকে বর্জ্জন ও ভদ্রভাবকে পোষণ করিতে পারে, তাহা হইলে সে নির্ভয়চিত্তে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তির ক্রোড়ে বাস করিতে পারে। কারণ জগতের মঙ্গলবিধানে বৃক্ষের ন্যায় তাহার আত্মারও রক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

যেখানে স্বভাবের ব্যতিক্রম, সেইখানেই দুঃখ; সেইখানেই ভয়। তোমার হাতখানি পাইয়াছ কাজ করিবার জন্য। দেখ কেমন ব্যবস্থা, হাতগুলির উপরে মাংসপেশীগুলি, সবই কার্য্যের অনুকূল। পড়িয়া বা আঘাত পাইয়া আজ হাতখানি ভাঙ্গিয়া ফেল, স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটাও, আর আরাম বা শান্তি থাকিবে না, উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, ব্যথা লাগিবে;

ভয় হইবে পাছে আঘাত পাও। হাতখানি যতক্ষণ সুস্থ অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ না হয়, ততক্ষণ অপর অঙ্গুলিও স্বচ্ছন্দে কাজ করিবে না ; সর্ব্বদাই যেন বলিবে আমাদের একজন যে ভাঙ্গিয়া রহিল, কিরূপে নিরুদ্বেগে কাজ করি। সেইরূপ ভিতরের প্রকৃতিতে যদি স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটাও, দেখিবে আরাম, শান্তি, নির্ভয়ভাব থাকিবে না। ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করা একখানা হাত বা পা বা মেরুদণ্ডটা ভাঙ্গিয়া ফেলার ন্যায় স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটান। যতক্ষণ ঈশ্বরেচ্ছার সহিত বিচ্ছেদটা থাকে, ততক্ষণ শান্তি থাকে না। ভাঙ্গা হাতখানা বাঁকিয়া থাকার ন্যায় অন্তরের প্রকৃতির কোথাও যেন কি একটা ভাঙ্গিয়া বাঁকিয়া থাকিয়া যায়, যে জন্য সুস্থ ও সুখী হইয়া ধর্ম্মনিয়মে দাঁড়াইতে পারে না, কাজ করিতে পারে না। যখন সেই বিচ্ছেদ দূর হয়, তখনই আত্মা প্রতিষ্ঠালাভ করে, নিরুপদ্রবে দাঁড়ায়।

ইহার পর আত্মা স্বভাবে বাস করে, স্বাভাবিকরূপে বাড়িতে থাকে। মহাত্মা যীশু এরূপ জীবনকে জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ যেমন স্বাভাবিক ভাবে বাড়ে এবং তাহার সরসতা যেমন কখনই নষ্ট হয় না, তেমনি এরূপ জীবনও স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ে এবং তাহার সরসতা চিরদিন থাকে।

ধর্ম্মসাধন বিষয়ে প্রাচীন কালের সহিত আমাদের গুরুতর মতভেদ ঘটিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেন মানুষ ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই পড়িয়া রহিয়াছে। মানবপ্রকৃতিকে

বাধা দিয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া তবে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। কুকুরকে এক মুঠা অন্ন দিয়া যদি কেহ একগাছি যষ্টি লইয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, তবে সে যেরূপে আহার করে, একগ্রাস খায় আর ভয়ে ভয়ে চায়, আমাদিগকে যেন তেমনি করিয়া জীবনের সুখসম্ভোগ করিতে হইবে, কখন কি অপরাধ হইয়া যায়। এই দেহটাকে এবং দৈহিক সমুদয় ভাবকে ঘৃণা করিতে হইবে, এবং জগতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মসাধনের ভাব এপ্রকার নহে। আমরা বলি, তুমি স্বভাবে থাক, ঈশ্বরের হস্তে বাস কর, ধর্ম্মের আদেশের বশবর্ত্তী থাক, ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ কর, তোমার পক্ষে সকল দিকেই কল্যাণ। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলি তোমার উন্নতির সহায়তার জন্য। তোমার মনে যদি পাপ না থাকে, তোমার অভিসন্ধিতে যদি মলিনতা না থাকে, তুমি ভয় করিবে কেন? তুমি যেখানেই থাক, তুমি বাড়িবে, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন। কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর, প্রভু প্রভু, বলিলে ধর্ম্ম হয় না, তাঁহার এই রক্ষিণী শক্তিতে বিশ্বাস রাখিতে হয়। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দেহটা আছে, ইহা যেমন জান, তাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মাটি আছে ইহাও তেমনি জানিতে হয়। ঈশ্বর করুন, যেন এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহাতে স্থাপন করিতে পারি।

ধর্ম্মে আত্ম-প্রবঞ্চনা।

যাঁহারা বাল্যকালে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিয়া বর্দ্ধিত হন, উত্তরকালে সুখ সৌভাগ্যের মুখ দেখিলেও, সম্পদ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হইলেও, তাঁহাদের চরিত্রের অন্তস্তলে এমন একটা সুদৃঢ়চিত্ততা ও সাহসিকতা থাকে, যে কোনও বিপদে তাঁহাদিগকে ভীত বা বিচলিত করিতে পারে না। যে সকল বিপদ বা পরীক্ষাতে অপর ব্যক্তিগণ দমিয়া যায়, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে, সে সকল বিপদে তাঁহারা পা দুখানা শক্ত মাটীতে স্থির রাখেন, ও ধীরভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। স্বদেশ বিদেশে যত মহাত্মা দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনে এই লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, প্রতিদিন ব্যায়াম করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের দেহের মাংসপেশী সকল যেমন সবল ও দৃঢ় হয়, তেমনি প্রতিদিন সহস্রপ্রকার বিঘ্ন ও সংগ্রামের মধ্যে যাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়, তাঁহাদের চরিত্রের পেশী সকলও দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। একটী বিপদকে অতিক্রম করিতে পারিলে, আর দশটী বিপদকে লঘু জ্ঞান করিবার উপযুক্ত সাহস জন্মে। এইরূপ বার বার বিপদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বার বার তাহাকে অভিভূত করিয়া, আর

বিপদকে বিপদজ্ঞান হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত প্রতিদিন জলপথে গতায়াত করিবার সময়ে দেখা যাইতেছে। যে সকল ব্যক্তি সৌধমালা-সমাকীর্ণ ও প্রশস্ত-রাজপথ-সুশোভিত রাজনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেইখানেই বর্দ্ধিত হইয়াছে, কখনও নদীর মুখ দেখে নাই, কখনও একখানি নৌকাতে পদার্পণ করে নাই, তাহাদিগকে যদি ঘটনাক্রমে কোনও দিন নৌকাতে আরোহণ করিতে হয়, এবং জলপথে যাত্রা করিবার সময় সামান্য সায়াহ্নিক বায়ুর আঘাতে জল যদি একটু কম্পিত হয়, তাহা হইলে সেই সহুরে লোকদিগের মনে কি ভীতির চিহ্নই দেখা যায়! "ও মাঝি নৌকা দোলে কেন, ও মাঝি নৌকা দোলে কেন ?" করিয়া তাঁহারা মাঝিকে অস্থির করিয়া তোলেন। তখন যদি সে নৌকাতে এমন কেহ থাকেন, যিনি প্রতিদিন নৌকাতে গতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অকারণ ভয় দেখিয়া বিরক্ত হইতে থাকেন। মাঝিদিগের মধ্যে আবার কাঁচা মাঝি ও পাকা মাঝি আছে। পদ্মা প্রভৃতি নদীতে সময়ে সময়ে এমন মাঝি দেখা যায়, মাঝিগিরি যাহাদের নিত্যকর্ম্ম নয়, জীবিকার উপায় নয়; যাহারা বৎসরের অধিকাংশ দিন ক্ষেতে কৃষিকার্য্য করে, যখন কৃষিকার্য্য না থাকে, তখন নৌকা লইয়া মাঝিগিরি করিবার জন্য বাহির হয়; ইহারা কাঁচা মাঝি। এই সকল নদীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের লোকগণ, যাঁহারা নৌকা চিনেন, তাঁহারা পারতপক্ষে কাঁচা মাঝির নৌকাতে পদার্পণ করেন না। কাঁচা মাঝির নৌকাতে উঠিয়া পথে যদি বিপত্তি ঘটে, যদি ঝড়

ঝটিকা উপস্থিত হয়, তবে তাহারা সামলাইতে পারে না! নিজেরাই ভয়ে অস্থির হইয়া যায়! আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন করিয়া শন্ শন্ রবে বায়ু হাঁকিয়া আসিতেছে, আরোহিগণ ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"ও মাঝি ঐ যে ঝড় এল, কি হবে?" মাঝি বলিতেছে—"বদর! বদর! তাই ত বাবু বড় বেগতিক দেখ্‌ছি।" সকলেই অনুমান করিতে পারেন, এরূপ মাঝির নৌকাতে বসা কি নিগ্রহের ব্যাপার। পাকা মাঝির কথা ও ব্যবহার অন্য প্রকার। সে হয়ত বাল্যকাল হইতেই নিজ পিতার নৌকাতে দাঁড়িগিরি করিয়া আসিতেছে, পরে সে যৌবনের প্রারম্ভে নিজের নৌকা করিয়া মাঝির কাজ করিতেছে। হিন্দু গৃহস্থ যেমন আপনার গাভীটাকে যত্ন করে তেমনি সে আপনার নৌকাখানিকে যত্ন করিয়া থাকে। জীবনে সে বহু বার ঝড়ে নৌকা বাঁচাইয়াছে, অনেকবার জলে ডুবিয়া বাঁচিয়াছে, কোন্ মেঘে কিরূপ ঝড় উঠে, কোন্ ঝড়ে নদীর কি অবস্থা হয়, কোন্ অবস্থাতে নৌকাকে কিরূপ রাখিতে হয়, সে সমুদয় উত্তমরূপ জানে; সুতরাং কোনও আকস্মিক বিপদে তাহাকে ভীত বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিতে পারে না। সে বলিতে থাকে—"বাবু স্থির হয়ে বসো, ভয় নাই।"

কাঁচা মাঝি ও পাকা মাঝিতে এই প্রভেদ। মানবচরিত্রের শিক্ষা দুই প্রকারে হয়, চিন্তাগত শিক্ষা ও কার্য্যগত শিক্ষা! সামরিক বিদ্যালয়ে কতকগুলি যুবক পড়িতেছে, কিরূপে শিবির স্থাপন করিতে হয়, কিরূপে কেল্লা দখল করিতে হয়, কিরূপে

পরিখা খনন করিতে হয়, কিরূপে অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া বহুসংখ্যক সৈন্যের সম্মুখীন হইতে হয়, ইত্যাদি যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সকল তাহারা শিখিতেছে। সুচারুরূপে সমরকার্য্য চালাইতে হইলে, এ সকল বিষয় জানা যে অতীব আবশ্যক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে কর তাহারা গৃহে সামরিক বিদ্যা শিখিয়াই জীবন কাটাইল, জীবনের মধ্যে একবার যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইল না; দুইটা গোলাগুলির আওয়াজ শুনিল না। বল দেখি তাহাকে কি তোমরা বীর বলিবে? যদি একটা মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, এরূপ লোকের হাতে কি সেনাপতিত্বের ভার দিবে? কখনই নহে। যে সৈনিক পুরুষ অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছেন, অনেক গোলাগুলি খাইয়া বাঁচিয়াছেন, অনেক সঙ্কটে অনেক সাহস ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, অনেক কেল্লা দখল করিয়াছেন, অনেক সংগ্রামে বীরখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তখন এরূপ ব্যক্তিরই প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িবে।

অতএব দেখিতেছি মানব-চরিত্রের প্রধান শিক্ষা কার্য্যক্ষেত্রে। কাজে হাত না দিলে মানুষ গড়ে না। রণক্ষেত্রে না গিয়া মানুষ যদি বীর হইতে পারিত, তবে দাবা খেলিয়া অনেকে রণনৈপুণ্য শিখিতে পারিত; কারণ দাবা খেলাতেও লোকে রাজা, মন্ত্রী, অশ্ব, গজ লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে। কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া কিছুই গড়ে না। কল্পনার মঞ্চে বসিয়া ভীরু ক্ষণকালের জন্য সাহসীশ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কৃপণ ও দীনসত্ত্ব ব্যক্তি বদান্যবর হইয়া বসিতে পারে, নীচ ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত জন

পবিত্রচেতা সাধুর পদ অধিকার করিতে পারে, কিন্তু কাজের সহিত, প্রকৃত ঘটনার সহিত, সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলেই ইহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন দেখি, যে ব্যক্তি তরবারির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতেছিল, আমি একাকী এই তরবারির সাহায্যে দশজন আততায়ীকে ফিরাইতে পারি, তাহার বুক 'চোর চোর' শব্দ শুনিয়াই দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে! যে ব্যক্তি উপাসনা কালে ঈশ্বরকে বলিতেছিল, "এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন", যখন ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের জন্য পাঁচটী টাকা দিবার প্রস্তাব আসিল, তখন সে দেখিল টাকা তার কলিজার সঙ্গে এমনি বাঁধা যে টাকাতে টান দিলে তার কলিজাতে টান পড়ে! এইরূপ কার্য্যগত জীবনের সংঘর্ষণে সমুদায় কল্পনাময় ভাব উড়িয়া যায়।

কল্পনা ধর্ম্মপথের যাত্রীদিগকে পদে পদে প্রবঞ্চনা করিতেছে। কল্পনা এমনি গূঢ় শত্রু যে ইহা সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বরোপাসনার মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়, আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা যখন উপাসনা করিতে বসি, তখন একটা কল্পিত অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করি! এই যেন আমার প্রভু আমাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, এই যেন তাঁহার প্রেমদৃষ্টি আমার উপর রহিয়াছে, এই যেন তিনি আমার প্রার্থনা শুনিতেছেন—এই রূপে "এই যেন" "এই যেন" করিতে করিতে মন এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাতে সেই সময়ের জন্য প্রেমের উচ্ছ্বাস,

ভাবোদয়, আশা, আনন্দ, আত্মসমর্পণ, সৎসঙ্কল্প, প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের লক্ষণ বিকাশ হয়; কিন্তু তাহা আর কার্য্য-ভূমিতে অবতরণ করে না। কার্য্যকালে যাহা প্রকৃতিগত, যাহা অভ্যাস-প্রাপ্ত, যাহা শিক্ষাজাত, তাহাই আসিয়া পড়ে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের পথে কল্পনা-জাত এই আত্মপ্রবঞ্চনার বিপদটা কিছু অধিক। তাঁহারা কল্পনা-প্রসূত ভাবময় উপাসনা করিয়া ভাবিতে পারেন, ধর্ম্মসাধন ত হইল। তৎপরে কার্য্যগত উপাসনার প্রতি উদাসীন হইতে পারেন; জ্ঞানোন্নতি, হৃদয়মনের শাসন, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, স্বার্থনাশ, উদ্যোগ, শ্রমশীলতা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে উপেক্ষা-বুদ্ধি জন্মিতে পারে।

এই বিপদ যাঁহাদের পথে আছে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কাজে হাত না দিলে মানুষ গড়ে না। আর ইহাও নিশ্চিত যে মৌখিক উপাসনা অপেক্ষা কার্য্যগত উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরকে সমুচিত সম্মান করা হয়। যে ব্যক্তি মুখে বলিতেছে প্রভু, প্রভু, কিন্তু জীবন রাখিতেছে নিজের সেবায়, তাহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি মুখে প্রভু প্রভু বলিতে লজ্জা পাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রতি-দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও মহৎ কার্য্যকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে কি অধিক প্রশংসনীয় নয়?

জীবনকে সংযত, সুনিয়মিত ও সমুন্নত করিয়া ঈশ্বরোপাস-নার উপযোগী হইবার চেষ্টা করাই উপাসনার প্রকৃত আয়ো-

জন। এই আয়োজন করিতে করিতে কখনও কখনও জীবন কাটিয়া যায়। তাহাতে দুঃখ কি? অনন্ত জীবন সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। অনেক সময়ে জগতের লোকে এ সংগ্রাম দেখিতে পায় না, তাহাতে দুঃখ কি? প্রেমাস্পদের জন্য এই সংগ্রাম এই চিন্তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অনেক সময়ে এরূপ স্বাভাবিক সাধনকে লোকে সাধন বলিয়াই মনে করে না; তাহাতে দুঃখ কি? লোকের নিকট সাধক নাম কিনিয়া ফল কি? যাঁহার দিকে চাহিয়া এই সংগ্রাম, তাঁহার প্রসাদ কি যথেষ্ট নয়? এক দিকে কল্পনাময় স্বপ্ন, অপর দিকে কার্য্যগত হিতবাদ, এই উভয়ই বর্জ্জন করিতে হইবে। কল্পনাময় স্বপ্ন কেবল ভাব লইয়া সন্তুষ্ট থাকে; বলে, কার্য্যে কিছু নাই ভাবে সকলি; কার্য্যগত হিতবাদ বলে, যাহা জগতের কোনও কাজে আসে না তাহা করিয়া ফল কি? এই হিতবাদের ভাব অতিরিক্ত মাত্রায় হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, মানুষ বলে—"চক্ষু মুদিয়া দুই ঘণ্টা বসিয়া উপাসনা করিয়া ফল কি? সে সময়টা দুর্ভিক্ষের চাঁদা সংগ্রহ করা কি ভাল নয়?" কল্পনাময় স্বপ্ন ও কার্য্যগত হিতবাদ এই উভয়ের মধ্যে আর একটা ভাব আছে, সেটা মনুষ্যত্ব লাভ; অর্থাৎ এই ভাব, যে আমি একজন মানুষ, আমি আপনি এখানে আসি নাই, ঈশ্বর আমাকে এখানে রাখিয়াছেন; তিনি আমাকে যে সকল শক্তি-সামর্থ্য দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট দায়ী; কেহ দেখুক না দেখুক, আমাকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতেই হইবে; আমি যে জ্ঞানালোচনা করি বা কর্ত্তব্যসাধন

করি, বা জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা মনুষ্যত্ব লাভের জন্য, আমার জীবনকে সফলতা দিবার জন্য, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা সম্পাদনের জন্য। ঈশ্বরেচ্ছার সুদৃঢ় ভূমিতে জীবনকে দাঁড় করাইতে না পারিলে, জীবন কখনই সুনিয়মিত ও সুপরিচালিত হইতে পারে না। ঈশ্বর করুন, সর্ব্বপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আমরা তাঁহার ইচ্ছার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

ঈশ্বরের কাজ ও মনুষ্যের কাজ।

বাইবেল গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, যীশুর দেহান্ত হইলে, তাঁহার প্রেরিত-শিষ্যগণ যখন উৎসাহের সহিত নবধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রাচীন য়িহুদী সমাজের দলপতিগণ তাঁহাদিগকে বিধিমতে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। একবার তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন; তাঁহারা কোনও অদ্ভুত উপায়ে কারাগার হইতে বাহির হইয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে য়িহুদীসমাজের নেতৃগণ এতই বিরক্ত হইলেন যে, তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার মানসে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই মন্ত্রণা সভাতে গামালিয়েল নামে একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সমাসীন ছিলেন; দেশ মধ্যে পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ছিল; তিনি সমবেত য়িহুদী মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও; ইহারা যে কাজ করিতেছে তাহা যদি মানুষের কাজ হয়, তবে ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; আর যদি ঈশ্বরের কাজ হয়, তোমরা ইহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না; বরং সতর্ক থাক যেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন না কর।"

ইহাতে ইহাই বুঝিতেছি যে, মানুষ ধর্ম্মার্থে যে কাজ করে, তাহাতে মানুষের কাজ থাকে, এবং ঈশ্বরের কাজও থাকে। এই উভয়ের প্রভেদ নির্ণয় করা যায় কিরূপে? সংক্ষেপে এই বলা যায়, ক্ষুদ্র পার্থিব অভিসন্ধিতে যে কাজ কৃত হয়, তাহা মানুষের কাজ; আর বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা চালিত হইয়া, তাঁহারই আদেশে যে কাজ কৃত হয়, তাহা ঈশ্বরের কাজ। ধর্ম্মের নামে যে কোনও অনুষ্ঠান করিলেই যে তাহা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত হইবে তাহা নহে। চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এ জগতে মানুষের শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর পশ্চাতে, অথবা বৈরাগ্য, স্বার্থনাশ, নরসেবা প্রভৃতির পশ্চাতে, অনেক সময় সামান্য প্রশংসাপ্রিয়তা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এদেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চড়ক সংক্রান্তির সময়ে লোকে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ লৌহ-শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া যে চড়কগাছে ঘূর্ণিত হইত, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতি বৎসর শত শত বিধবা নারী যে পতির জলন্ত চিতায় পুড়িত, অদ্যাপিও যে নানাদেশে শত শত বীর পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের মুখে প্রাণ দিতেছে, এই সকল কার্য্যের মূলে বহু বহু স্থলে অলক্ষিত প্রশংসা-প্রিয়তা ব্যতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। কোন কোন মানুষের প্রকৃতি এভাবে গঠিত যে, তাহাতে চতুর্দ্দিকের মানবকুলের মনের ভাব সহজে প্রতিফলিত হয়। এই সকল মানুষের

জীবন অনেক সময়ে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত রঙ্গভূমির অভিনয়ের মত হইয়া যায়। ইঁহারা চিন্তা কি কাজ করিবার সময় অপরের দৃষ্টি ভুলিয়া চিন্তা বা কাজ করিতে পারেন না। ভাবিতে বসিলেই লোকে কি চায় তাহাই তাঁহাদিগের মনে হয়; কাজ করিতে গেলেই কিরূপ কাজ করিলে লোকের প্রিয় হওয়া যায়, তাহাই মনে আসে; এবং সেই চিন্তা তাঁহাদের কাজকে নিয়মিত করে। ইহার অর্থ এ নয়, যে লোক কি চাহিতেছে এবং কিরূপে তাহা দিতে হইবে, ইহা বেশ পরিষ্কাররূপে অনুভব করিয়া তাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অনেক সময় চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী লোকের ভাব তাঁহাদের নিজের অলক্ষিতভাবেই তাঁহাদিগের কার্য্যকে অনুরঞ্জিত করে। তন্ময়তা-শক্তির প্রভাবে তাঁহারা লোকের ভাবের সহিত এরূপ একীভূত হইয়া যান যে, লোকে যাহা ভাল বলে, লোকে যাহা চায়, তাহাই তাঁহাদের হৃদয়ে আসে, হৃদয়ে কার্য্য করে। এই সূক্ষ্ম প্রশংসা-প্রিয়তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতীব কঠিন!

তৎপরে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, মানুষের গূঢ় স্থানে কোন একটী গূঢ় আসক্তি বা গূঢ় দুর্ব্বলতা থাকে; মানুষ যাহাই করুক, সেটীকে অতিক্রম করিতে পারে না; তদ্বিরুদ্ধ কোনও সাধন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সে যে কিছু অনুষ্ঠান করিতে যায়, ভিতরের সেই জিনিসটী প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার গতিকে নিয়মিত করে; তখন গতি সোজা যাইতে

যাইতে সেই দিকে বাঁকিয়া যায়। সে যখন ভাবিতেছে আমি ঈশ্বরের জন্য সকলি করিতেছি, সবই দিতেছি, তখন বস্তুতঃ তাহার গতি সেই ভিতরকার জিনিসটুকুকে বাঁচাইয়া চলিতেছে। একজন অর্থকে বড় প্রিয় জ্ঞান করেন; ঐটা তাঁহার বিশেষ আসক্তি; তিনি ধর্ম্ম সাধনার্থ বা ধর্ম্মসমাজের সেবার্থ যাহা কিছু করিতে যান, ঐ জিনিষটী বাঁচাইয়া করেন; এমন কাঁচা মাটীতে পা দেন না, যাহাতে ঐ জিনিসটীর ক্ষতি হইতে পারে। ঐ স্থানে তাঁহার বড় কথা, বড় বড় প্রস্তাব ছোট ছোট হইয়া যায়। তিনি হয়ত বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার বড় কাজ ছোট হইয়া যাইতেছে, মানুষের চক্ষে ছোট দেখাইতেছে; কিন্তু তাহার ফল ছোট হয়; তিনি যাহা চান কখনই তাহা দাঁড়ায় না।

এই জন্য বলি, ঈশ্বরের এই সত্যময় রাজ্যে মানুষ যাহা নয়, তাহা করিতে প্রয়াস পাওয়া ঘোর বিড়ম্বনা। তোমার দৃষ্টিটা ছোট, স্বার্থের সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলেই তোমার দৃষ্টির সীমান্ত রেখা সঙ্কীর্ণ হয়, তোমার পক্ষে ধর্ম্মরাজ্যে মস্ত একটা কিছু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসমাত্র।

ধনাসক্তির ন্যায় ক্ষমতা বা প্রভুত্বের প্রতিও একটা আসক্তি আছে। দশজন আমার কথায় চলে, আমি মনে করিলে একটা কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিতে পারি, লোকে আমাকে কৃতী ও বাহাদুর বলিয়া জানে, দশজনে আমাকে জ্ঞানী ও গুণী বলিয়া

সম্মান করে, এই চিন্তাতে মানুষকে একপ্রকার সুখ দেয়। এই প্রভুত্ব-প্রিয়তাতে মানুষ করিতে পারে না এরূপ কাজ নাই। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট ইহার প্রভাবে ইউরোপকে নর-রুধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এখনও এই ক্ষমতাপ্রিয়তা দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ সকল বিভাগেই কাজ করিতেছে। ইহাও সূক্ষ্ম ও অলক্ষিতভাবে মানব অভিসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মানুষকে চালিত করিয়া থাকে।

এত প্রকার সূক্ষ্ম ও অলক্ষিত শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই, যে অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ভিন্ন মানুষের কাজ ঈশ্বরের কাজ হয় না ; সেই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা কিরূপে লাভ করা যায়, সেই চিন্তাতে সকলকে প্রবৃত্ত করা। আমাদের কাজ যাহাতে ঈশ্বরের কাজ হইতে পারে, সে জন্য তিনটী সাধনের প্রয়োজন।

প্রথম, আত্মপরীক্ষা ; মধ্যে মধ্যে একান্তে বাস করিয়া আপনার কার্য্য সকলের অভিসন্ধি কি তাহা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করা উচিত। আত্মপরীক্ষার অভ্যাস সাধুজীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ ; এই কারণে তাঁহারা অপরের দোষ অপেক্ষা নিজের দোষ অধিক পরিমাণে দেখিয়া থাকেন। সচরাচর মানুষের স্বভাব এই দেখি যে, তাহারা অপরের দোষকে কঠিন হস্তে ধরে এবং আপনাদের দোষকে কোমল হস্তে ধরে ; আপনার অপরাধ ও ক্রটির বিচার করিবার সময়ে বলে— "আহা মানুষ দুর্ব্বল, এ ক্রটী মার্জ্জনীয়", কিন্তু অপরের অপরাধ

ও ক্রটী বিচার করিবার সময়ে বলে—"ছি ছি, এ মানুষ অতি ঘৃণিত, ইহার মুখ আর দেখিও না"। আত্মপরীক্ষার অভ্যাস থাকাতে সাধুদের ব্যবহার ইহার বিপরীত দেখি;—তাঁহারা নিজের প্রতি নির্দ্দয় ও পরের প্রতি সদয় হইয়া থাকেন! নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া সেণ্ট্ পলের ন্যায় বলেন—"হায় রে হতভাগ্য আমি, আমাকে এই মৃত্যুময় পাপ-বিকার হইতে কে মুক্ত করিবে।" কিন্তু পরের প্রতি যীশুর ন্যায় সদয় হইয়া বলেন—"যাও আর পাপ করিও না।" আত্ম-পরীক্ষা ব্যতীত অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায় না; সুতরাং আত্মপরীক্ষা একটা প্রধান সাধন।

আত্মপরীক্ষার পরেই প্রার্থনাশীলতা; আমরা যাহাতে ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া না পড়ি, সে বিষয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। আপন আপন জীবন পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাই, যে তাঁহা হইতে দূরে গিয়া পড়া আমাদের পক্ষে কত সহজ! কয়েক দিন নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি অমনোযোগী থাকিলেই দেখিতে পাই, যেন তাঁহা হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি। বাহিরে উপাসনাদি চলিতেছে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলও চলিতেছে, মুখে ধর্ম্মপ্রচারও একপ্রকার করিয়া যাইতেছি, কিন্তু মন অল্পে অল্পে তাঁহা হইতে নির্ভরটা তুলিয়া লইয়া অপর কিছুর প্রতি ফেলিতেছে; তাঁহার প্রতি প্রেম জাগ্রত শক্তির ন্যায় হৃদয়ে আর কার্য্য করিতেছে না; জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যে তাঁহার সুমিষ্ট

সান্নিধ্য আর মনে জাগিতেছে না। ইহা ঠিক যেন বালক-দিগের খেলার ন্যায়! ধর্‌ ধর্‌ আমার মাঝের আঙ্গুলটা ধর, বলিয়া অঙ্গুলি নাড়িতেছে, যে ধরিল সে ভাবিল প্রকৃত আঙ্গুলটাই ধরিয়াছে, পরে দেখে আর একটা আঙ্গুল ধরিয়াছে। এই অবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ হইলে আমাদের দশাও যেন সেই প্রকার হয়। যখন মনে ভাবিতেছি ঈশ্বরকে ধরিয়া আছি, তখন ভাবিয়া দেখি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কিছু ধরিয়াছি।

ঈশ্বরকে ছাড়ার আর এক অর্থ আছে; তাঁহার যে ধর্ম্ম-নিয়মের দ্বারা মানব-জীবন ও মানব-সমাজ শাসিত হইতেছে, তাহার সহিত যদি হৃদয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়, যদি ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখিয়া হৃদয় আনন্দিত না হয়, যদি সাধু ও সাধুতার প্রতি ভক্তি ও অসাধুতার প্রতি বিদ্বেষ হ্রাস হইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হৃদয় ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে। এ রূপেও আমাদের আত্মা অল্পে অল্পে ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া থাকে। অনেক সময়ে এই বিপদ এত অলক্ষিতভাবে আসে, যে আমরা ইহার ক্রম লক্ষ্য করিতে পারি না; আধ্যাত্মিক জীবনের ম্লানতা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না।

পদে পদে যখন ঈশ্বরকে ছাড়িবার এতই সম্ভাবনা, তখন পদে পদে প্রার্থনারও আবশ্যকতা; "আমাকে তোমা হইতে দূরে যাইতে দিও না।" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু ডেবিড

হেয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী জেনেট হেয়ার কন্যার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। জেনেট দেখিতেন রাজা পথে যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ থাকেন। একদিন তিনি রাজার সঙ্গে গাড়ীতে যাইতেছেন, দেখিলেন রাজা নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন। রাজা নয়ন উন্মীলন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত চক্ষু মুদিয়া থাকেন কেন?" রাজা উত্তর করিলেন—"আমি সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করি ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।" জেনেট বলিলেন—"এত প্রার্থনা করেন কেন?" রাজা বলিলেন—"আমরা দুর্ব্বল মানুষ, সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করাই ত ভাল!" জেনেট বলিলেন—"তাহা অপরের পক্ষে খাটে, আপনাতে ত কোনও দুর্ব্বলতা দেখি না।" রাজা হাসিয়া বলিলেন, "না জেনেট, তুমি জান না, আমরা সকলেই দুর্ব্বল, আমাদের সকলের পক্ষেই প্রার্থনাশীল হওয়া প্রয়োজন।" রাজা জেনেটকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের জীবনেও দেখিতে পাই। যীশুর জীবনচরিত পাঠ করিলেই দেখিতে পাই, তিনি মধ্যে মধ্যে একান্তে গিয়া প্রার্থনাপরায়ণ হইতেছেন। অবশেষে ক্রুশ কাষ্ঠে যখন তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছে, তখন যাতনায় ক্ষণকালের জন্য চিত্ত চঞ্চল হইলে তিনি প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" সেই ক্ষণকালের চঞ্চলতাও তাঁহার ঈশ্বর-বিচ্যুতি বলিয়া মনে হইল।

প্রার্থনা-শীলতার পরেই আত্মসমর্পণ ; ঈশ্বরের শক্তি হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া যে দিকে প্রেরণ করিতে চায়, সে দিকে যাইতে প্রস্তুত থাকার নাম আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের ভাব না থাকিলে সে প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে আসে না। সে প্রেরণা তোমাকে লইয়া যাইতে পারে বলিয়া তোমার কাজ ঈশ্বরের কাজ, আমাকে লইয়া যাইতে পারে না বলিয়াই আমার কাজ মানুষের কাজ।

এই আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে একটা কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সে কথাটা এই, প্রেমের এক প্রকার জুলুম আছে ; প্রেম মানুষের ঘাড়ে ধরিয়া বাধ্য করিয়া কাজ করায়। সেণ্ট্ পল সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতাতে তৎকালীন য়ীহুদীসমাজে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি যীশুর নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন আপনার মানসম্ভ্রম, পদ ও ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যীশুর ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানাপ্রকার অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সেণ্ট্ পল বলিলেন—"the love of Christ constraineth me" অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম তাহা আমাকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়া চালাইতেছে।" ইংরাজীতে বলিতে গেলে এই যে, "constraining power of love" অর্থাৎ প্রেমের জুলুম, ইহা মানব-হৃদয়ের একটা গূঢ় রহস্য। প্রেমে বাধ্য করিয়া মানুষকে কি করায় তাহা আমরা প্রতি দিন দেখিতেছি।

মানুষে মানুষে যে ভালবাসা তাহারও একটা জুলুম আছে ; তাহাতেও অনেক সময়ে মানুষকে স্বাধীনতা-বঞ্চিত ও বন্দীদশা-প্রাপ্ত করিতেছে।

প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতির ও সেইরূপ একটা জুলুম আছে ; তাহার দ্বারা চালিত হইয়া এ জগতে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাও স্বাধীনতা-বঞ্চিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। যেন আর একটা কি শক্তি তাঁহাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া কার্য্য করাইয়াছে। যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় কোনও উত্তর দিতে পারিতেন না, হয় ত বলিতেন, "না করিয়া চারা ছিল না।" ঈশ্বর-প্রীতির খাতিরে যাহা কর, যাহা না করিয়া তোমার চারা নাই, তাহাই ঈশ্বরের কাজ, আর যাহা তুমি করিলেও করিতে পার, না করিলেও না করিতে পার, যাহা করা না করা তোমার অনুগ্রহসাপেক্ষ, তাহা তোমার কাজ।

যেখানে মানুষ প্রেমের জুলুমটা অনুভব করে, সেখানে আত্মসমর্পণ আপনাপনি আসিয়া পড়ে ; সে স্রোতে ভাসিয়া যায়, সে বন্দীভাবে নীত হয়।

কিন্তু প্রেমের জুলুমটা সকল হৃদয়ে অনুভূত হয় না। সে শক্তি সকলেরই কাছে আছে, কিন্তু মনকে চালাইতে পারে না যেখানে পবিত্রচিত্ততা আছে, ব্যাকুলতা আছে, সে শক্তি সেই খানেই কার্য্য করে। আমাদের যীবনযাত্রার যে যে শুভলগ্নে

পবিত্রচিত্ততা ও ব্যাকুলতা থাকে, সেই সেই শুভলগ্নে তাহা প্রকাশ পায়। এই শক্তি অবাধে আমাদের হৃদয়ে কার্য্য করিতে পাইলেই আমাদের কাজ ঈশ্বরের কাজ হয়।

কল্যাণকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

গীতার অনেক বচন এদেশে প্রবাদবাক্যের-মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! তন্মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান, এবং বাস্তবিক সকল দেশের প্রবাদবাক্যের মধ্যে অতি উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। সে বচনটী এই ঃ—

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

অর্থ—হে তাত! যে কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

এই উক্তির মধ্যে কিরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে! কল্যাণ যাহার চিন্তাতে, কল্যাণ যাহার অভিসন্ধিতে, কল্যাণ যাহার কার্য্যে, এরূপ ব্যক্তি কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ইহা কি সত্য? এ কথা কি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সকলেই বিশ্বাস করেন? গীতাকার বলিয়াছেন, এ কথা সত্য, সকল সাধুজন বলিয়াছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু এ কথার কি কোনও প্রমাণ আছে? মানব-ইতিবৃত্ত কি এ কথার সাক্ষ্য দেয়? দেখা যাউক।

যে কল্যাণকে চায় সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, এই উক্তিকে আমরা প্রথমে এই অর্থে গ্রহণ করিতে পারি যে, সে যে কল্যাণকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়াছে, যে কল্যাণের অভিমুখে সে

চলিতেছে, যে কল্যাণকে সে কার্য্যদ্বারা লাভ করিতে চাহিতেছে, সে কল্যাণ কখনই নষ্ট হয় না ; তাহা সংসাধিত হয়ই হয়। এই একটা কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয় যে, এ জগতে যাহা কিছু সৎ, তাহার মার নাই। অবশ্য এরূপ হইতে পারে যে, তুমি যে আকারে তাহাকে দেখিতে চাহিতেছ, সে আকারে তাহা থাকিতে না পারে, তুমি যে ভাবে ও যে ক্ষেত্রে তাহাকে জয়শালী দেখিবার আশা করিতেছ, সে ভাবে ও সে ক্ষেত্রে তাহা জয়শালী না হইতে পারে, কিন্তু তাহা থাকিবেই থাকিবে, বাড়িবেই বাড়িবে। সাগরগর্ভে একটী দ্বীপ উঠিয়াছে ; কোনও নাবিক এখনও সেখানে যায় নাই ; দ্বিপটী নির্জ্জনে বালুকাময় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ; এক দিন সাগরজলে ভাসিতে ভাসিতে একটী ফল কোথা হইতে আসিয়া সেই দ্বীপে লাগিল, অথবা কোন পক্ষীর মুখচ্যুত একটী বীজ সেই দ্বীপবক্ষে পড়িল ; কেহই দেখিল না, কেহই খবর লইল না ; কতিপয় বৎসর অতীত হইতে না হইতে, দ্বীপটি স্বচ্ছন্দজাত তরুগুল্মে পূরিয়া গেল ; একটী বীজ শতটী হইল ; শতটী সহস্র হইল ; এইরূপে বাড়িয়া গেল। নিশ্চয় জানিও যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সৎ, ঈশ্বরের জগতে তাহার সেরূপ বর্দ্ধনশীলতা আছে। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি শত শত নরনারীকে একভাবে ও একপ্রাণে আবদ্ধ করি ; আমার হৃদয়ের বিশ্বাস শত শত হৃদয়ে স্থাপন করি ; আমার অপ্রিয় যাহা তাহার উন্মূলন করি ; সে আকাঙ্ক্ষাটা হয় ত পূর্ণ হইল না ; এ জীবনে হয় ত আমার

প্রতি অনুরক্ত লোক অপেক্ষা আমার প্রতি বিরক্ত লোকের সংখ্যা অধিক হইয়া গেল; হয় ত আমার প্রকৃতির মধ্যে যে সকল গূঢ় দুর্ব্বলতা আছে, তাহা আমার অনেক কার্য্যকে নষ্ট করিয়া দিল; কিন্তু একথা কি কেহ বলিতে পারেন, আমার মধ্যে প্রকৃত ভাল যে টুকু আছে, আমার অন্তরে যে ধর্ম্মজীবন-টুকু জাগিয়াছে, তাহাও আমার সহিত নষ্ট হইবে? এরূপ চিন্তা যিনি করেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ফুটিতে এখনও বিলম্ব আছে। আমাতে যে টুকু ভাল আছে, সে টুকু অমর! সে টুকু কত দিকে কত হৃদয়ে কাজ করিতেছে ও করিবে, তাহা কে জানে? আমি মানুষকে যাহা দিতে চাহিতেছি, তাহা হয় ত দিতে পারিব না, যে কথাটাকে অমর করিবার জন্য সাজিয়া গুজিয়া বসিতেছি, উপদেষ্টা হইয়া দাঁড়াইতেছি, সেটা হয় ত লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু যাহা আমি আমারই অজ্ঞাতসারে দেখাইতেছি, যাহা লোকে দাবা খেলার চাল দেখার ন্যায় আমার পৃষ্ঠের দিকে দাঁড়াইয়া দেখিয়া লইতেছে, তাহা অপর চরিত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। আমার সঙ্গে যাহারা থাকিতেছে, তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহারই প্রভাবে তাহারা গড়িয়া উঠিতেছে। আবার আজ যাহাদের প্রতি তাহার প্রভাব বিস্তীর্ণ হইতেছে না, আমি মরিলে তাহাদের উপরে তাহার প্রভাব পৌঁছিবে। সে টুকু নষ্ট হইবার নয়, সে টুকু যে নষ্ট হয় না কেবল তাহা নহে, দ্বিগুণিত, চতুর্গুণিত, অষ্টগুণিত ষোড়শগুণিত হওয়া তাহার স্বভাব। কোনও প্রকৃত সাধু

ব্যক্তি এ জগতে বৃথা বাস করেন নাই। যেমন রৌপ্য গালাই-বার সময় রতি প্রমাণ স্বর্ণ যদি তাহার মধ্যে পড়ে, তবে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না, গলিয়া মিশিয়া, রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; তেমনি সেই সকল সাধুজীবন আমাদের দৈনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহা-দের চিন্তা ও ভাব, তাঁহাদের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, আমাদের চিন্তাপটের টানাপড়েনের মধ্যে সূত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সত্যই বলিতেছি, মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে সৎ যাহা, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না; কল্যাণকারীর অভীষ্ট কল্যাণটী দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না; কল্যাণ যাঁর আচরণে, সেই নিঃস্বার্থ পুরুষ বা নারী এ জগতে এক পবিত্রতার শক্তি, যে শক্তি অপর হৃদয়ে আপনাকে অভ্যুদিত করিবেই করিবে।

আর এক অর্থে কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। যাঁর অভিসন্ধি বিশুদ্ধ, যাঁর অন্তরে কল্যাণ, সে ব্যক্তি এ জগতের পাপ প্রলোভনের মধ্যে নিরাপদে বাস করেন। মানু-ষের ভ্রম প্রমাদ সর্ব্বদাই ঘটিতে পারে; আজ তুমি যাহা করিতেছ, কল্য তাহা বর্জ্জনীয় মনে হইতে পারে; আজ যে পথে যাইতেছ, কল্য সে পথে পদার্পণ করা অকর্ত্তব্য বোধ হইতে পারে; কিন্তু কল্যাণই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, কল্যাণ-চিন্তাই যদি প্রধানরূপে তোমার হৃদয়ে বাস করে, তবে তুমি যে কোথা দিয়া সকল জাল কাটিয়া বাহির হইয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তোমাকে যদি বিপজ্জালে জড়ায়,

তাহাতে চিরদিন আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না; তুমি সমুদ্র কাটিয়া বাহির হইবেই হইবে; কল্যাণ-চিন্তাই তোমাকে সকল প্রলোভনের বাহিরে রাখিবে। যীশুর বিরোধী লোকেরা তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত এই বলিয়া বিবাদ করিত—"তোমাদের গুরু কিরূপ লোক? কেবল মাতাল ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকদিগের সঙ্গে বেড়ান।' ইহার উত্তরে যীশু বলিলেন, "তাহাদিগকে বলিও, ঔষধ কি রোগীর জন্য না সুস্থদের জন্য?" আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যীশু কিভাবে পাপাচারী লোকদের মধ্যে যাইতেন; কি কল্যাণের চিন্তা তাঁহার অন্তরে ছিল। সেই কল্যাণই তাঁহাকে সর্ব্ববিধ অসাধুতার মধ্যে রক্ষা করিত। কল্যাণ যাহার অন্তরে সে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্মের ক্ষুধা যে অন্তরে একবার জাগিয়াছে, তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দেও, সে এ জগতে আপনার উন্নতির পথ খুঁজিয়া লইবেই লইবে। আমরা যে মানুষকে শিক্ষা দিয়া থাকি তাহারও ত এই উদ্দেশ্য। কাহাকেও কি এ জগতে এমন করিয়া মানুষ করা সম্ভব, যে সে কখনও অসাধুতার মুখ দেখিবে না, সর্ব্বদাই সৎসঙ্গে বাস করিবে? যেমন লোক কাচের ঘর করিয়া লতা বা গুল্ম বিশেষকে রক্ষা করে, তেমনি কি সমাজ-মধ্যে থাকিয়া বালক বালিকা ভালটাই দেখিবে, মন্দটা আর দেখিবে না? তাহা সম্ভব নহে। ইহাই জানিয়া রাখা উচিত যে জনসমাজে বাস করিতে গেলেই ভাল মন্দ দুই আমাদের চক্ষের সমক্ষে আসিবে; উভয়ের সহিত সংঘর্ষণ

হইবে। সংক্ষেপে বলি. শিক্ষার উদ্দেশ্য এই—মনের মধ্যে এমন কিছু দিয়া দেওয়া, যাহার গুণে মানুষ ভাল মন্দ দুই দেখিয়া ভালটীই লইবে ও মন্দটী পরিহার করিবে। সে জিনিসটী কি? সেটী সাধুতার জন্য ক্ষুধা, জীবনকে উন্নত করিবার জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ, নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা। যেমন যে শিক্ষা জ্ঞানের সামগ্রী যোগায়, কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, তাহা শিক্ষাই নহে; তেমনি যে শিক্ষা হৃদয়ে এই জাগ্রত কল্যাণ-কামনা অভ্যুদিত করিতে পারে না, মন্দটীকে বর্জ্জন করিয়া ভালটী লইতে সমর্থ করে না, তাহাও শিক্ষা নহে। অতএব কল্যাণ যাহার হৃদয়ে বাস করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

আর এক অর্থে কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। মনে করা যাউক, তিনি যাহা করিতে চাহিলেন তাহার কিছুই হইল না; তাহার প্রভাব কোনও জীবনে বিস্তৃত হইল না; কেহই তাঁহার সাধুতা লক্ষ্য করিল না বা স্বীকার করিল না; তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার সাধুচেষ্টা বিফলে গেল? কখনই নহে। মানুষ কল্যাণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এবং কল্যাণের অনুষ্ঠান করিয়া, অপরের কিছু উপকার করুক আর না করুক নিজেকেই উপকৃত করে। প্রত্যেক কল্যাণ-চিন্তাতে ও কল্যাণের অনুষ্ঠানে তাহার নিজের চরিত্র ফুটিতে থাকে; এবং তাহার নিজের প্রকৃতি সাধুতার অনুগত, সাধুতার উপযোগী, ও সাধুতার উৎসস্বরূপ হইতে থাকে।

একটি সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আর দশটা সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানের উপযোগী শক্তি বিকশিত হয়। এ লাভটা কে ঘুচাইতে পারে? আমি একটা ভাল কাজে হাত দিয়াছিলাম, তোমরা দশজনে তাহা ভাঙ্গিয়া দিলে; আচ্ছা দেও; কিন্তু ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া সেই কাজটীতে হাত দেওয়াতে আমার আত্মা যে বলশালী হইয়াছে, তাহা তোমরা কিরূপে হরণ করিতে পার? সেই কাজে হাত দিয়া যে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিয়াছি, তাহা কিরূপে কাড়িয়া লইতে পার? তবে দেখ কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

আর এক অর্থেও একথা সত্য। যাঁহাতে প্রকৃত সাধুতা আছে, মানব-হৃদয়ে তাঁহার জন্য সিংহাসন গঠিত হইবেই হইবে। মানব-হৃদয়ের নিঃস্বার্থতা এমনি জিনিস, যাহাতে অপর হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেই করিবে। যে আপনাকে চায় না, তাহাকে সকলেই চায়। মিশর দেশের রাজা একবার মক্কা-নগরে দূত প্রেরণ করিলেন; বলিয়া দিলেন—"দূত! দেখিয়া আয় ত কোন্ সাহসে মহম্মদ পৃথিবীর রাজাদিগকে ঘোষণাপত্র পাঠায়?" দূত ফিরিয়া গিয়া বলিল,—"মহারাজ; দেখিয়া আসিলাম, অন্ততঃ সহস্রটি মস্তক না কাটিলে, মহম্মদের মস্তকে পৌঁছিবার যো নাই;" অর্থাৎ সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহম্মদের জন্য মস্তক দিতে প্রস্তুত। ঘাতকগণ মহম্মদের বাস-ভবন আবেষ্টন করিলে, আলি মহম্মদকে পার্শ্বের দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া, শত্রুগণকে নিশ্চিন্ত রাখিবার জন্য তাঁহার পরিচ্ছদ

পরিধান করিয়া তাঁহার শয্যায় রহিলেন। সে মুহূর্ত্তে কি আলি মহম্মদের জন্য স্বীয় জীবন দিতে প্রস্তুত হন নাই? এতটা প্রেমের মূল কোথায়? তাহা যদি কেহ অন্বেষণ করেন, তবে তাঁহাকে বলি, ইহার মূল যদি দেখিতে চাও, তবে মহম্মদের জীবনের দুইটী ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রথম ঘটনা এই;—যখন মহম্মদ বহুদিনের পর সদলে মক্কানগরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সৈন্যগণ সহর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল; বা বৈরনির্য্যাতনের জন্য ব্যগ্র হইল; কিন্তু মহম্মদ সর্ব্বাগ্রে একজনকে কাবামন্দিরের উচ্চ প্রাসাদে তুলিয়া দিলেন; বলিলেন,—উচ্চৈঃস্বরে একবার মক্কাবাসীদিগকে ডাকিয়া বল—"এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই।" জয়ের উল্লাসের মুহূর্ত্তে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা হইল সত্যের ঘোষণা। দ্বিতীয় ঘটনা ইহারই অনুরূপ; মহম্মদ যখন ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন, তখন দেখা গেল, একটী মাদুর, একটী বদনা ও কয়েক টাকার সম্পত্তি ভিন্ন তাঁহার কিছুই নাই। অথচ তাঁহার সেনাপতিগণ এক একজন রাজসম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। লোকে দেখিল মহম্মদ বাহিরের সম্পদ ও সম্ভ্রমের মধ্যে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিয়াছিলেন। এই কথা যতদূর প্রচার হইতে লাগিল, একেবারে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। আবুবেকর ও আলি প্রভৃতি সকলেই এই ভাব লইয়া খলিফার কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। হায়! আমরা হৃদয়কে নিঃস্বার্থ রাখিতে পারি না বলিয়াই ধর্ম্মরাজ্যে কিছু করিতে পারি না! মানব-হৃদয়ের প্রেমে স্থান পাই না! লোকে বিষয়বুদ্ধির দ্বারা

চালিত হইয়া ভাবে, আপনার দিকে যদি না তাকাই, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। আপনাকে আগে বাঁচাও পরে সময় থাকিলে অপরকে দেখিও। বিষয়ী মানুষের ভাব এই;—পরের জন্য ভাবিবার বা কিছু করিবার বাধ্যতা আমার উপরে নাই; আমারটি আমি আগে বেশ করিয়া গুছাইয়া লই, পরে সময় ও সামর্থ্য থাকিলে অপরের জন্য কিছু করিতে প্রস্তুত আছি; আর যদি তাহা না করি, তাহাতেই বা কি? অপরে মরিল, ডুবিল, মজিল, হাজিল, তাহাতে আমাদের কি! আমার ঘরটী, আমার পরিবারটী ত সুখে রাখিলাম, তাহাতেই আমার সন্তোষ। এইরূপ স্বার্থচিন্তা করিতে করিতে মানুষের এক প্রকার অভ্যাস দাঁড়ায়, যখন পরার্থচিন্তা তাহার হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইলেও হৃদয়ে প্রবেশ করে না, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় গড়াইয়া পড়িয়া যায়। এ কথা বলাতে ইহাই কি বলা উদ্দেশ্য যে মানুষ আপনাকে দেখিবে না, আপনার গৃহ পরিবার রক্ষা করিবে না? যে ভার প্রধানরূপে আমার উপরে, যে ভার আমি নিজে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা বহন করা কি আমার কর্ত্তব্য নহে? এরূপ শাস্ত্র কে প্রচার করিবে? কথা এই—আমাদের হৃদয়ে থাকিবে না স্বার্থ কি পরার্থ, কিন্তু থাকিবে কল্যাণ; নিজের ও অপরের কল্যাণ। ক্ষুদ্র বা মহৎক্ষেত্রে কার্য্যের একই উদ্দেশ্য,—কল্যাণ। আমরা গৃহ বা পরিবারে যখন বাস করিব, তখন আলি দিয়া প্রাচীর তুলিয়া পরার্থ হইতে স্বার্থকে স্বতন্ত্র রাখি-

বার জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিব না; কিন্তু নিয়োগ করিব জীবনের মহত্ত্ব সাধনে, নিজের ও অপরের সম্পত্তিলাভের দিকে। যাঁহার পক্ষে পরার্থকে স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা সম্ভব নহে, এক দেখিতে গেলেই যিনি দুই দেখিয়া ফেলেন, তিনিই প্রকৃত কল্যাণকৃৎ; তিনিই এ জগতে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

যেখানে প্রীতি সেখানেই নির্ভর।

আমি যখন প্রথমে মহিস্থর রাজ্যে গমন করি, তখন অনুরুদ্ধ হইয়া সেখানকার একটি মহিলার গৃহে উপাসনা করিবার জন্য গিয়াছিলাম। সেই মহিলা আপনার কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যা সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষায় যাপন করিয়াছিল; তখনও সে বিবাহিত হয় নাই; উপাসনান্তে কন্যার মাতা সেই কন্যাটিকে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে লইয়া আসিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ বিঘ্ন থাকাতে তখন আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

কয়েক বৎসর পরে যখন পুনরায় আমি সে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন শুনিলাম সেই স্ত্রীলোকটী মারা গিয়াছেন। তাঁহার সেই কন্যাটির কথা জিজ্ঞাসা করাতে, "তাহার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন, সে মন্দ হইয়া গিয়াছে;" এইরূপ উত্তর পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে, হঠাৎ ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, "একটী স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।" আমি তাঁহাদিগকে আমার নিকট

লইয়া আসিতে বলিলাম। স্ত্রীলোকটি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন দেখিলাম, সে সেই পূর্ব্ববর্ণিতা কন্যা; সে আমাকে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে বিশেষ ভাবে তাহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে বলিল, "লোকে আমাদের প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া, এরূপ বলিয়াছে। আমরা বিবাহিত হইয়াছি; আমাদের আচার্য্য গোপনে আমাদের বিবাহ দিয়াছেন; আমার স্বামীও আমার সঙ্গে আসিয়াছেন;" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বিবাহ হইয়াছে?" সে বলিল "হাঁ, আমার বিবাহ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম "তোমাদের বিবাহ কি আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে?"

সে বলিল, "না, কোন আইন করা হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার স্বামী যদি তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তুমি কি করিবে?"

সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া স্বাভাবিক সরলতার ও দৃঢ়তার সহিত বলিল যে, "তিনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? যদিও তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা বারম্বার আমাকে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছে, ভয় দেখাইয়াছে, তথাচ তিনি কখনও আমাকে ত্যাগ করেন নাই এবং কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না।"

স্বামীর প্রতি তাহার নির্ভর ও বিশ্বাস এমনি যে, তাহার

তুলনা হয় না। আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তৎপরে বলিলাম "তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এস; তোমার মাতার বড়ই ইচ্ছা ছিল, যে তোমাকে সৎপাত্রস্থ করেন, তাহা হইয়াছে; কিন্তু তোমরা ভয়ঙ্কর নির্য্যাতন সহ্য করিতেছ। তোমাদের এই কার্য্যের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ আছে। তোমাদের প্রতি অন্য কাহারও প্রীতি না থাকিলেও আমার প্রীতি আছে।"

"তিনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন?" তাহার এই সরল নির্ভরব্যঞ্জক কথাটী আমার মনে এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে খাঁটি প্রীতি থাকে, সেখানেই আশা এবং তার সঙ্গে নির্ভর অবস্থিতি করে। যখন নিজের মনে নিরাশার উদয় হয়, সমাজের কথা ভাবিয়া মন নিস্তেজ হয়, নিরুৎসাহ আসে, তখনি মনে করি, ভগবানের প্রতি আমার বিশ্বাস ও প্রীতি চলিয়া যাইতেছে। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে বিশ্বাস ও আশা থাকিবেই।

একবার মহম্মদ কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; অনেক সৈন্য ও সেনাপতি হতাহত হইল; যখন সৈন্যদল সায়ংকালে শিবিরে প্রত্যাগত হইল, তখন শিবিরের চারিদিকে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল; স্ত্রী স্বামীর বিচ্ছেদে কাঁদিতেছে; ভ্রাতা ভ্রাতার বিয়োগে কাঁদিতেছে; পুত্র পিতৃশোকে কাঁদিতেছে! সেই হাহাকার, কোলাহল এবং ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে মহম্মদ এক বৃক্ষতলে স্থির গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার মুখে

নিরাশা নাই ; অধীরতার চিহ্ন মাত্রও লক্ষ্য করা যায় না। একজন গিয়া মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে মহাপুরুষ! তোমারই বিশেষভাবে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তুমি কি করিয়া সুস্থির রহিয়াছ?" মহম্মদ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তোমরা স্থির হও ; বিলাপ করিও না ; প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই।" ভয়ঙ্কর নিরাশার ভিতরে তিনি আশার আলোক দর্শন করিলেন! বিনাশের ভিতরে তিনি মঙ্গল দেখিলেন! এখানেই তাঁহার মহা-পুরুষত্ব। যেখানে প্রীতি সেখানেই আশা ও বিশ্বাস।

আমরা যে ভগবানে নির্ভর করিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, আমাদের সেইরূপ প্রীতি ও বিশ্বাস নাই। আমরা মৃতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি! আমাদিগকে দেখিলেই অন্যের মনে হয়, এ মানুষ গুলির বিশ্বাস নাই, আশা নাই।

প্রেম যদি থাকিত, তবে কি দেখিতাম? দেখিতাম এ জগৎ ত তাঁহার, আমাদের কাহারও নহে ; এ জগতের কর্ত্তা তিনি, তুমি আমি কে? আমরা ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, ইচ্ছা করিয়া যাইব না ; এ জীবনের মূলে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। সেই জগৎপতি যদি তাঁহার জগৎ রক্ষা করিতে পারেন, তবে আমাদের ভার কি বহন করিতে পারেন না? তাঁহার প্রতি বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই এত দুর্গতি। প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় হইবেই, এই বিশ্বাস আমাদের মনে যেমন প্রবল, সেইরূপ

ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবেই, ইহাতে কি সেইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকি ?

ঐ মেয়েটী যাহা বলিয়াছিল, তাহার নির্ভরের ভূমি কোথায় ? কি দেখে সে ঐরূপ বিশ্বাসী হইয়াছিল ? প্রেমেতেই তাহার বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। আমাদের হৃদয়ে এক বিন্দু প্রেম আসিলে বাঁচিয়া যাই ।

আমাদিগকে কখন ভাল দেখায় ? একজন কবি বলিয়াছেন, "সুন্দর যিনি, তাঁর চক্ষের জল তাঁর হাসির চেয়ে মিষ্ট"। ঘন ঘটার মধ্যে যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন কেমন সুন্দর দেখায় ! যখন মানুষ নিরাশার অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হয়, তখন আশা আসিয়া জীবন ও সৌন্দর্য্য দান করে ।

প্রেম ও সেবা।

ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারেও আর একটী উদ্ধৃত করিতেছি। সে আখ্যায়িকাটী এই,—খ্রীষ্টীয়গণ বিশ্বাস করেন যে মহাত্মা যীশুর মৃত্যুর তিন দিবস পরে তিনি সমাধি হইতে সশরীরে উঠিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে দেখা দিয়াছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি না। কেবল তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে যাইতেছি। বাইবেল গ্রন্থে আছে যে, যীশুর মৃত্যুর পরে একদিন পিটার প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ রাত্রিকালে মৎস্য ধরিতে গেলেন। সমস্ত রাত্রি জাল ফেলিয়াও কিছু ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে রজনীর অবসানকালে যখন তাঁহারা নিরাশমনে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, তখন ঊষাকালের ক্ষীণালোক ও নৈশ অন্ধকারের আবরণের মধ্যে কে একজন তাঁহাদের নিকটে আসিলেন! শিষ্যগণ প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। নবাগত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের নিকট কি কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে ?" শিষ্যগণ বলিলেন—"না।" তখন তিনি আদেশ করিলেন,—"তরণীর দক্ষিণ পার্শ্বে জালখানা আর একবার ফেল!দেখি, কিছু পাও কি না।" তাঁহার আদেশে

জাল ফেলিবামাত্র তাঁহারা মৎস্যের ভারে জাল আর তুলিতে পারেন না। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, এ আর কেহ নয়, স্বয়ং যীশু। তৎপরে প্রজ্বলিত অনলে মৎস্য সিদ্ধ করিয়া তিনি সশিষ্যে আহার করিলেন। আহারান্তে যীশু তাঁহার শিষ্যগণের অগ্রণী-স্বরূপ পিটারকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোনার পুত্র সাইমন; তুমি কি ইহাদের সকলের অপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাস?" তিনি উত্তর করিলেন—"হাঁ প্রভো! আপনি ত জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি।" যীশু বলিলেন, "তবে আমার মেষশিশুগুলির পরিচর্য্যা কর।" যীশু দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিলেন—"যোনার পুত্র সাইমন! তুমি কি আমাকে ভালবাস?" পিটার উত্তর করিলেন—"হাঁ প্রভো! আপনি ত জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি।" তখন যীশু বলিলেন—"তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর।" যীশু তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোনার পুত্র সাইমন! তুমি কি আমাকে ভালবাস?" পিটার কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন, কারণ যীশু তিন তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভালবাস কি না? তিনি পুনরায় বলিলেন—"প্রভো, আপনি ত সকলি জানেন, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।" তখন যীশু বলিলেন, "তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর।"

যে জন্য এই আখ্যায়িকাটী উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা এই; যীশু তিন তিন বার তাঁহার শিষ্যপ্রধান পিটারকে জিজ্ঞাসা

করিতেছেন, আমাকে ভালবাস কি না ? এবং তিন তিন বার বলিতেছেন, তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর। ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ কি এই যে যীশু পিটারের ভালবাসার প্রতি সন্দিহান ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত হন, সেই শেষ মুহূর্ত্তে পিটার প্রাণভয়ে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন, "কে এই যীশু, আমি ইহাকে চিনি না ;" সেই কারণেই কি যীশু তাঁহার ভালবাসার প্রতি সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন ; তাই বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভাল বাস কি না ; তাহা নহে। পিটারের ভালবাসার প্রতি তাঁহার সংশয় ছিল না। তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পিটার গুরুভক্তির বিষয়ে অগ্রগণ্য। তবে বার বার এই প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য একটী মহাসত্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে দৃঢ় মুদ্রিত করা। সে সত্যটী এই, যেখানে প্রেম সেই খানেই সেবা। তিনি উক্ত প্রশ্নত্রয়ের দ্বারা এই কথাই বলিলেন, আমাকে তোমরা যদি ভালবাস, তবে যাহারা আমার প্রিয়, যাহারা আমার আশ্রিত, তাহাদিগের পরিচর্য্যা কর।

এখানে মেষশিশু ও মেষ বলিতে খ্রীষ্টাশ্রিত উপাসকমণ্ডলী বুঝিতে হইবে। মেষশিশু উক্ত মণ্ডলীভুক্ত বালকবালিকাগণ —মেষ নরনারী। যীশুর উক্তির তাৎপর্য্য এই, আমাকে যদি যথার্থ ভালবাস, তাহা হইলে সেই প্রীতির খাতিরে আমি যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি, তাহাদের

রক্ষা, শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত থাক। যীশু জানিতেন যে ঘোর নির্য্যাতন তাঁহার উপরে আসিয়াছিল, তিনি চলিয়া গেলেই দ্বিগুণ উৎসাহে সেই নির্য্যাতন তাঁহার আশ্রিত উপাসকমণ্ডলীকে আক্রমণ করিবে। তাহাদের অধিকাংশ অজ্ঞ, অশিক্ষিত, দীন দরিদ্র লোক, সমাজে নগণ্য, ক্ষমতা ও প্রভুত্বে অতি হীন। যাহারা নির্য্যাতন করিবে তাহারা সমাজ-পতি ঐশ্বর্য্যশালী ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে আবার তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে অনাসক্ত, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহারা আহত হইয়াও আত্মরক্ষার্থ হস্তোত্তোলন করিবে না। সুতরাং সেই ঘোর নির্য্যাতনের মধ্যে তাহারা বৃক-তাড়িত মেষযূথের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। লৌকিক ভাবে যাহারা এরূপ বলহীন হইবে, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবে বলশালী করিতে পারে, এমন কেহ যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এই জন্যই তিনি পিটারকে প্রধানরূপে ঐ ভার দিয়াছিলেন। ভার দিবার সময় তিনি প্রেমের দোহাই দিলেন—বলিলেন, আমাকে যদি ভালবাস, তবে আমার যাহারা, তাহাদের পরিচর্য্যা কর। ইহা অপেক্ষা অধিক বলবান কার্য্যের প্রেরক আর কি হইতে পারে? প্রেমের স্বভাব এই যে, প্রেমাস্পদের প্রিয় যে সেও প্রেমিকের প্রিয় হয়। প্রেমাস্পদের আশ্রিত যাহারা তাহারাও নিজের আশ্রিত বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রমাণ অন্বেষণের জন্য বহু দূরে গমন করিতে

হইবে না। মানব-সমাজে প্রতিদিন দেখিতেছি অকৃত্রিম মিত্রতা যেখানে আছে, সেখানে একজনের পরিবার অপরের পরিবার পরিজনের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতেছে। বন্ধুর পরিবার পরিজনের ভার বহিতে কোনও প্রেমিক ব্যক্তি কখনও আপনাকে ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে করেন নাই।

আখ্যায়িকাটীর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিলে আরও অনেকগুলি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে নিজের নবপ্রচারিত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আশ্রিত উপাসকমণ্ডলীর পরিচর্য্যাকে প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাব এইরূপ বোধ হয়, তিনি যেন বলিলেন—"যদি আমার আশ্রিত উপাসকমণ্ডলীকে রক্ষা করিতে না পার, বাহিরে আমার ধর্ম্মপ্রচার করিয়া উঠিতে পারিবে না।

আর একটী উপদেশ এই, মেষগুলির উল্লেখের অগ্রে মেষশিশুগুলির উল্লেখ করিলেন। ইহার অর্থ এই, ধর্ম্মসমাজের উন্নতি যদি চাও বালক বালিকাদিগের প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হও। তাহাদের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়, তাহারা যাহাতে পরে উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসমাজের কার্য্য হস্তে লইতে পারে, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। যে ধর্ম্মসমাজ এ বিষয়ে অমনোযোগী, তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

উক্ত আখ্যায়িকার আর একটী উপদেশ এই, তিনি

পিটারকেই প্রধানরূপে এই ভার দিলেন, অপরকে দিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, ধর্ম্মসমাজ-মধ্যে যাঁর শক্তি যত প্রধান, পদ যত উচ্চ, মণ্ডলীর পরিচর্য্যা বিষয়ে তাঁহার দায়িত্ব তত অধিক। যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বদা বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের অপেক্ষা হীন, তিনি সকলের ভৃত্য। ইহাতে উক্ত দায়িত্ব-জ্ঞান কেমন পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে! ইহাতে কি একটী মহাসত্য নিহিত নাই? যাহার যে কিছু ক্ষমতা বা শক্তি বা প্রভুত্ব আছে, তাহা ত ঈশ্বর-প্রদত্ত; ঈশ্বর ঐ শক্তি কি কারণে দিয়াছেন? তাঁহার কার্য্যে লাগিবে বলিয়া; সুতরাং শক্তি-সামর্থ্য বিষয়ে যিনি যত অগ্রগণ্য, তাঁহার কর্ত্তব্য-ভার তত গুরুতর।

আরও নিমগ্ন হইয়া দেখিলে দেখিতে পাই, যে ইহার মধ্যে আরও গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যীশু পিটারকে আদেশ করিবার অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমাকে ভাল বাস? যখন শুনিলেন হাঁ, তখন বলিলেন,—"তবে আমার মেষদলের পরিচর্য্যা কর।" আমরা এ জগতে যে মানুষকে আদেশ করি, কোনও কাজে লাগাই, কোনও উপকার করিতে অনুরোধ করি, তাহার ভিতরে একটা বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে। সকল স্থলে এরূপ আদেশ করিতে ও সেবা লইতে সাহস হয় না। যেখানে প্রেমের বন্ধন আছে, সেই খানেই এরূপ সেবাতে লাগাইতে সাহস হয়। যে আমাকে ভাল বাসে, অকপটে

প্রীতি করে, তাহাকেই আমার জন্য ক্লেশ দিতে সাহসী হই। কলিকাতার ন্যায় একটা সহরে প্রতিদিন কত লোক দেখিতেছি, আলাপ ও আত্মীয়তাসূত্রে কত লোকের সহিত মিশিতেছি, এই উপাসনা স্থানে প্রতি রবিবার কত লোক আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত এখানকার উপাসনা ও উপদেশাদিতে প্রীত হইয়া যাইতেছেন, অনেকে হয় ত আমাকে না জানিয়া দূর হইতে বলিতেছেন, "বাঃ এখানকার আচার্য্য ত বেশ লোক", জিজ্ঞাসা করি, এই যে অনির্দ্দিষ্ট, ক্ষণস্থায়ী জনমণ্ডলী, ইঁহাদের সকলকে কি আমি আমার জন্য ক্লেশ দিতে সাহস করি? সকলকে কি আমার কোনও কাজ করিয়া দিতে অনুবোধ করিতে পারি? কখনই না। এই অনির্দ্দিষ্ট জনমণ্ডলীর কথাই বা বলি কেন? যাঁহাদের সঙ্গে এক সমাজে বিগত পঁচিশ বৎসর বাস করিতেছি, যাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতেছি, যাঁহাদের মুখ প্রতিদিন দেখিতেছি, যাঁহাদের সঙ্গে প্রতিদিন মিশিতেছি, তাঁহাদের সকলকেই কি আমার জন্য ক্লেশ দিতে বা আমার কোনও কাজ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করি? ইঁহারা সকলেই কি সেই অর্থে আমার বন্ধু? কখনই না। যাঁহারা মনের মধ্যে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছেন, আমার কাজ কর্ম্ম যাঁহারা অপ্রেমের চক্ষে দেখিতেছেন, তাহার গুণ ভাগ অপেক্ষা দোষ ভাগই অধিক পরিমাণে যাঁহাদের চক্ষে পড়িতেছে, তাঁহাদিগকে

কিরূপে আমি নিজের কোনও কাজ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি? বাতুল না হইলে এরূপ স্থলে কেহ কাহাকেও ক্লেশ দিতে সাহসী হয় না। আর যদিও বা সাহস করা যায়, সে সেবাতে তাহাদের আত্মার কল্যাণ নাই, আমারও সুখ নাই। অপ্রেমে মুখ ফিরাইয়া মানুষ যে কাজ করে, তাহাতে চিত্তে সুখ প্রসব না করিয়া অসুখই প্রসব করে। প্রেম ও প্রকৃত বন্ধুতার স্থলে ঠিক ইহার বিপরীত। যে আমাকে অকপটে ভাল বাসে, সে আমার জন্য ক্লেশ পাইলে সুখী হয়; এবং আমি ক্লেশ দিবার ভয়ে কোনও অনুরোধ করি নাই জানিলে ঘোর অভিমান করে।

ইহা মানব-হৃদয়ের প্রেমের স্বভাব। এরূপ অবস্থা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। মফঃস্বলের কোনও স্থলে একজন বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহার পত্নী আমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন; আমাকে খাওয়াইয়া, সেবা করিয়া, তিনি বড় সুখী হইতেন। একদিন আমি অগ্রে সংবাদ না দিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রেলযোগে হঠাৎ সেই সহরে উপস্থিত হইলাম; ভাবিলাম, "এত রাত্রে গিয়া তাঁহাদিগকে জাগাইব না; ভদ্রলোকের মেয়ে কোনও ক্রমেই নিজহস্তে রন্ধন করিয়া না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না; দূর হোক রেলওয়ের ওয়েটিংরুমে পড়িয়া থাকি, প্রভাত হইলেই যাইব;" এই বলিয়া ওয়েটিংরুমে পড়িয়া রহিলাম। প্রাতে গিয়া যখন বলিলাম, "রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়াছিলাম, তোমাদিগকে ক্লেশ দিবার ভয়ে ওয়েটিংরুমে পড়িয়া-

ছিলাম," তখন আমার বন্ধুর গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"ওমা? এত দিনের পরে বুঝলাম, আপনি আমাদিগকে ভাল বাসেন না। যদি ভাল বাসতেন, তা'হলে বুঝতেন যে আপনি রাত্রে আসলে আমাদের ক্লেশ না হয়ে সুখই হত।"

প্রেম ক্লেশ পাইতে ভাল বাসে ও ক্লেশ দিতে সাহসী হয়। এই সত্যটীকে একবার সকলে ঈশ্বর-প্রীতিতে আরোপ করিবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই ইতিহাসের একটী সমস্যার উত্তর পাইবেন। সে সমস্যাটী এই;—ইতিহাসে আমরা যাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া জানি, যাঁহারা বহু তপস্যার দ্বারা আপনাদের জীবনকে মহৎ করিয়াছিলেন,এবং অকপট হৃদয়ে মানুষকে প্রীতি করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাজনের জীবন দুঃখ কষ্ট ও কঠিন পরীক্ষাতে পরিপূর্ণ ছিল। যে মহাত্মার উক্তি লইয়া অদ্য আলোচনা করিতেছি, তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা যাউক। কপটাচারী স্বার্থপর ফিরুশিগণ সুখে থাকিল; বিলাসপরতন্ত্র ধনিগণ আমোদ-তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল; অর্থলোলুপ বিষয়িগণ বিষয়সুখে মগ্ন থাকিল; কিন্তু তাঁহার নাম হইল (man of sorrows), অর্থাৎ চিরবিষণ্ণ মানুষ; তিনি শৃগাল কুকুরের ন্যায় নগরে নগরে তাড়িত হইয়া বেড়াইলেন; কণ্টকের মুকুট মস্তকে পরিলেন; চোর বা দস্যুর উপযুক্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল "এই ব্যক্তি পরের পরিত্রাণ দিতে আসিয়াছে, কিন্তু নিজকেই রক্ষা করিতে পারিল না।" এই নির্দ্দোষ, মানব-

হিতৈষী, করুণাপরতন্ত্র মহাপুরুষের যাতনা ও পরীক্ষার বিষয় স্মরণ করিয়া হয় ত কোনও মুহূর্ত্তে কেহ ঈশ্বরকে বলিতে পারেন—"একি ঠাকুর, সমুদয় মন প্রাণ দিয়া যে তোমাকে ভজে, তার প্রতি তোমার এই ব্যবহার?" এ প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলেন—"যে আমাকে অকপটে ভাল বাসে সে ভিন্ন আমার জন্য ক্লেশ ও পরীক্ষা আর কে সহিবে?"

ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধির জন্যই ধার্ম্মিকের ক্লেশ পাওয়া আবশ্যক। চন্দনকে শিলায় ফেলিয়া ঘষিলেই তাহার সুবাস চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়! যেমন অন্ধকারে না ঘিরিলে আলোকের প্রকৃত শোভা প্রকাশ পায় না, তেমনি দুঃখ, বিপদ পরীক্ষাতে না ঘিরিলে সাধুর সাধুতা ও বিমল ঈশ্বরপ্রীতির শোভা প্রকৃতরূপে প্রকাশ পায় না।

এই জন্যই ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে প্রেম ও সেবা এই উভয়কে একত্র বাঁধা দেখিতেছি। যেখানে প্রেম সেই খানেই সেবা। এ সংসারে মানুষ মানুষের জন্য খাটিয়া সারা হইতেছে, এই টুকুই মানুষের মনুষ্যত্ব। ইতর প্রাণীরাও শিশুসন্তান-দিগের জন্য খাটিয়া সারা হয়; সে প্রাকৃতিক নিয়মে, অন্ধ প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া; কিন্তু শিশু আত্মপোষণ ও আত্ম-রক্ষাতে সমর্থ হইলে আর তাহা থাকে না। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে দেখ, শত শত জন ঘুমাইতেছে, এক জন হয় ত তাহাদের জন্য জাগিতেছেন। পল্লীতে কলেরা দেখা দিয়াছে, সন্তানগণ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে, পরিবারের পিতা অনিদ্রায়

স্বীয় শয্যাতে পড়িয়া চিন্তা করিতেছেন—ইহাদের রক্ষার কি উপায় করি। এক জন গৃহস্থ স্বীয় পরিবারের জন্য যাহা করেন, সাধুরা সমগ্র জাতির জন্য তাহা করিয়াছেন। ইংলণ্ড-বাসকালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, কোনও উপাসনা-গৃহে গেলে, তাঁহাদের উপাসনা কালে বসিয়া ক্রন্দন করিতেন; লোকে ভাবিত বুঝি ভাবাবেশে কাঁদিতেছেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বলিতেন, "আমার স্বদেশের কথা মনে হয়, আমার স্বদেশবাসিগণ কিরূপ উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের মধ্যে নিমগ্ন আছে, তাহা ভাবি বলিয়া কাঁদি।" ইহা কেবল মানুষেই সম্ভব, যে হাজার হাজার ক্রোশ দূরে বসিয়া সমগ্র জাতির জন্য কাঁদিতে পারে।

ঈশ্বরকে যাঁহারা অকপট প্রীতি করেন, তাঁহারাই মানবের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করেন; এই নিয়ম চিরদিন ধর্ম্ম-জগতে কার্য্য করিতেছে। আমাদের ঈশ্বরপ্রীতি যে অনেক পরিমাণে মৌখিক তাহার প্রমাণ এই, আমরা মানবের সেবাতে আপনাদিগকে দিতে পারিতেছি না, সুখাসক্তি ও স্বার্থপরতা আসিয়া বাধা দিতেছে। হায়! ইহা ভাবিলে কত কষ্ট হয়, যে মুখে এত বিশ্বাস ও ভক্তির কথা বলিতেছি, অথচ আমাদের ব্যবহার অনেক পরিমাণে নাস্তিকের মত। নাস্তিক না হইলে স্বীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এত চলিব কেন? সম্মুখে ক্লেশ ও পরীক্ষা দেখিয়া কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইব কেন? প্রার্থনাতে এরূপ অবিশ্বাসী হইব কেন? ঈশ্বরের দয়াময় নামকে একটা

ছেলে ভুলান ব্যাপার করিয়া রাখিব কেন? আমাদের কাজকর্ম্ম বিশ্বাসী লোকের ন্যায় নয়, এই জন্য আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের নামের শক্তি জাগিতেছে না। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, তাঁহার শক্তিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে,প্রকৃত প্রেমিক হৃদয় ভিন্ন সে শক্তি খোলে না। অয়স্কান্তমণি বা আতসী কাচের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্রই আছে, এবং সকল পদার্থেই পড়ে, কিন্তু অয়স্কান্তমণিতেই তাহা ঘনীভূত ও কেন্দ্রগত হয়, এবং অগ্নি উদ্গীরণ করে। আমরা প্রকৃত প্রেমের অভাবে এই শক্তি ধরিতে পারিতেছি না; এবং মানবের সেবাও করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বর করুন আমাদের দুরবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

উপাসনার বিঘ্ন।

(০)

একদিন বেদী হইতে সংকেতের কথা কিছু বলিয়াছিলাম। মানুষ সকল বিষয়েরই একটা সংকেত জানিবার জন্য ব্যগ্র। বিদ্যালয়ে যে পড়িতেছে, তাহাকে যদি বলা যায়, এমন একটা সংকেত বলিয়া দিতে পারি, যাহাতে অল্পকালের মধ্যে উত্তমরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সে আমার সঙ্গ লইবে, এবং যতক্ষণ না সে সংকেতটী জানিতে পারে, ততক্ষণ আমাকে ছাড়িবে না। একবার আমার ফরাসী ভাষা শিখিবার ইচ্ছা হওয়াতে বাজারে তদুপযোগী গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, অন্বেষণ করিতে করিতে জানিতে পারিলাম, এরূপ একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, যাহার নাম How to learn French in six months—অর্থাৎ ছয় মাসে কিরূপে ফরাসী ভাষা শেখা যায়? অমনি মনে করিলাম, এই পুস্তকই আমার জন্য। কারণ নানা কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্যে আমি যথেষ্ট সময় দিতে পারিব না, বিশেষ পরিশ্রম করিতে পারিব না, বিনা আয়াসে ছয় মাসের মধ্যে যদি ফরাসী ভাষা শেখা যায়, তবে মন্দ কি? এই পুস্তকই আমাকে লইতে হইবে। গড়ের উপর এইমাত্র বক্তব্য যে, সংক্ষেপে যাহা জানিতে বা করিতে পারা যায়, সেজন্য মানুষ শ্রম দিতে প্রস্তুত নয়।

যাঁহারা ধনের জন্য এই সহরে খাটিয়া মরিতেছে, তাহারা যদি আজ শুনিতে পায়, জগন্নাথের ঘাটে একজন্ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, যিনি রূপাকে সোণা করিয়া দিতে পারেন, আমার নিশ্চয় মনে হয়, এই সংবাদে দলে দলে লোক টাকার পুঁটুলি লইয়া জগন্নাথের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইবে! রাতারাতি বড় মানুষ হইবার জন্য এমনি ব্যগ্রতা! আমরা সংবাদ-পত্রে মধ্যে মধ্যে পাঠ করি, এইরূপ কোন কোন ভণ্ড সন্ন্যাসী লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া অনেক টাকা লইয়া পলাইল, লোকে ধনের লোভে নির্ধন হইয়া গেল। একজন প্রাচীন কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

প্রণমত্যুন্নতিহেতোর্জীবিতহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্।
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কোমূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ॥

অর্থ—উন্নতির আশাতে অবনত হয়, জীবিকার জন্য জীবন ত্যাগ করে, সুখের লোভে দুঃখ পায়, পরের সেবক যে তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কে?

আমি বলি, বিষয়াসক্ত মানবের মত নির্ব্বোধ কে, যে ধনের জন্য শরীর ভগ্ন করে কিন্তু সে ধন ভোগ করে না; স্ত্রীপুত্রের সুখের জন্য ধন অর্জ্জন করে, কিন্তু সেই ধনের কারণে তাহাদের সঙ্গেই ঘোর অশান্তিতে বাস করে; এবং ধনের লোভে নির্ধনতার মধ্যে পতিত হয়!

যাক্ সে কথা, রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা যে কেবল ধনলোভী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই দেখা যায় তাহা

নহে ; ধর্ম্মসাধকদিগের মধ্যেও দেখা যায়। * শ্রমকাতর ধনলোভীর ন্যায় শ্রমকাতর ধর্ম্মসাধকও আছে, যাহারা সর্ব্বদা একটা সংকেতের অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা যদি আজ শুনে যে একজন এমন সাধু দেখা দিয়াছেন, যিনি চক্ষে চক্ষে চাহিয়া আগুনে টিকাখানি ধরাইবার ন্যায় এক মুহূর্ত্তে মনে ধর্ম্ম ধরাইয়া দিতে পারেন, অমনি দেখিবে দলে দলে লোক সেই সাধুর চরণে গিয়া পতিত হইবে। এইরূপ অনেক লোক মানুষ গুরুর চরণে দেহ মন, বিদ্যা বুদ্ধি, চিন্তা ও স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়াছেন ; এ দেশে আজিও বহুলোক করিতেছেন !

একটা সংকেত চাই, একটা সংকেত চাই, যাহাতে অল্প আয়াসে ত্বরায় ধর্ম্ম করিয়া লওয়া যাইতে পারে ! এই শ্রেণীর শ্রমকাতর সাধকদিগের জন্য একটা সংকেত দেওয়া দুষ্কর। এমন কিছুই বলিতে পারা যায় না, যাহাতে দুরন্ত পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা নাই। জগদীশ্বর মানবের জন্য ধর্ম্মকে হাতের কাছেই রাখিয়াছেন, কিন্তু মুরগী যেমন খাদ্যবস্তু পাইয়াও নিজ চরণের দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া তাহাকে আবরণ করে, ও পশ্চাদ্বর্ত্তী শাবকদিগকে বলে খুজিয়া লও, তেমনি যেন জগজ্জননী আমাদের আত্মার খাদ্য বস্তু যে ধর্ম্ম, তাহাকে হৃদয়-গুহাতে নিহিত করিয়া বলিতেছেন, খুজিয়া লও। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিসকলকে বিকশিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ; যে দিক দিয়াই যাও, সাধনের শ্রম অপরিহার্য্য।

তবে যাঁহারা ভাবিয়াছেন, খাটিয়াছেন, পড়িয়াছেন, উঠিয়া-

ছেন, কাঁদিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তাঁহারা দুই একটা পথ দেখাইতে পারেন, দুই একটা বিপদ জানাইতে পারেন, এই মাত্র। ইহাকে যদি সংকেত বলিতে হয় বল। এইরূপ কয়েকটা সংকেতের বিষয় বলিতে যাইতেছি।

আমাকে অনেক সময় অনেকে একটী প্রশ্ন করিয়াছেন, উপাসনা সরস হয় না কেন? দিনের পর দিন যায়, উপাসনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, যেন নিয়ম রক্ষাই করিতেছি। আত্মাতে ভগবদ্ভক্তির উদয় দেখি না, ঈশ্বরের প্রেম-মুখ যেন আচ্ছাদিত থাকে, এরূপ কেন হয়? এরূপ অবস্থা আমরা সকলেই সময়ে সময়ে অনুভব করিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ কি? ইহা নিবারণের উপায় কি? সিদ্ধপুরুষদিগের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি, তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের নাম কখনই নীরস হইত না। চৈতন্য যখনি হরিনাম করিতেন, তখনি যে শুনিত, যে দেখিত, সেই বলিত "আহা মরি মরি, ঐ চাঁদমুখের বালাই লয়ে মরি।" হরিনাম এমনি মিষ্ট লাগিত। মহম্মদ যখন নমাজ করিতেন, তখন পাষাণ দ্রব হইয়া যাইত। নানক যখন হরিনাম করিতেন, তখন দুরন্ত পাতকীও গলিয়া যাইত। প্রভুর সেই নাম কেন আমাদিগের হৃদয়কে সরস করিতে পারে না? কিসে সরসতা আসে? ইহার সংকেত কোথায়?

ইহার উত্তরে হয়ত অনেকে বলিবেন, সাধন কর, সাধুসঙ্গ কর, সংগ্রন্থ পাঠ কর, নাম জপ কর, আত্মপরীক্ষা কর ইত্যাদি। এরূপ উত্তর আমিও অনেক সময় মানুষকে দিয়াছি।

কিন্তু তদুত্তরে শুনিয়াছি, সাধুসঙ্গে রুচি থাকিলে ত সাধুসঙ্গ করিব? সাধুসঙ্গ বা সৎগ্রন্থ-পাঠ কিছুই করিতে ইচ্ছা করে না। যে কারণে উপাসনার সরসতা নাই, সেই কারণে এ সকলেও রুচি নাই। এই উত্তর শুনিয়া ব্যাধি কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া নিরুত্তর থাকিয়াছি এবং ভাবিতে বসিয়াছি। নিজেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সুতরাং ভাবিবার পক্ষে কিছু সহায়তাও হইয়াছে। অবশেষে কয়েকটী সংকেত ধরিয়াছি। অর্থাৎ কিসে উপাসনা সরস হয়, তাহার সংকেত নহে, কেন উপাসনা সরস হয় না, তাহার সংকেত বুঝিয়াছি।

যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা এই, যেমন কোনও দ্রব্যে রঙ্গ লাগাইতে হইলে অগ্রে তাহাতে আস্তর দিতে হয়, অর্থাৎ অগ্রে জমি প্রস্তুত করিতে হয়, তেমনি উপাসনার সরসতারও একটা জমি আছে, আত্মার অবস্থা বিশেষ আছে, যাহা ভিন্ন উপাসনার ফল ফলে না। ক্রমে ক্রমে এরূপ কয়েকটী সংকেত নির্দ্দেশ করিতেছি :—

(হৃদয়কে উপাসনার অনুকূল রাখিবার জন্য প্রথম আবশ্যক জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে পবিত্র ও মহৎ রাখা।) তুমি যে মানুষ সংসারে বাস করিতেছ, তুমি কি চাহিতেছ? তুমি কিরূপ হইলে, ও কি পাইলে সুখী হও? পরীক্ষা করিয়া দেখ তুমি খুব ধনবান হইবে, তোমার দুই হাজার টাকা দশ হাজার হইবে, দশ হাজার বিশ

হাজার হইবে, বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার হইবে, তুমি স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ধনী করিয়া রাখিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে একটু একটু পরোপকারও করিবে, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি প্রতাপ ও প্রভুত্বে অগ্রগণ্য হইবে, দশজন তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিবে, সমাজমধ্যে মান্য গণ্য মানুষ হইবে, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি বিষয়ীদের মধ্যে একজন প্রধান হইবে, তোমার অশ্বগণ উৎকর্ণ হইয়া সহরের রাজপথ কাঁপাইয়া ছুটিবে, দশদিকে তোমার দশখানা বাড়ী থাকিবে, বিষয়ীগণ কোনও কাজ করিতে হইলে, তোমাকে বাদ দিয়া করিতে পারিবে না, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি পণ্ডিত ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে, সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে তোমার প্রশংসাধ্বনি গীত হইবে, তুমি তাহা শুনিতে শুনিতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইবে, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি ঈশ্বরের প্রদত্ত শক্তিসকলকে ব্যবহার করিয়া ও তাঁহার আদেশাধীন থাকিয়া নিজের ও অপরের উন্নতি ও কল্যাণ-সাধনে নিজের দেহ মনকে নিযুক্ত রাখিবে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তুমি জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি, এই সকলের দ্বারা নিজ জীবনকে উন্নত ও মহৎ করিবে, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? যাহার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, ঈশ্বরোপাসনা তাহার পক্ষে আকাশে সূত্র-

হীন মাকু চালাইবার ন্যায়, বিফল শ্রমমাত্র। জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ না রাখিলে উপাসনা সরস হয় না।

দ্বিতীয় প্রয়োজন অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা; সর্ব্ববিষয়ে নিজের অভিসন্ধিকে পবিত্র রাখা। পদে পদে মানুষের এমনি বিপদ ঘটে, যে মানুষ অনেক সময়ে না জানিয়া ক্ষুদ্র অভিসন্ধিতে মহৎ কাজ করে। কিছু দিন হইল ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয়ান নামে একখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে. লেখক তাহাতে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, তাঁহার নায়কের ধর্ম্মোৎসাহ, বৈরাগ্য, স্বার্থনাশ, পরসেবা, ইত্যাদির মূলে ছিল একজন রমণীর হৃদয়কে পরাজিত করিবার ইচ্ছা। একজন রমণীর জন্য এতদূর করা উপন্যাসের অত্যুক্তি হইলেও, একথা সত্য যে আমরা অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে ক্ষুদ্র ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাধুকার্য্যে যোগ দিয়া থাকি। কঠোর বৈরাগ্যের আচরণ করিতেছি, আমার হারান সুনাম ফিরিয়া পাইবার জন্য, সমাজের কার্য্যে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়াছি, অপর এক ব্যক্তিকে দমন করিবার জন্য, দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা করিতেছি, অপর একজনকে দুকথা শুনাইয়া দিবার জন্য, উপাসনা মন্দিরে আসিতেছি, স্ত্রীলোক দেখিবার বা নারীকণ্ঠের গান শুনিবার জন্য। পরস্পরে এইগুলি আপনার আপনার প্রতি খাটাইয়া দেখ, মানুষ ক্ষুদ্র অভিসন্ধিতে মহৎ কাজ করিতে পারে কি না? যেখানে মূলে দূষিত অভিসন্ধি থাকে, সেখানে উপাসনা সরস হয় না। এই

জন্য উপাসনার সরসতাসাধনের একটা প্রধান সংকেত এই, সর্ব্ববিধ কার্য্যে অভিসন্ধি হইতে দূষিত পদার্থ উৎপাটিত করিয়া ফেলা। কোনও কাজ করিতে যাইবার সময় যদি দেখ হৃদয়ের অভিসন্ধিটা নির্দ্দোষ নহে, আর সে কার্য্যে পা বাড়াইও না; বক্তৃতা করিতে উঠিবার সময় যদি দেখ প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতেছ আর উঠিও না; কোনও কাজে হাত দিয়া যদি দেখিতে পাও, স্বার্থের গন্ধ রহিয়াছে, তবে সে কাজ হইতে অপসৃত হও; সে পথ তোমার জন্য নিরাপদ নহে; সতর্ক হইয়া অভিসন্ধিকে এরূপে বিশুদ্ধ না রাখিলে উপাসনাকে সরস রাখা যায় না।

তৃতীয় বিঘ্ন অহংকার; বুদ্ধিমত্তার অহংকার, বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার, শক্তিসামর্থ্যের অহংকার, সর্ব্বোপরি ধার্ম্মিকতার অভিমান প্রভৃতি অহংকার অনেক প্রকারের আছে। কেহ মনে করেন দলের মধ্যে আমি বুদ্ধিমান, আর সকলে বোকা; তারা পয়সা রাখে না আমি কেমন পয়সা রাখিতে পারি, ওরা সমাজের প্রকৃত কার্য্যপ্রণালী বোঝে না, আমি কেমন বুঝিতে পারি; ইত্যাদি। কেহ ভাবেন আমিই জ্ঞানী আর সকল গুলা মূর্খ ও অজ্ঞ; কেহ মনে করেন, আমিই মহৎ ভাবে কাজ করি, আর সকল গুলা ছোট লোক; কেহ ভাবেন বলিতে কহিতে, কাজ উদ্ধার করিতে আমি সুপটু, অপর গুলো অকর্ম্মণ্য; কেহ মনে করেন, আমি সাধক অপর গুলা কেবল খায় ও ঘুমায়; এইরূপে অপরের

সহিত তুলনাতে আপনাকে বড় ভাবা, ইহার ন্যায় সরস উপাসনার শত্রু আর নাই। একথা আমরা কতবার আলোচনা করিয়াছি যে, ব্রহ্মডাঙ্গায় জল দাঁড়ায় না। এই যে কয়েক দিন ধরিয়া নিরন্তর বৃষ্টি হইল, জল কি সকল স্থানে দাঁড়াইয়াছে? যেখানে খানাখন্দ পাইয়াছে সেই খানেই দাঁড়াইয়াছে। যে হৃদয়ে বিনয় নাই, সেখানে ভক্তি দাঁড়াইবার খানা নাই। এই অহংকারের উষ্মা যখন ব্যাধির ন্যায় একটা সমাজকে ধরে, তখন দেখিতে পাই, পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করা তাহাদের একটা প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ নিজে বড় হওয়া শ্রমসাপেক্ষ, তাহা না পারিয়া অনেক সময়ে লোকে অজ্ঞাতসারে একটা সহজ পথ অবলম্বন করে, অপরকে ছোট করিয়া নিজে বড় হইতে চায়। রেলওয়ের টে্ণে বসিয়া যেমন অনেক সময় দেখা যায়, আমরা দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু পার্শ্ব দিয়া আর একখানা টে্ণ যাইতেছে, আমাদের বোধ হইতেছে আমরাই যাইতেছি, তেমনি অনেক সময় মানুষ নিজে যাহা তাহাই থাকে, কিন্তু অপরে নামিলে মনে করে নিজে উঠিতেছে। তাই অপরকে লোকচক্ষে হীন করিতে সুখ পায়। এ ব্যাধি যে সমাজকে ধরিয়াছে, তাহার লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই প্রথমে বলে—“ওহে শুনেছ, অমুকের কাণ্ডটা দেখেছ?” আর যেন ত্রিসংসারে কথা কহিবার কিছু নাই। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা পরনিন্দা মুখে করিয়াই প্রাতে বাহির হয়, এবং বাড়ীতে ঘুরিয়া নিন্দা ছড়াইতে থাকে। আমি

নিশ্চয় বলিতে পারি, এই যাহাদের অবস্থা, এই যাহাদের কাজ, তাঁহাদের উপাসনা আকাশে মাকু চালান মাত্র।

চতুর্থ বিঘ্ন বিদ্বেষ। প্রাণে বিদ্বেষ পোষণ করা, আর রক্তাধারে যক্ষ্মা রোগ ধারণ করা দুই সমান। মনে কর রক্তাধারে বিষ লাগিয়াছে; যক্ষ্মার বীজ বসিয়াছে; দিনের পরদিন জমিয়া বসিতেছে; পাকাইয়া পচাইয়া তুলিতেছে! দুই চারি মাস সে ব্যক্তি সুস্থের ন্যায় বেড়াইতে পারে, নিয়ম মত অন্ন পান গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু একদিন আসিবেই আসিবে, যে দিন তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইবে। তেমনি বিদ্বেষ প্রাণে পোষণ করিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না; উপাসনাতে সরসতা থাকে না; একদিন ধর্ম্ম-জীবনের অবনতি অনিবার্য্য। এই বিদ্বেষ যে কিরূপ সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ে প্রবেশ ও বাস করে, তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। আমরা মনে করি, আমার অনিষ্ট যাহারা করিয়াছে, কৈ তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা ত আমি করি না; আমার নিন্দা যাহারা করিয়াছে, কৈ তাহাদের নিন্দা ত আমি করিয়া বেড়াই না; কিন্তু অপর দিকে দেখ, স্বার্থের নামে যে বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতে ভদ্র লোকে লজ্জা পায়, ধর্ম্মের নামে সে বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করা ধার্ম্মিকতার অঙ্গ মনে করে। দলাদলির এমনি মহিমা, সামান্য মতভেদের জন্য একদল আর একদলকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখা অন্যায় মনে করে না। এ বিষয়ে এই মনে হয়, মহীরাবণ নানা রূপ ধরিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে বিভীষণের রূপ ধারণ

করিয়া যেমন রাম লক্ষ্মণকে চুরি করিয়াছিল, তেমনি বিদ্বেষ স্থূল স্বার্থের আবরণে আসিতে অসমর্থ হইয়া, বন্ধুর আবরণে আসে ও ধর্ম্মকে হরণ করে! এই বিদ্বেষের সুক্ষ্মাতে যাহাদিগকে খাইতেছে, তাহাদের উপাসনার সুফল ফলিবে না।

পঞ্চম বিঘ্ন ক্ষুদ্র আসক্তি। হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ এমন কিছুতে কি হৃদয় আবদ্ধ আছে, যাহা আবশ্যক হইলে ঈশ্বরাদেশে ত্যাগ করিতে পার না? এই আসক্তির বিষয় নানা প্রকার; কাহারও পক্ষে লোকানুরাগ, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ, কাহারও পক্ষে ধন, কাহারও পক্ষে আরাম, একটা না একটা কিছুতে বাঁধিয়া রাখিতেছে। এরূপ বন্ধনে যাহাদের হৃদয় আবদ্ধ তাহাদের উপাসনা সুফল প্রসব করে না। একবার একটী কৌতুককর গল্প শুনিয়াছিলাম। কয়েক ব্যক্তি নৌকা করিয়া কোনও স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল; সে রাত্রে সেখানে থাকিবার কথা; কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া সকলের মন যখন উত্তেজিত, তখন একজন প্রস্তাব করিল, চল এই রাত্রেই নিজেরা নৌকা বাহিয়া ফিরিয়া যাই; অমনি সকলে প্রস্তুত; ঘাটে আসিয়া দেখে মাঝী মাল্লারা নাই; তখন কেহবা হালে, কেহ কেহ বা দাঁড়ে বসিয়া টানিতে আরম্ভ করিল; দাঁড় টানিতেছে, কিন্তু নৌকার রজ্জু খোলে নাই; অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি গেল, প্রাতে দেখে যেখানকার নৌকা সেইখানেই আছে! আমি দেখিয়াছি ক্ষুদ্র আসক্তিতে হৃদয় বাঁধিয়া রাখিয়া

উপাসনা করা, মাতালের দাঁড় ফেলার ন্যায়! শ্রম আছে উন্নতি নাই।

এখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, উপাসনা সরস করিবার সংকেত কি? উত্তরে আমি বলি, জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চ রাখ, অভিসন্ধিকে বিশুদ্ধ রাখ, বিনয়কে হৃদয়ে ধারণ কর, অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিও না, এবং হৃদয়ের ক্ষুদ্র আসক্তি সকলকে উৎপাটন কর, তবে উপাসনার জমি প্রস্তুত হইবে। আরও হয় ত তাহাকে বলি, জমি প্রস্তুত না করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না, আমাদিগকেই দর্শন কর; দেখ আমরা কত উপাসনা করিতেছি, তাহার ফল নাই, সরসতাও নাই; ভিতরে ঐ সকল কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন এই ব্যাধিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

মহাত্মা যীশু ও মহাত্মা বুদ্ধের জীবনচরিতের যে বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে কোনও কোনও স্থলে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়! তন্মধ্যে একটী এই ;—উভয়েরই ধর্ম্মজীবনের প্রাক্কালে একটী ব্যাপার দেখা যায়। পাপ-পুরুষ উভয়কেই প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং সে সংগ্রামে উভয়েই জয়লাভ করিয়াছিলেন। যীশুর স্থলে পাপ-পুরুষের নাম শয়তান, বুদ্ধের স্থলে পাপ-পুরুষের নাম মার। বাইবেলে এরূপ উক্ত আছে যে, যীশু ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইবার পুর্ব্বে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে গভীর ধ্যানে যাপন করিয়াছিলেন। ধ্যানান্তে যখন তিনি ক্ষুধিত হইলেন, তখন পাপ-পুরুষ শয়তান আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে যীশু দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত বলিলেন—"শয়তান! তুই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা" এই কথা বলিবামাত্র শয়তান অন্তর্হিত হইল; এবং স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, ও যীশুর পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইল।

মহাত্মা বুদ্ধের জীবনচরিতেও ইহার অনুরূপ বিবরণ আছে। তিনি যখন মহা সঙ্কল্প করিয়া বোধিদ্রুমের তলে বসিলেন, তখন পাপ-পুরুষ মার বিধিমতে তাঁহাকে প্রলুব্ধ

করিবার চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইল। বুদ্ধ মারের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে যেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত বলিলেন—"মার; মার! তুই আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হ", অমনি মার অন্তর্হিত হইল; এবং অমনি স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; সেই মহা প্রতিজ্ঞার মহা নিনাদে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া গেল; বুদ্ধ নবালোক পাইয়া উত্থিত হইলেন।

মানবের চরিত্র বলিয়া যে জিনিষটীর বিষয়ে আমরা সর্ব্বদা শুনি, তাহার একটী প্রধান উপাদান পাপকে বাধা দিবার শক্তি। জগতে আমরা এক প্রকার মানুষ দেখি, যাহাদের হৃদয় মনে সাধুভাব, মঙ্গলভাব, কোমল কান্ত গুণাবলি প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু হৃদয়ে পাপকে বাধা দিবার শক্তি নাই; "যা তুই পাপ-পুরুষ শয়তান আমার সম্মুখ হইতে যা," এরূপ বলিবার উপযুক্ত তেজ নাই। ইহারা যতদিন প্রলুব্ধ না হয়, তত দিন ভাল থাকে; কিন্তু প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, অগ্নির অগ্রে মোমের বাতি যেরূপ গলিয়া যায়, ইহাদের সাধুতাও তেমনি গলিয়া যায়। এজন্য মানব-চরিত্রে মঙ্গল-ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাপকে বাধা দিবার শক্তি না জন্মিলে, তাহাকে চরিত্র বলা যায় না।

ঈশ্বর এ জগতে মানুষের শিক্ষার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে উভয়েরই ব্যবস্থা আছে। এই দেহের জীবন সম্বন্ধে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে দেখাইতেছেন, যে উপচয় ও অপচয় এই উভয় প্রকার কার্য্যের দ্বারা জীবন বাঁচিতেছে।

যেমন একদিকে আমরা পুষ্টিকর ও বলাধানের, উপযোগী পদার্থ সকল দেহমধ্যে গ্রহণ করিতেছি, এবং পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে দৈহিক ধাতুপুঞ্জের সহিত একীভূত করিতেছি, তেমনি অপর দিকে নিরন্তর চতুর্দ্দিকস্থ বিশ্লেষণকারী শক্তি-পুঞ্জের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছি। এই সংগ্রামে দৈহিক ধাতুপুঞ্জের অপচয় হইতেছে। অপচয় অপেক্ষা উপচয় অধিক হইতেছে বলিয়া আমরা এ জগতে জীবনকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছি।

স্থূলভাবে দেহ-রাজ্যে যাহা সত্য, সূক্ষ্মভাবে আত্ম-রাজ্যেও তাহা সত্য। এই যে আমরা এক এক জন মানুষ কতকগুলি সুখ দুঃখ, কতকগুলি সম্বন্ধ ও তজ্জনিত কতকগুলি কর্ত্তব্য লইয়া এক একটী ব্যক্তি হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিতেছি, আমাদিগকেও অধ্যাত্মভাবে নিরন্তর উপচয় ও অপচয়ের ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছে। প্রতিনিয়ত আমাদের চারিদিকে সাধুতার উপকরণ ও অসাধুতার সহিত সংগ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন যে দেহ বিশ্লেষণকারী ভৌতিক শক্তিসকলের সহিত সংগ্রামে জয়শালী হইতে পারে না, তাহা বিনষ্ট হয়; তেমনি যে চরিত্র অসাধুতার সহিত সংগ্রামে জয়শালী হইতে পারে না, তাহাও বিনষ্ট হয়।

এই জন্যই দেখা যায়, প্রকৃত চরিত্র-গঠনের পক্ষে দুইটীরই প্রয়োজন। সাধুতার প্রতি প্রেম ও অসাধুতার প্রতি বিদ্বেষ, অর্থাৎ অসাধুতাকে বাধা দিবার শক্তি। যে মানুষে বা যে

সমাজে সাধুতার প্রতি আদর আছে, কিন্তু অসাধুতার প্রতি বিরাগ নাই, তাহাতে চরিত্র নাই; সে সাধুতা অধিক দিন রক্ষা পাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদেশীয়েরা যখন আমাদিগকে সত্যানুরাগে হীন বলিয়া কটূক্তি করেন, তখন আমাদের স্বজাতিপ্রেমে আঘাত লাগে, আমরা সে কটূক্তি সহ্য করিতে পারি না; তখন বলি, কি অবিচার! দেশে এরূপ সহস্র সহস্র হিন্দুসন্তান রহিয়াছেন, যাঁহারা কখনই কোনও ধর্ম্মাধিকরণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না; বা সহস্র ক্ষতির ভয় সত্বেও পূর্ব্বকৃত কার্য্য অস্বীকার করিবেন না; বা অঙ্গীকৃত পালনে বিমুখ হইবেন না। ইহা সত্য, কিন্তু বিদেশীয়গণ আরও একটু অগ্রসর হইয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে তোমাদের সমাজ এরূপ কি না যে সেখানে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকগণ উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে না; তাহারা সাধারণের দ্বারা তিরস্কৃত ও অধঃকৃত হইয়া নিতান্ত হীনভাবেই দিন যাপন করে। তখন উত্তর দিতে হয় ত আমাদিগকে একটু মুস্কিলে পড়িতে হয়; কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যাহারা প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধনী হইয়াছে বা হইতেছে, তাহারা অবাধে সমাজমধ্যে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে সত্যের প্রতি প্রেম থাকিলেও মিথ্যার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতের শক্তি নাই। ইহার অনিবার্য্য

ফল সমাজের অধোগতি। সুবিখ্যাত দায়ুদের সংগীতাবলীতে এক স্থানে আছে,—"The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted."—অর্থাৎ অসৎ ও জঘন্য মানুষ যে সমাজে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, সে সমাজে অসাধু ব্যক্তিদিগের সংখ্যাই বর্দ্ধিত হয়। সাধু ও অসাধু সকল সমাজেই থাকিবে; পাপ ও পুণ্য সকল সমাজেই দেখা যাইবে; কিন্তু যে সমাজে পাপকে বাধা দিবার জন্য পুণ্যের শক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত এবং যাহাতে পাপী ভয়ে ভয়ে ও সঙ্কোচে থাকে, এবং পুণ্যাত্মারা সম্ভ্রমে বাস করেন, সেই সমাজে চরিত্র আছে, ধর্ম্মের প্রাণ আছে; আর যে সমাজে পাপীরা বুক ফুলাইয়া বেড়ায় ও সাধু মানুষেরা এক কোণে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকেন, সে সমাজের চরিত্র নাই ও ধর্ম্মের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, ব্যক্তিগত ভাবেও তাহা বলা যাইতে পারে। সাধু অসাধু ভাব, সাধু অসাধু কার্য্য, সকল মানুষের সমক্ষেই আসে; যিনি সাধুতাকে বরণ করিয়া লন, এবং অসাধুতাকে "আমার সম্মুখ হইতে যা" বলিতে পারেন, তাঁহারই চরিত্র আছে এবং ধর্ম্মজীবন আছে। কিন্তু যাহার সাধুতার প্রতি বিশেষ স্পৃহা নাই, বা অসাধুতার প্রতিও বিশেষ বিতৃষ্ণা নাই, তাহার চরিত্র নাই এবং ধর্ম্মজীবনও নাই।

পূর্ব্বোক্ত যীশু ও বুদ্ধের চরিত্র হইতে আমরা আর একটী উপদেশ প্রাপ্ত হই। তাঁহারা যখন পাপ-পুরুষকে দৃঢ়তার

সহিত বলিলেন—“আমার সম্মুখ হইতে যা”,যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইলেন, তখন স্বর্গ হইতে দেবদূতগণ আসিয়া পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলেন; এবং দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ইহাতে এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে যে, যখন মানুষ ভাল হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তখনই দেবতা তাহার সহায়। মানুষ, তুমি সৎ হইবার জন্য যাহা কিছু ভাবিতেছ বা করিতেছ, ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই আছেন। তবে তোমার প্রতিজ্ঞার বলের প্রয়োজন। তুমি যদি একবার স্থিরচিত্তে ও দৃঢ়চিত্তে বল, অসৎ যাহা তাহাকে আমি কখনই গ্রহণ করিব না, তুমি যদি হৃদয়ের সমগ্র শক্তির সহিত বল “যে যায় যাক, যে থাক থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক্,” তাহা হইলে দেখিবে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের এই জগৎ তোমার অনুকূল। যে এক ভিন্ন দুই দেখিতে জানে না, পরিণামে তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী।

যেমন এই ভৌতিক জগতে আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি, যে আমরা কিছুই নই, আমরা সিন্ধুতে বিন্দু-প্রায় লাগিয়া আছি, মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া আছি, ভৌতিক জগৎ আর কোনও শক্তির প্রভাবে, আর কাহারও নিয়মে চলিতেছে; এখানে দেহ সম্বন্ধে যথেচ্ছভাবে বাস ও বিহার করিবার অধিকার আমাদের নাই; এখানে বাধ্যতাই সর্ব্বপ্রধান চতুরতা; তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে মানব-চরিত্র অসীম ও দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত হইতেছে। যে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার জন্য উত্থিত

হয়, সে ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের ক্রোড়েই আপনাকে অর্পণ করে।

এইরূপে তাঁহার ক্রোড়ে একবার আপনাকে সমর্পণ করিতে পারিলে আর ভয় ভাবনা থাকে না। যতক্ষণ আমরা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে গিয়া আপনাকে দেখি, ক্ষুদ্র ক্ষতিলাভ গণনা করি, ততক্ষণ ভয় ভাবনা আসে; যখন আপনাকে আর দেখি না, কেবল সেই পরমপুরুষকেই দেখি ও তাঁহার আদেশকেই দেখি, তখন আর ভয় ভাবনা আসে না।

ধর্ম্মের যে জয় হইবে, সেজন্য আমি আবার কি ভাবিব? এ ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে রক্ষা পাইবে, সে বিষয়ে কখনও কি ভাবি? কখনও কি এই কুচিন্তা মনে আসে যে, অসীম গগনে যে অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ভ্রমণ করিতেছে, যদি পথভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের আঘাতে তাহারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়! যদি কোনও লোক এরূপ চিন্তা করিতে বসে, তবে কি লোকে বলে না, "আরে পাগল, তুই উঠিয়া স্নান আহার করগে যা, এ ব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা আর তোরে ভাবতে হবে না, যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে করেছেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে রাখতে জানেন,—তুই আপনা বাঁচা।" সেইরূপ কোনও লোক ধর্ম্মের জয় পরাজয়ের বিষয়ে ভাবিতে বসিলে, তাহাকে কি বলিতে পারা যায় না, "ওরে পাগল! ধর্ম্মকে যিনি স্থাপন করিয়াছেন তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে জানেন, তোকে আর সে জন্য ভাবিতে হবে না,—তুই আপনাকে বাঁচা।"

আপনার পশ্চাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিকে সহায়রূপে

দেখিলে মানুষের মনে কি অদ্ভুত বলের সঞ্চার হয়! এ ব্রহ্মাণ্ডে যে একা সেই বোকা, যে মনে করে তাহার জীবন-সংগ্রামের সাক্ষী কেহ নাই, তাহার শুভসঙ্কল্পের সহায় কেহ নাই, তাহার পৃষ্ঠপোষক কেহ নাই, সেই সংগ্রামে অভিভূত হয়। যে জানে যে, তাহার প্রত্যেক সাধুচেষ্টাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা করিতেছে, সেই পড়িয়া উঠে ও আশা ছাড়ে না।

অসাধুতার প্রতি বিরাগ যেমন মানব-চরিত্রের একটী উপাদান, প্রতিজ্ঞার বল তেমনি আর একটী। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হয়, সেই ঐশী শক্তিকে নিজ কার্য্যের সহায় করে। মানুষ যে ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তাহারও একটা দায়িত্ব আছে; মানুষের নিজের করিবার যতটুকু আছে, ততটুকু করিয়া তবে সে দৈব সাহায্য চাহিতে পারে। যে বলিতেছে, আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, দেখা চাই যে, সে নিজে পাপ-পঙ্ক হইতে উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। যে বলহীন, যে প্রবৃত্তির স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতেছে, যে আত্মশক্তিতে আত্মোন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ, ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য তাহার জন্য নহে। মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির ভিত্তি স্বাবলম্বনের উপরে। এমন কি মানুষ যে ঈশ্বরকে লাভ করিবে, তাহাতেও আধ্যাত্মিক বলের প্রয়োজন। পাপ ও মৃত্যুর সহিত যে সন্ধি স্থাপন করে, শত্রুর হস্তে যে আত্মসমর্পণ করে, সে তাঁহাকে

লাভ করিতে পারে না; যে হৃদয়ের সমগ্র বলের সহিত বলিতে পারে, আমি মৃত্যুকে চাহি না, জীবন চাই, বিষয়াসক্তির পাশে বদ্ধ থাকিতে চাহি না, পুণ্যময়ের সন্নিধানে বাস করিতে চাই, যা কালশত্রু পাপ, আমার সম্মুখ হইতে যা, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে।

মানব-প্রকৃতির সাক্ষ্য।

মানব-প্রকৃতির একটী গূঢ় ও গভীর রহস্য এই যে, মানবের কার্য্য, প্রবৃত্তি, ও ভাব সকলের মধ্যে, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীবিভাগ আছে। ইতর প্রাণীতে এরূপ নাই। একটা পক্ষীকে কখনও দেখিতেছি যে, সে যত্নপূর্ব্বক আপনার শাবকদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্য বহন করিতেছে; নিজে অভুক্ত থাকিয়াও তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে; ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতির সময় তাহাদিগকে স্বীয় পক্ষপুটের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসিতেছে; কোনও শত্রু শাবকদিগের নিকটস্থ হইলে, নিজের প্রাণের ভয় না রাখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতেছে; এবং চঞ্চু ও পক্ষপুটের আঘাতে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে; এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে; আবার কখনও বা দেখিতেছি, সেই পক্ষী অপর পক্ষীর সংগৃহীত খাদ্যের অংশ লইয়া টানাটানি করিতেছে ও তুমুল ঝগড়া উপস্থিত করিতেছে। পক্ষী জানে না যে তাহার শাবকপালন উচ্চশ্রেণীর কার্য্য, অথবা তাহার পরস্বহরণ নিম্নশ্রেণীর কার্য্য। আমরাও ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে সেরূপ বিচার করি না। যে শাবক পালন করে, তাহাকে ধার্ম্মিক পক্ষী ও যে পরদ্রব্য লইয়া টানাটানি করে, তাহাকে অধার্ম্মিক পক্ষী বলিয়া মনে করি না। তাহাদের কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ নাই।

মানুষের কার্য্যে তাহা আছে। এ দেশের একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবপতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জীবনে এরূপ এক মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, যখন তিনি উচ্চশ্রেণীতে থাকিবেন কি নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করিবেন, এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং দুঃখের বিষয় এই যে, সেই মহা মুহূর্ত্তে তিনি জ্ঞান পূর্ব্বক নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যকে "অশ্বত্থামা হত" এই বাণীটি শুনাইবার মুহূর্ত্ত সেই মুহূর্ত্ত। সেই সন্ধিক্ষণে যুধিষ্ঠির দেখিলেন, তাঁহার সমক্ষে দুই পথ ও কার্য্যের দুই ফল উপস্থিত। সৈন্যদল দ্রোণের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরাভূত হইবে, না হয় দ্রোণকে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে ও জয়শ্রী লাভ হইবে। এই কার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যুধিষ্ঠির দোলায়মানচিত্তে কিয়ৎকাল অবস্থিত হইলেন। দেবতারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির উচ্চশ্রেণীতে থাকেন কি নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই জানা গেল যে যুধিষ্ঠির নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করিলেন; দ্রোণকে নিরস্ত্র করিয়া জয়শ্রী লাভ করিবার আশয়ে "অশ্বত্থামা হত" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। যদিও পরে ক্ষীণস্বরে "ইতি গজ" বলিয়া কোনও প্রকারে সত্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধির মধ্যে যাহা ছিল, তাহাই তাঁহাকে নিম্নশ্রেণীতে অবতীর্ণ করিল।

যদি কেহ তর্কজাল বিস্তার করিয়া বলেন, যুধিষ্ঠিরের কার্য্যটা মন্দ কি হইয়াছিল ? দ্রোণের সঙ্গে তাঁহারা যখন যুদ্ধ

করিতে আসিয়াছেন, তখন তিঁ জানেন যে দ্রোণকে নিরস্ত বা পরাভূত করিতেই হইবে; যখন এইরূপ অবস্থা, তখন বিনা রক্তপাতে কৌশলে সে কার্য্য সাধন করা ত বুদ্ধিমানেরই কার্য্য হইয়াছিল। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য আংশিকরূপে মিথ্যা বলা নিন্দনীয় নহে। এরূপ যিনি বলেন, তাঁহাকে বলি তর্কে ফল কি? মানব-সাধারণের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, প্রতা-রণা পূর্ব্বক দ্রোণকে হত্যা করাকে মানবহৃদয় উচ্চশ্রেণীর কার্য্য মনে করে কিনা? আমি এইরূপ তর্ক আর একবার শুনিয়া-ছিলাম। আমেরিকা দেশে শুক্লবর্ণ খ্রীষ্টশিষ্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া, তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসীদিগকে কি প্রকারে দলে দলে হত্যা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা এক একটী গ্রাম আবেষ্টন করিয়া, পশুযূথের ন্যায় সমগ্র গ্রামের পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ সকলকে হত্যা করিয়াছেন। এইরূপ করিয়াই আমেরিকাতে নব সভ্যতার অভ্যুদয় ও নবালোকের বিস্তার হইয়াছে। এক-বার ব্রাজিলনামক দক্ষিণ আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ দেশের একজন উচ্চপদস্থ শুক্লকায় রাজপুরুষ সায়ংকালে আহারে বসিয়া নবা-গত কতিপয় শুক্লকায় বন্ধুকে বলিলেন,—"অপরাপর সকলে বড় নির্ব্বোধ, আদিম অধিবাসীদিগকে হত্যা করিবার জন্য বারুদ গুলি ব্যয় করে? আমি তাহার কিছুই করি না। আমি একবার একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া একটা গ্রামের সমুদয় লোককে হত্যা করিয়াছিলাম। নবাগত বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "কৌশলটা কি ?" তখন পদস্থ পুরুষ যাহা বলিলেন, তাহা ইংরাজীতে যেরূপ পড়িয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি—Why, during the night, I poisoned all their wells and in the morning they were all dead" অর্থাৎ "রাতারাতি আমি ঐ গ্রামের সমুদয় কূয়ার জলে বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছিসাম, পরদিন প্রাতে সমগ্র গ্রামের লোক মরিয়া গেল।" এখানেও কেহ কেহ তর্ক করিতে পারেন, যদি অগ্রে স্বীকার কর যে আদিম অধিবাসীদিগকে মারা আবশ্যক, তাহা হইলে গোলাগুলির দ্বারা হত্যা করা অপেক্ষা গোপনে বিষপ্রয়োগের দ্বারা হত্যা করা কি ভাল নয় ?

এরূপ তর্ক অবজ্ঞাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া আমরা সকলেই বলিতেছি যে, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক দ্রোণকে হত্যা করা নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য হইয়াছিল। পুনরায় বলি, এইটুকুই মানুষের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব যে মানুষের নিকট দুই ভাবের দুইটা কাজ বা দুইটা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা আসিলে, মানুষ একটাকে উচ্চ ও অপরটাকে তুলনাতে নীচ বলিয়া মনে করে। আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য, প্রতিমুহূর্ত্তের চিন্তা ও প্রতিমুহূর্ত্তের ভাব এই প্রকারে উচ্চ বা নীচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা নিরন্তর আপনারাই আমাদের বিচারাসনে বসিয়া নিজেদের কার্য্যের শ্রেণী ভাগ করিয়া দিতেছি। যে স্বাভাবিক বৃত্তির সাহায্যে আমরা এইরূপ করিতেছি, তাহাকেই পণ্ডিতেরা বিবেক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আমরা স্বতঃই অনুভব করি, নিঃস্বার্থতা উচ্চ, স্বার্থপরতা নীচ; সংযম উচ্চ, স্বৈরাচার নীচ; কর্ত্তব্যপরায়ণতা উচ্চ, কর্ত্তব্য জ্ঞানে অবহেলা নীচ; ঈশ্বরানুরাগ উচ্চ, বিষয়াসক্তি নীচ। যে গ্রন্থকারের উল্লেখ আমি অগ্রে করিয়াছি, তিনি যে যুধিষ্ঠিরকে উক্ত প্রবঞ্চনার জন্য নিম্ন শ্রেণীতে গণনা করিয়াছেন, তাহার কারণ এই, তিনি মনে করেন, উক্ত কার্য্যের দ্বারা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের ভূমি ছাড়িয়া বিষয়ের ভূমিতে নামিয়াছিলেন।

মানবপ্রকৃতির প্রথম গূঢ় রহস্য এই যে, আমরা আমাদের কার্য্য, চিন্তা ও ভাবের মধ্যে স্বতঃই উচ্চ ও নীচ শ্রেণী দেখিতে পাই। দ্বিতীয় রহস্য এই, যাহাকে উচ্চ মনে করি, তাহাই স্বতঃ আমাদের হৃদয় ও আমাদের জীবনের উপরে আধিপত্য স্থাপন করে। ইহার প্রমাণ অন্বেষণ করিবার জন্য অধিক দূর গমন করিতে হইবে না। জগতের মহাপুরুষগণের বিষয়ে একবার চিন্তা করুন। এক এক জনের জন্মগ্রহণের পর কত শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও মানবকুলের হৃদয়ের উপরে তাঁহাদের কিরূপ আধিপত্য বিদ্যমান রহিয়াছে! পৃথিবীর কোন্ রাজার বা কোন্ সম্রাটের প্রজাসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অথবা খ্রীষ্টীয়-মণ্ডলীর হৃদয়েশ্বর যীশুর? আজ যদি জগতে সংবাদ প্রচার হয় যে, যীশু আবার সশরীরে ধরাতে আসিয়াছেন এবং এক নিশান উত্থিত করিয়া এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, যাহারা

তাঁহার অনুগত, তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হউক; যাহারা তাঁহার জয় চায়, সকলে সেই নিশানের তলে দণ্ডায়মান হউক; তিনি নিজের শিষ্য গণনা করিতে আসিয়াছেন; তাহা হইলে সকলে কি মনে করেন? সেই সৈন্যদল কিরূপ হয়? পৃথিবীর মণিমুকুটভূষিত রাজগণের মস্তক সকলের আভাতে, বীরগণের বীরত্ব-অর্জ্জিত তারকাবলীর শোভাতে, জ্ঞাণিগণের জ্ঞানোজ্জ্বল মুখশ্রীতে, প্রেমিক প্রেমিকাদিগের প্রীতি-বিকশিত নেত্রপংক্তিতে সে সৈন্যদল কি সুশোভিত হইয়া যায় না? এতটা আধিপত্যের মূল কোথায়? কোন্ আকর্ষণে, কোন্ প্রলোভনে, জগতের লোক এই সূত্রধর-তনয়কে প্রাণ দিয়াছে? কি আকর্ষণে, কি প্রলোভনে নবদ্বীপবাসী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয়কে লক্ষ লক্ষ লোক এত ভাল বাসিয়াছে, যে, এখনও "গৌরাঙ্গ এস হে, একবার সংকীর্ত্তনের মাঝে এস হে," বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে? কি আকর্ষণে, কি প্রলোভনে, পঞ্চনদবাসী একজন সামান্য বণিকের পুত্রকে লক্ষ লক্ষ লোকে প্রাণে এমনি স্থান দিয়াছে যে, "ওয়া গুরুজীকী ফতে" "গুরুজীর জয়" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতেছে? মানবহৃদয়ের উপরে এতটা আধিপত্যের মূল কারণ কোথায়?

ইঁহারা যে কথা বলিয়া মানুষকে ডাকিয়াছেন, যে প্রলোভন দেখাইয়া সকলকে পাগল করিয়াছেন, সে বিষয়ে যখন ভাবি, তখন দেখি যে সচরাচর সংসারের লোকে যাহা চায়, যাহাকে প্রলোভন মনে করে, ইঁহারা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা

বলিয়াছেন। লোকে চায় ভাল খাব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব, ইঁহারা বলিয়াছেন, "আমার সঙ্গে যদি আসিবে, তবে দুঃখ কষ্টের বোঝা মাথায় উঠাইতে প্রস্তুত হও"। লোক চায়, দশজনে মানুক্, গণুক্ ও শ্রদ্ধা করুক, ইঁহারা বলিয়াছেন, "আমার সঙ্গে যদি এস, তবে নির্যাতন ও নিষ্পীড়ন সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও"। যীশুর সঙ্গে কয়েকজন লোক যাইতেছিল, যীশু ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে? তাহারা বলিল, "গুরো! আমরা আপনার সঙ্গে থাকিব।" যীশু হাসিয়া বলিলেন, "পাখীর বাসা আছে, শিয়ালের গর্ত্ত আছে, কিন্তু আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" পৃথিবীর সেনাপতিগণ সৈন্য সংগ্রহ করিবার সময় প্রলোভন দেখাইয়া বলেন "এস বেতন পাইবে, তদুপরি যুদ্ধে গৌরব-লাভ করিবে, লুঠ-তরাজ করিতে পারিবে, নানা দেশের নানা সম্পদ অধিকার করিবে," কিন্তু ঈশ্বরনিযুক্ত এই সেনাপতিগণ বলিয়াছিলেন;—"দারিদ্র্য, নির্যাতন, নিগ্রহ এই সমুদয়কে বরণ কর, করিয়া আমাদের সৈন্যদলে প্রবেশ কর।" মানুষ তাহাই করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, যাহারা বলিয়াছে এস, পেট ভরিয়া খাইতে দিব, জগত তাহাদের আহ্বানধ্বনির প্রতি কর্ণপাত করিল না; যাঁহারা বলিলেন, এস অনাহারে থাকিবে, তাঁহাদের চরণেই গিয়া পড়িল! যাহারা বলিল এস, যথেষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিতে পারিবে, তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল না; যাঁহারা বলিলেন, এস, সংযমের দড়িতে তোমা-

দিগকে বাঁধিব, তাঁহাদের দ্বারা বদ্ধ হইবার জন্য গেল! যাহারা বলিল এস, এরূপ গৌরব দিব যে, মস্তক উন্নত করিয়া ত্রিসংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিবে, তাহাদের নিকটে গেল না; যাঁহারা বলিলেন, যদি উন্নত হইবে তবে নত হও, বিনয়ে আত্মসমর্পণ কর, তাঁহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিল!

ইহার অর্থ কি এই নয় যে, আমরা যে কার্য্য, যে চিন্তা বা যে ভাবগুলিকে উচ্চ বলিয়া জানি, আমাদের হৃদয়ের উপরে সেগুলির এমনি স্বাভাবিক আধিপত্য যে, আমরা যে মানবে সেগুলিকে লক্ষ্য করি, স্বতঃই তাঁহার অধীন হইয়া পড়ি? যিনি আমার জীবনের উচ্চ আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া আমার সমক্ষে ধারণ করেন, তিনিই ত আমার স্বাভাবিক গুরু ও আমার হৃদয়ের রাজা। বিধাতা মানব-হৃদয়কে স্বভাবতঃ ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। একবার চীনদেশীয় একজন রাজা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্ঞানিবর! রাজ্যশাসনের জন্য স্থল বিশেষে বিদ্রোহিদলকে হত্যা করা কি আবশ্যক নহে?" কংফুচ উত্তর করিলেন, "হে রাজন্! আপনি মানুষকে হত্যা করিবার বিষয়ে কেন বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন, আপনি ধর্ম্মের উচ্চনীতি অনুসারে রাজ্যশাসন করুন, দেখিবেন বায়ুর অগ্রে শস্যক্ষেত্র যেরূপ নত হয়, আপনার অগ্রে প্রজাগণ সেইরূপ নত হইবে।" কংফুচ মানব-প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ

ছিলেন, তিনি জানিতেন, মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের অনুগত।

ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, মানব-হৃদয়বাসী ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র। যেমন ধূম চুল্লীস্থিত অগ্নির নিশ্বাস মাত্র, তেমনি উচ্চ প্রকৃতি, উচ্চ আদর্শ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ সংকল্প যে নামেই প্রকাশ কর না কেন, তাহা হৃদিস্থিত ঈশ্বরের নিশ্বাস মাত্র। তিনি আত্মাতে সন্নিহিত আছেন বলিয়া, আমরা ধর্ম্মপ্রকৃতি পাইয়াছি, এবং আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের এত আধিপত্য।

যদি মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ ধর্ম্মের অনুগত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে এত চিন্তা কর কেন? ডাক, মানুষকে সাহস করিয়া ডাক, যদি প্রলোভন দেখাইতে হয়, বৈরাগ্যের প্রলোভন দেখাও। বল, ঈশ্বরের নামে ডাকিতেছি কে আত্মসমর্পণ করিবে এস, কে প্রজ্বলিত হুতাশনে শলভত্ব পাইবে এস, কে দারিদ্র্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিবে এস, কে সংসারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চিরবৈরাগ্যের বসন পরিবে এস। মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, তাহা কি এই মানুষগুলির পক্ষে অস্বাভাবিক হইয়াছে? এই কি মনে করিব যে, ইহারা ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনিতে আর জাগে না, বিষয়ের বংশীরবেই জাগে? এরূপ কখনই মনে করিতে পারি না। কারণ এখনও ডাকিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। যে ডাকে তাহার গলার স্বরেই

চেনা যায় সে কি ভাবে ডাকিতেছে। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ডাকিয়াছিলেন, লোকে পাগলও হইয়াছিল, কারণ ডাক শুনিয়া বুঝিয়াছিল, আগে আপনাকে দিয়াছে, তৎপর ডাকিতেছে। তোমার আমার ডাকে মনে করে, আপনাকে বাঁচাইয়া ডাকিতেছে; তাই সাড়া দেয় না। নিশ্চয় বলিতেছি, ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ কর, তৎপরে ডাক, দেখিবে ডাক শুনিবে। হে ভীরু, হে অল্পবিশ্বাসি, তুমি অকপটচিত্তে ধর্ম্মকে আশ্রয় কর; তুমি ধর্ম্মের আধিপত্যে আপনাকে অর্পণ কর, ফলাফল গণনা করিও না; চরমে দেখিবে তোমার ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে।

আসল ও নকল।

আমরা যদি মিথ্যাতে এতটা বিশ্বাস না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হইত। এ জগতে এক প্রকার হইয়া আর এক প্রকার দেখান যায়, এবং দেখাইয়া মানুষকে চিরপ্রবঞ্চনার মধ্যে রাখিতে পারা যায়, ইহা যদি মানুষ না ভাবিত তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ তাহা হইলে মানুষ নকল ছাড়িয়া আসলটা ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইত। আমরা অনেকে যে এ জগতে সারবান্ চরিত্র লাভ করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, নিরেট খাঁটী বস্তুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অল্প। নিরেট খাঁটি বস্তুটুকুই জগতে থাকে, জগতে দাঁড়ায় ও কাজ করে; নকল যাহা তাহা তুষের ন্যায় বায়ুতে উড়িয়া যায়, চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

বিধাতা এ জগতে আসলে নকলে, আলোকে অন্ধকারে, সাধুতাতে ও অসাধুতাতে কেন মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। রামের সঙ্গে একটা রাবণ কেন আছে, তাহা সম্পূর্ণ জানি না। বোধ হয় এই জন্য যে রাবণকে না দেখিলে রামের মূল্য ভাল করিয়া বুঝা যায় না; রাবণকে পরিহার করিয়া রামকে ধরিতে হইবে, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না; কিংবা এ কথাতেও কিছু সত্য থাকিতে পারে যে, পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিলে পুণ্যের বল বাড়ে

না। আমি একবার একটী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বক্তা বলিলেন, মানবের যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহার সকলের সঙ্গেই অসার ভাগ আছে, অর্থাৎ যাহা পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা দৈহিক ধাতুপুঞ্জের সহিত একীভূত হয় না, যাহাকে সময়ান্তরে দেহ হইতে বর্জ্জন করিতে হয়, এমন অনেক দ্রব্য আছে। এখন প্রশ্ন এই, যাহা অসার, যাহা এক সময় দেহ হইতে বর্জ্জন করিতেই হইবে, তাহা মানবের খাদ্যের সহিত মিশিয়া রহিল কেন? প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলিলেন, ঐ অসার ভাগগুলি থাকার জন্য সার ভাগগুলি কার্য্য করিতে পায়, ওগুলি না থাকিলে পুষ্টিকর সামগ্রীগুলি সে প্রকার জোরের সহিত কার্য্য করিতে পারিত না। তৎপরে এবিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি। অনুভব করিয়াছি যে বিধাতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে এরূপ ব্যবস্থাই আছে, যে একটী সারবস্তুকে বলবান করিবার জন্য দশটী অসার বস্তু তাহার চারিদিকে থাকে। যেমন মানুষ যখন পাখীটাকে মারিবার জন্য বন্দুকে গুলি পোরে, তখন অনেক সময়ে দেখি যে এক মুঠা গুলি তাহার মধ্যে দিল; কিন্তু পাখিটী যখন মরে, তখন একটী বা দুইটী গুলিতেই মরে; যদি সে বিংশতিটীগুলি বন্দুকের মধ্যে দিয়া থাকে, তবে দুইটী কাজে লাগিল আর অষ্টাদশটী বৃথা গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা কি গেল? কখনই না। সেই অষ্টাদশটী গুলি বন্দুকের মধ্যে থাকাতে সংঘর্ষণের প্রভাবে অপর দুইটীর বলবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে; সেইরূপ চিন্তা করিয়া

দেখ; এ জগতে যত প্রাণী জন্মিতেছে, সকলে কি কাজ করিতেছে? যত প্রাণী এ জগতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলে যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অচির কালের মধ্যে ভুবন ভরিয়া যায়। অধিক কি, পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে হস্তীর শাবক অনেক বিলম্বে হয়, সেই হস্তীর শাবক সকল যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে একশত বৎসরে হস্তীতে জগতের অধিকাংশ স্থান ভরিয়া যায়। বর্ষাকালে আমরা পথে ঘাটে কত ভেক-শিশু দেখিতে পাই; দেখি কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক চারিদিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছে; অন্যমনস্ক ভাবে পা বাড়াইতে গেলেই, তাহাদিগকে মাড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অথবা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কোন কোন সময়ে গঙ্গার জলে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, কলসটী বুড়াইতে গেলেই তন্মধ্যে অনেক কুলীরক যায়। কাপড় দিয়া জল ছাঁকিলেই রাশি রাশি কুলীরক উঠে। এখন প্রশ্ন এই, এত ভেকশিশু বা এত কুলীরক কোথায় যায়? সকলগুলি কি জীবিত থাকে? সকলগুলি জীবিত থাকিলে কি আর আমরা পা বাড়াইতে পারি, বা গঙ্গাজলে অবগাহন করিতে পারি? নিশ্চয় এতগুলি জন্মে বাঁচিবার জন্য নহে, অল্পসংখ্যক থাকিবে, বহুসংখ্যক মরিবে এই জন্য। এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি তাহারা মরিবে তবে বিধাতা তাহাদিগকে জগতে আনিলেন কেন? উত্তর ঐ বন্দুকের গুলির দৃষ্টান্তের মধ্যে। অষ্টাদশটার দ্বারা

দুইটীকে বলবান করিয়া লইবেন বলিয়া। ইহাকেই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, জীবন-সংগ্রাম বা survival of the fittest.

জীবন-সংগ্রাম যেমন জীব-জগতে আছে, যে জীব চলিয়া যায়, সে যে থাকে তাহাকে সবল করিয়া যায়, তেমনি আসল ও নকলে সংগ্রাম আছে। নকল চলিয়া যায়, আসলকে বলশালী করিয়া রাখিয়া যায়। রাবণ মরিয়া যায়, কিন্তু রামকে জয়শালী করিয়া যায়। বিধাতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, মানব-জীবনে দেখিতেছি, মানব-ইতিবৃত্তে দেখিতেছি, ঈশ্বরের এই সত্যময় জগতে নকলের, অসত্যের, বাঁচিবার আশা নাই। ইহা দেখিয়াই ঋষিরা বলিয়াছিলেন ;—

"সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোনৃত মভিবদতি।"

যে অসত্যকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। অর্থাৎ মূলহীন বৃক্ষের যেমন এ জগতে বাঁচিবার উপায় নাই, তেমনি যাহা মিথ্যা, যাহা ছায়া, যাহা নকল, তাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। তবে নকল কিছুকাল আসলকে ঘিরিয়া তাহার শক্তি ও মূল্য বাড়াইয়া দেয় এইমাত্র।

সকল মানব সমাজে ঘুরিয়া বেড়ায় বটে, চাক্‌চিক্যদ্বারা অনেক সময়ে চিত্ত হরণ করে বটে, কিন্তু মানব-প্রকৃতি কাহাকে চায়? কাহার আদর করে? গতবারে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, জগতের সাধুমহাজনের শিষ্য-সংখ্যা যে এত, তাহাতে কি প্রমাণ হয়? জগতের লোক কাহাকে ধরিয়াছে? জগতে ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান, কৃতী, যশস্বী লোক ত কত জন্মিয়াছে,

তাহাদের পশ্চাতে জগদ্বাসী এত যায় নাই কেন? এক এক জন সাধুর পশ্চাৎ হইতে মানুষদিগকে ফিরাইবার জন্য কি চেষ্টাই না হইয়াছে! যীশুর শিষ্যগণ যখন একটা ক্ষুদ্রমণ্ডলী-বদ্ধ হইয়া মাথা তুলিলেন, তখন উঠিয়াই দুইটী প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম গ্রীকদিগের সভ্যতা ও জ্ঞানাভিমান, দ্বিতীয় রোম সাম্রাজ্যের রাজশক্তি। গ্রীক জ্ঞানাভিমানিগণ এই নব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অজ্ঞ বলিয়া হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন; রোমের রাজশক্তি দেববিদ্বেষী জ্ঞানে ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাসত্ত্বেও সেই সূত্রধর-তনয়ের রাজ্য ও প্রজা-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইহা কি ইতিহাসের একটা আশ্চর্য্য ঘটনা নয়! রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রামকে হতচেতন করিয়া, ভাবিয়া গেল, যে রাম মরিয়াছে, পরক্ষণেই সংবাদ আসিল, রাম আবার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান, তখন রাবণ বলিল :—

"মরিলেও না মরে রাম এ কেমন বৈরি?"

জগতের সাধুদের শক্তি সম্বন্ধে কি এই দশা ঘটে নাই? যখন পৃথিবীর রাজারা ভাবিতেছেন, আগুন নিবাইয়াছি, বিনাশ করিয়াছি, তখন আর একদিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছে! রোমের সম্রাট খৃষ্টীয়ানের দল নিঃশেষ করিবার জন্য রাজবিধি প্রচার করিলেন; ওদিকে তাঁহার রাজপরিবারের লোকেরা খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গেল। এ ব্যাপারের মধ্যে কি গূঢ় অর্থ নাই?

মহম্মদকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য, পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য, মক্কাবাসিগণ চেষ্টা করিতে ত্রুটী করে নাই; কিন্তু যতই চেষ্টা করে, ততই মহম্মদের শক্তি বাড়িয়া যায়! ইহার মধ্যে কি অর্থ নাই? অর্থ এই, মানবপ্রকৃতি আসলকে ভাল বাসে, যেখানে খাঁটি ঈশ্বর-প্রীতি, খাঁটি নিঃস্বার্থতা দেখিতে পায়, সেখানেই, সেরূপ মানুষের পায়েই, গড়াইয়া পড়ে!

মানব-হৃদয়ের সাধু-ভক্তির বিষয়ে যখনই চিন্তা করি, তখনই অনুভব করি যে, মানব-হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের অনুগত। ঈশ্বর আপনার সন্তানকে আপনার কাছে কাছেই রাখেন। সাধুভক্তি কখন কখনও অপাত্রে ন্যস্ত হয় বটে, সাধুতার নকল দেখিয়া লোক ভোলে বটে, কিন্তু সে ভোলাতেও প্রকাশ করে, মানব-হৃদয়ের পক্ষে আসলটার কত আকর্ষণ। আসলকে আমরা এতই ভালবাসি যে, তাহার নকল দেখিয়া ভুলিয়া যাই। মানব-হৃদয় ধর্ম্মের এতই অনুগত যে, তাহাকে উত্তমরূপে প্রবঞ্চনা করিতে হইলে, ধর্ম্মের কঞ্চুক পরিতে হয়; মহীরাবণ যেমন বিভীষণের রূপ ধরিয়া গিয়াছিল, তেমনি ধর্ম্মের বেশ ধরিয়া মানবহৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয়। জগতে মানুষ মানুষকে অনেকস্থলে ঠকাইয়াছে ও প্রতিদিন ঠকাইতেছে, কিন্তু সকল প্রবঞ্চনার মধ্যে সেই প্রবঞ্চনা সাংঘাতিক, যাহা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের বেশে, ধর্ম্মের আকারে আসে, এবং এরূপ প্রবঞ্চক সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়।

আসল জিনিষ যাহা তাহার প্রতি যদি মানুষের প্রাণে প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে তাহার নকল দেখাইয়া মানুষ এতদূর প্রবঞ্চনা করিতে পারিত না। এবিষয়ে এদেশে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। তাহা এই :—

কোনও স্থানে একজন মুসলমান নবাব ছিলেন, তাঁহার এক বিবাহোপযুক্তা প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিলেন। ঐ কন্যা রূপ-লাবণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবাব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, যে সাচ্চা ফকীর অর্থাৎ প্রকৃত নির্লোভ পুরুষ যদি পান, তবে তাহার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিবেন। এই মানসে নবাবের রাজ্যের সন্নিকটে কোন ফকীর আসিলেই নবাব তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেন; তাঁহাকে নানাপ্রকার মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন; বিবিধ মূল্যবান খাদ্য বস্তু যোগাই-তেন; কিংবা ...হাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করি...। যদি ফকীর উপহার গ্রহণ করিতেন, বা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য রাজ-ভবনে পদার্পণ ...লে নবাবের বিশ্বাস জন্মিত যে, ফকীর নির্লোভী পুরুষ নহেন, আর তাহার ... রাখিতেন না। এইরূপে কত ফকীর আসিল ...ল; রাজ-কন্যার বর আর জুটিল না। অবশেষে এক রাজকুমার ঐ কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিলেন। তিনি নবাবের পূর্ব্বোক্ত পণের কথা জানিতেন না। তিনি সরলভাবে আসিয়াই বলিলেন, "আমি অমুক স্থানের নবাবের পুত্র, আপ-নার কন্যার রূপগুণের কথা অনেক শুনিয়াছি; তাঁহার পাণি-

গ্রহণার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; নবাব বলিলেন, "সাচ্চা ফকীর না হইলে আমার কন্যা দিব না।" রাজকুমার ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে প্রায় দুই তিন বৎসর পরে নবীন্ বয়সের এক ফকীর নবাবের রাজধানীর সন্নিকটে দেখা দিলেন। তাঁহার ফকীরের বেশ, ফকীরের জীবন, কিন্তু দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, মুখে প্রতিভার জ্যোতি, আচার ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত-বংশজাত ব্যক্তির লক্ষণ। এই ফকীর রাজ-ধানীর সন্নিকটে আসিয়াছেন এই সংবাদ নবাবসাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রথমে মহামূল্য পরিচ্ছদ ও বিবিধ খাদ্য সামগ্রী উপহার পাঠাইলেন। নবীন ফকীর ঐ সকল দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের নবাব কি আমাকে তাঁহার ধন সম্পদ দেখাইতে চান? আমি ফকীর মানুষ, আমার এ সকল দ্রব্যে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তাঁহার নিকটে যে সকল লোক বসিয়া ছিল, তাহাদিগকে সে সকল দ্রব্য লুটাইয়া দিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে নবাবের মনে বড়ই আনন্দ হইল, ভাবিলেন, আমার কন্যার বর এত দিনে জুটিয়াছে। তৎপরে নবাব ফকীরকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যেরা গিয়া বলিল, "নবাব সাহেবের নিবেদন, আপনাকে দয়া করিয়া একবার রাজভবনে পদার্পণ করিতে হইবে।" ফকীর আবার হাসিয়া বলিলেন, "এত লোক আমার নিকটে আসে, কত ধর্ম্মালাপ হয়, এ সকল ফেলিয়া আমি রাজভবনে যাইব, সে কিরূপ? তোমাদের

নবাবের ইচ্ছা হয় তিনি আমার নিকট আসুন।” নবাব এই উত্তর যখন পাইলেন, তখন তাঁহাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। কতিপয় দিবস পরে নবাব উক্ত প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু ফকীর প্রস্তাব শুনিয়া গভীরভাবে বলিলেন, “নবাব সাহেব? আপনার কি স্মরণ হয়, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে অমুক দেশের রাজ-কুমার আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিয়াছিল?” নবাব বলিলেন, হাঁ। ফকীর বলিলেন, “এই যাহাকে ফকীরের বেশে দেখিতেছেন, এ সেই ব্যক্তি। আপনার কন্যাকে পাইবার জন্যই আমি ফকীরের বেশ ধরিয়াছি, নানা তপস্যা করিয়াছি, নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছি, ফকীরের রীতি নীতি শিখিয়াছি, অবশেষে আপনার রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছি। কিন্তু আপনার ভৃত্য চলিয়া যাওয়ার পর, এই কয় দিনে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি ভাবিতেছি, যে জিনিসের নকলের এত আদর, সেই ধর্ম্মের আসল কি তাহা একবার দেখিব; আমি আর আপনার কন্যার পাণিগ্রহণপ্রয়াসী নই; এখন যে নূতন ব্রত আমার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহাই আমি সাধন করিব; এখন আমি স্থানান্তরে চলিলাম।”

নকলের যদি এত আদর, তবে আসল না জানি কি! এ জগতে আসল যাহা তাহারই শক্তি, তাহাই স্থায়ী। মানুষ আপনাকে না জানিয়া অনেক আশা করে, যাহা নিজের প্রাপ্য নহে, তাহাও পাইতে চায়; কিন্তু চরমে দেখি তাহাতে খাঁটি

জিনিস যতটুকু আছে, আসলে সে যতটুকু পাইবার যোগ্য তাহাই পায়। যে মৃত্যুর পূর্ব্বে না পায় সে পরে পায়; বিধাতার রাজ্যে আসল জিনিসের মার নাই। রামমোহন রায় একাকী খাটিলেন, লোকে বলিল, ওটা কোনও কর্ম্মের মানুষ নয়, ওটা অকালকুষ্মাণ্ড, দেশের শত্রু, মরিয়া গেলে ওর কাজ কর্ম্মের চিহ্নও থাকিবে না। সমকালবর্ত্তী বাঙ্গালিরা বলিল, "বড়লোক যদি দেখিতে চাও, তবে রামদুলাল সরকারকে দেখ, বিশ্বনাথ মতিলালকে দেখ, যাহারা সামান্য অবস্থা হইতে উঠিয়া লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইয়াছে। রামমোহন রায় কিসের বড়লোক? একটু মেধা আছে, একটু মার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, একটু শাস্ত্রীয় বিচারের শক্তি আছে এই মাত্র।" কিন্তু ইতিহাস কি বলিল? রামমোহন রায়ে যে খাঁটী বস্তুটুকু ছিল, তাহার আদর দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে। এখন লোকে বলিতেছে, শঙ্করের পরে এমন ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ভারতে জন্মে নাই; এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মানবপ্রেমে এরূপ মহৎ লোক, জগতের আর কুত্রাপি জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। দেখ, আসল বস্তুর আদর হইতেছে কিনা?

অতএব এস, আমরা নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোযোগী হই; বাক্য অপেক্ষা কার্য্যকে শ্রেয় মনে করি; বাহিরের দম্ভ অপেক্ষা ভিতরের শক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করি। কাজে যতটুকু করি ততটুকুকেই আপনাদের প্রকৃত সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। বিষয়ী লোকে কি ছায়া দেখিয়া ভোলে? একজন

লোক বিদেশে চাকুরী করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কেহ বলে এক লাক, কেহ বলে দেড় লাকের কম ত নয়, কেহ বা বলে যতটা শোনা যায় ততটা নয়, পঞ্চাশ হাজারের অধিক হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আনিয়াছে, সে জানে তাহার সম্পত্তি ত্রিশ হাজার মাত্র। সে কি পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত করে? সে আপনার কোমরের জোর কত তাহা জানে, যে কাজই করুক না কেন, ঐ ত্রিশ হাজারকে মনে রাখে, ও তাহার মত কাজই করে। ধর্ম্মজীবন বা ধর্ম্মসমাজ বিষয়েও আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে নগদ যতটুকু আছে, ততটুকুই শক্তি, পুষ্পিত বাক্যে যতই বলি না, কাজে দাঁড়ায় না। এস আমরা নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোযোগী হই।

সারবান ধর্ম্মজীবনের পথের বিঘ্ন।

গত বারে আসল ও নকল সম্বন্ধে কিছু বলা গিয়াছে, কিন্তু কিরূপে ধর্ম্মজীবনে অসারতা প্রবেশ করে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা ভাল। প্রাচীন কালের ভক্তিভাজন ঋষিগণ আমাদিগকে এ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ;—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎকবয়ো বদন্তি।"

অর্থ—পণ্ডিতগণ এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া যদি কেহ চলে, তবে যেমন তাহাকে সতর্ক থাকিতে হয়, নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এ পথও তেমনি। আর একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা এই দুর্গমতা কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম-জীবনের পথে চলা যেন দড়িবাজির ন্যায়। দড়িবাজি অনেকেই দেখিয়াছেন। একটী ভারি দ্রব্য স্কন্ধে লইয়া, বা একটী জল-পূর্ণ কলস মস্তকে করিয়া, যে দড়ির উপর দিয়া চলে, তাহাকে কিরূপ সতর্ক থাকিতে হয়! হস্তস্থিত তুলা-যষ্টি গাছির উপর কিরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয়! সে ব্যক্তির মনে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকে, যে সেই তুলাযষ্টিগাছি একটু স্বস্থানচ্যুত হইলেই সর্ব্বনাশ! তেমনি সারবান ধর্ম্মজীবন যাঁহারা লাভ

করিতে চান, তাঁহাদিগকেও সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়; কতকগুলি বিষয়কে ভয়ের চক্ষে দেখিতে হয়।

প্রথম, ভয় করিতে হয় মানুষের দৃষ্টিকে। জনসমাজে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গেলেই দশ জনের দৃষ্টি আমাদের উপরে থাকে। এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের পক্ষে ইহাতে ঘোর বিপদ। এ জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা এ জীবনে সর্ব্বদাই অভিনয় করিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের চিত্তের উপরে মানুষের প্রশংসার এমনি উম্মাদিনী শক্তি, যে দশ জনে যাহা চায়, তাহারা অজ্ঞাতসারে সেইরূপ হইয়া যায়। লোকের বাহবাতে তাহাদিগকে নাচাইয়া তোলে; যত অধিক বাহবা পড়িতে থাকে, ততই তাহাদের নাচের মাত্রা বাড়িয়া যায়; মানুষের ভালারে ভালারে শব্দ যেন নিরন্তর তাহাদের কাণে বাজিতে থাকে ও তাহাদিগকে গঠন করিতে থাকে। এই নীরব "ভালারে ভালারে" শব্দের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি, যে ইহার প্রভাবে এ জগতে অতি মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে, আশ্চর্য্য স্বার্থনাশ, অদ্ভুত সাহস, ঘোর বৈরাগ্য, কঠোর তপস্যা, সমুদয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এ দেশে চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে বাণফোড়া ও চড়ক পাকের রীতি ছিল; লোকে লৌহশলাকার দ্বারা আপনার পৃষ্ঠে দুইটা প্রকাণ্ড ছিদ্র করিয়া, তন্মধ্যে রজ্জু দিয়া, তদবস্থাতে চড়কগাছে ঝুলিত ও পাক খাইত। আমরা দেখিয়াছি, যতই চতুর্দ্দিকের লোক বাহবা

বাহবা করিত, ততই ঐ দোদুল্যমান ব্যক্তিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত। মান্দ্রাজ প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "ডেভিল ডান্সিং" নামে একপ্রকার ক্রীড়া করে; মুখের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নি পুরিয়া নাচিতে থাকে। শুনিয়াছি চারি-দিকের লোকের বাহবাতে তাহাদিগকে এতই উত্তেজিত করে যে, তাহারা নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান হইয়া যায়। "ভালারে ভালারে" শব্দের প্রভাব যে কেবল এই সকল স্থানেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে, ভালারে শব্দের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা কত সহমৃতা সতীর সাহস, কত সমরজয়ী বীরের শৌর্য্য ও কত ধর্ম্মজগতের নেতার বৈরাগ্য ও ধর্ম্মভাব, গঠিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? এই শ্রেণীর মানুষের কর্ম্মকে এই জন্য অভিনয় শব্দে অভিহিত করিয়াছি যে অভি-নেতৃগণ যেরূপ দর্শকের দৃষ্টি ও প্রশংসার দ্বারা আপনাদিগকে চালিত ও গঠিত করিয়া থাকে, ইঁহারাও অজ্ঞাতসারে তাহাই করেন। কিন্তু অভিনয়ের দ্বারা সারবান ধর্ম্মজীবন কখনই লাভ করা যায় না; এজন্য সমাজে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে গিয়া মানবের দৃষ্টিকে সর্ব্বদা ভয় করিতে হইবে। ধর্ম্মসাধন করিবার সময়ে মানুষ আমাকে কেমন দেখিতেছে, ইহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। সাধনের সময়ে সজনে থাকিয়াও নির্জ্জন হইতে হইবে। লোকের দৃষ্টি চিত্তের উপরে কার্য্য করিতেছে কি না, সতর্ক হইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়, ভয় করা চাই কল্পনাকে। আর এক শ্রেণীর

লোক জগতে আছে, যাহাদের প্রকৃতির মধ্যে কল্পনার মাত্রা কিছু অধিক। ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য স্থলে যে অবস্থা বা যে আদর্শ থাকে, সেই অবস্থা বা সেই আদর্শ তাঁহাদের চিত্তকে এতদূর অধিকার করিয়া বসে যে, তাঁহারা সেই আদর্শের বিষয় ভাবিয়া ও তাহার প্রসঙ্গ করিয়া সেই সুখেই নিমগ্ন থাকেন, তাহা জীবনে লাভ করিবার জন্য যে সংগ্রাম করিতে হইবে, সে কথা আর মনে থাকে না। ইহা কিরূপ তাহারও একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একব্যক্তি গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আর একজন যান নাই, দুই জনে বন্ধুতা আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কল্পনাপ্রবণ লোক; তিনি গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন আসিয়া প্রথমোক্ত বন্ধুর সহিত দার্জ্জিলিং পাহাড়ের বায়ু কিরূপ ঠাণ্ডা,—সেখানে কিরূপে গ্রীষ্মকালেও রাত্রে কম্বল ব্যবহার করিতে হয়,—সেখানে কিরূপ হৈমন্তিক শস্য সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে ইত্যাদি বিবরণ শ্রবণ করেন, ও ভাবে মগ্ন হইয়া "আহা আহা" করিতে থাকেন। সেই ভাবমগ্নতা এত অধিক যে, তিনি সে সময়ের জন্য গ্রীষ্মের উত্তাপ ভুলিয়া যান; যেন কলিকাতার গ্রীষ্মে বসিয়া দার্জ্জিলিঙ্গের শৈত্য কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ করেন। একবার মনে হয় না, আচ্ছা দার্জ্জিলিঙ্গের শৈত্যের বিষয় শুনিয়া কি হইবে, আমি কেন একবার ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দার্জ্জিলিং যাই না। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপ এক শ্রেণীর মানুষ আছেন। তাঁহারা কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদাই সপ্তম স্বর্গে

উঠিতেছেন; সকল প্রকার কার্য্য, শ্রম, ও সাধনোপায় বর্জ্জন করিয়া স্বীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বসিয়া প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে প্রতিদিন সপ্তম স্বর্গে যাইতেছেন; এই শ্রেণীর সাধক ও সাধনপদ্ধতি বহুকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। এই কল্পনাপরতাকে ভয় করিতে হইবে, কারণ ইহা সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের বিরোধী।

তৃতীয়, ভয় করিতে হইবে ভাবুকতাকে। আর এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, যাঁহাদের প্রকৃতিতে ভাবের মাত্রা কিছু বেশী। একটা কথা শুনিতে না শুনিতে, একটা অবস্থা আসিতে না আসিতে, তাঁহাদের ভাব উছলিয়া উঠে। তাঁহারা যেন না পাইয়াও পেয়েছি পেয়েছি বলিয়া ছুটিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়েন। "এই ত হৃদয়ে রে" এই সঙ্গীত যেই উঠিয়াছে, অমনি তাঁহাদের বোধ হইতেছে যেন সত্য সত্যই ঈশ্বরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। চিত্তের এই ভাবপ্রণতার দুই বিপদ আছে; প্রথম ইহাতে একপ্রকার ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি উৎপন্ন করে; চিত্ত ভাবেই পরিতৃপ্ত হইয়া মনে করে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা তাহা করিয়াছি; তাঁহারা ভাবের পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া সারবান জীবন রূপ অমৃতময় ফলের প্রতি উদাসীন থাকেন। ভাবের মিষ্টতাই তখন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হয়; তখন তাঁহারা তাহাই অন্বেষণ করেন ও তাহাতে পরিতৃপ্ত থাকেন। ইহাকে ভাবুকতা বলে। যে ভাবের মিষ্টতাই চায়, ঈশ্বরের জন্ত, তাঁহার আদেশ পালনের

জন্য, তাঁহাতে প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপনের জন্য, সেরূপ ব্যগ্র নহে, সেই ভাবুক। যেমন অনেক সুরাপায়ী সুরাজনিত নেশা টুকুই চায়, সুরা নামক পদার্থের প্রতি বিশেষ নির্ভর নাই, সুরা দ্বারা যে নেশা হয়, ইথর, বা ওডিকলোং খাওয়াইয়া যদি সেই নেশাটুকু করিয়া দিতে পার, তবে ইথর বা ওডি-কলোংই ভাল, সুরাতে প্রয়োজন কি? তেমনি এই শ্রেণীর লোকের মনের ভাব এই—ঈশ্বরের নামে ভাবের যে মিষ্টতা হইতেছে, যদি সাকার পূজাতে তাহা হয় বা তদপেক্ষা অধিক হয়, তবে ঈশ্বরকে লইয়া মারামারি করাতে কাজ কি? সুতরাং ইঁহাদের পক্ষে নিরাকার হইতে সাকারে বা সাকার হইতে নিরাকারে গড়াইয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবুকতা যে কেবল ধর্ম্মজীবনের আদর্শ সদ্গুণ লাভের পক্ষেই ব্যাঘাত করে তাহা নহে, দোষ পরিহার বিষয়েও সমূহ ব্যাঘাত করে। অপরের চরিত্রে যে দোষ দেখিয়া তীব্র ভাবের উদয় হয়, আপন চরিত্রে যে তাহা আছে, তাহার প্রতি মানুষকে অন্ধ রাখে। ধর্ম্মানুরাগের ন্যায় অধর্ম্ম নিবারণ ও ভাবোচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়! আমরা নিজ নিজ জীবনে ভাবুকতার এই অনিষ্ট ফল লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি বলিয়াই এতটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিতেছি।

ভাবুকতার আর একটী অনিষ্ট ফল আছে যে, ইহা মানুষকে এক বিষয়ে, এক সাধন পথে, বহুকাল স্থির হইয়া থাকিতে দেয় না। মানব-চরিত্রের গূঢ় রহস্য যাঁহারা জানেন,

তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, পুত্তিকারা যেমন শনৈঃ শনৈঃ বল্মীক নির্ব্বাণ করে, তেমনি শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মকে সঞ্চয় করিতে হয়; অর্থাৎ ধীরে ধীরে ও বহু আয়াসে এক একটী অভ্যস্ত দোষকে সংশোধন করিতে হয়, ও এক একটি সদ্‌গুণ উপার্জ্জন করিতে হয়। এ কার্য্যে যে পরিশ্রান্ত, নিরাশ, বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, চরিত্রগঠন, বা ধর্ম্মসাধন তাহার কর্ম্ম নহে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে, যে, কোন ও সাধনপথ অবলম্বন করিলে, বহুকাল ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সে পথে চলিতে হয়। শুভ সঙ্কল্প করিয়া কোনও ভাল কাজে হাত দিলে, বহুদিন তাহাতে লাগিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু যাঁহার প্রকৃতিতে ভাবুকতা আছে, সেই ভাবুকতা তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দেয় না। একটা কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার পূর্ব্বে হৃদয়ের ভাবের আবেগ কার্য্যান্তরে লইয়া ফেলে। একটা কাজে হাত দিয়াছি, কিছুদিন করিতেছি, সেটা পুরাতন হইয়াছে বটে, কিন্তু সফল হয় নাই, এমন সময় আর একটা প্রস্তাব সম্মুখে উপস্থিত, তাহা কল্পনাকে অধিকার করিল, তাহা দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হইবে মনে হইল, অমনি ভাবের আবেগ উপস্থিত, অমনি আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল, আর চোকে কাণে দেখিতে দিল না; পশ্চাতে ফিরিয়া পুরাতন কাজটার প্রতি চাহিবার সময় পাইলাম না; নূতন কাজটার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। ভাবুক প্রকৃতির কি বিপদ! অথচ একটী মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া দীর্ঘকাল

তদুপরি আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে সফলতা প্রাপ্ত করিতে পারিলে, মানবচরিত্রে যে সারবত্তা জন্মে, অপর কোন উপায়ে তাহা হয় কি না সন্দেহ। এই জন্য বলি, সারবান ধর্ম্মজীবন যাঁহারা পাইতে চান, তাঁহাদিগকে ভাবুকতাকে ভয় করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, ভয় করিতে হইবে ধর্ম্মশাস্ত্রকে। একথাতে সকলে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। সাধুরা ধর্ম্মজীবনের সহায়তার জন্য বার বার যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমি তাহাকে ভয় করিতে বলিতেছি। ইহার কারণ কি? কারণ এই, অনেক লোক অনেক সময় ধর্ম্মশাস্ত্র-জ্ঞানকে ধর্ম্ম মনে করে। ধার্ম্মিকদিগের উক্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে মানুষ ধর্ম্মের অনেক কথা জানিতে পারে, সেগুলি মুখে বলিতে পারিলেই যে মানুষ ধার্ম্মিক হইল, তাহা নহে। এক-জন কলিকাতা হইতে এক পা না নড়িয়া এখানে বসিয়া বসিয়া পাঁচখানি পর্য্যটকদিগের নিমিত্ত প্রণীত বর্ণনা-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে সংবাদ সংকলন পূর্ব্বক, একটী বর্ণনা-পুস্তক প্রকাশ করিতে পারে। অমুক স্থানে দ্রষ্টব্য পদার্থ এই এই আছে, অমুক স্থানে যাইতে বাহন এই প্রকার, ব্যয় এত, ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় সংবাদ ও বিবরণ দিতে পারে, তাহা দিতে পারা ও স্বয়ং দেশ ভ্রমণ করা, দুই কি একই কথা? তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উক্তি সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব ঘোষণা করা ও নিজে ধর্ম্মজীবন বিষয়ে অভিজ্ঞতা

লাভ করা, দুই এক কথা নয়। কিন্তু অনেকে দুইকে এক মনে করেন; অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের মনে এক প্রকার অহমিকার সঞ্চার হয়, তাহা সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে সুমহৎ বিঘ্ন উৎপাদন করে।

সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের পথে পঞ্চম বিঘ্ন মেধা। মেধাকেও ভয় করিতে হইবে। মেধা শব্দের অর্থ প্রখরা বুদ্ধি। এই প্রখরা বুদ্ধি দুই প্রকারে কার্য্য করে। প্রথম ইহার গুণে মানুষ ত্বরিত একটা জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে; তাহাকে ধারণা শক্তি বলা যায়। মেধাশালী লোকদিগের ধারণা শক্তি প্রবল; কিন্তু অনেক মেধাবান লোকের ধারণা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার অসহিষ্ণুতা থাকে। তাঁহারা একটা বিষয়ে কিঞ্চিৎ দূর প্রবেশ করিয়াই, তাহার ভাবটা এক প্রকার সংগ্রহ করিয়া লন। তখন আর অধিক গভীর স্থানে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত ধৈর্য্য থাকে না। দুই একটা তত্ত্ব জানিয়াই উপরে উঠিয়া পড়েন, ও বাহিরে তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মেধার এই এক অনিষ্ট ফল, যাহাতে সারবান ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে দেয় না।

মেধার দ্বিতীয় অনিষ্ট ফল এই,—মেধাশালী লোকেরা সচরাচর কৃতী, কার্য্যকুশল, বাগ্মী, সুলেখক প্রভৃতি হইয়া থাকেন। জগতের লোকে তাঁহাদের কৃতিত্ব, বাগ্মিতা, প্রভৃতি দেখিয়া ভুলিয়া যায়, তাঁহারাও নিজে লোকের চক্ষে আপনাদিগকে দেখিতে দেখিতে, আত্ম-প্রতারিত হইয়া পড়েন;

আপনাদের কৃতিত্ব ও বাগ্মিতা প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে থাকেন। এইরূপে তাঁহারা নিজের জালে নিজে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এই ভ্রান্তি হইতে আপনাকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। যে সমাজে সারবান ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা মেধার অর্থাৎ কৃতিত্বের বা বাগ্মিতার আদর অধিক, সে সমাজ সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের অনুকূল নহে। এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের শেষ বিঘ্ন কার্য্যবহুলতা। ধর্ম্ম-জীবনের দুই পিঠ আছে; আত্ম-চিন্তা ও আত্ম-পরীক্ষার দিক এবং বাহিরের কর্ত্তব্যসাধন ও নরসেবার দিক। যে জীবনে কেবল বাহিরের কাজ আছে, নানা কার্য্যে ব্যস্ততা আছে, নরসেবা আছে, কিন্তু নির্জ্জনতা নাই, আত্ম-চিন্তার সময় নাই, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা ও গভীরতা হয় না। এজন্য ধর্ম্মসাধনাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই জীবনে নির্জ্জন ও সজন দুইএর সমাবেশ চাই। ব্রাহ্মের পক্ষে কাজ এরূপ বাড়ান কর্ত্তব্য নয়, যে পাঠ ও আত্মচিন্তার সময় থাকে না। মানুষ এজগতে কাজ করিবার কল নয়, যে তাহার সমুদয় শক্তি ও সমুদয় সময় কাজেই যাইবে। কলখানারও বিশ্রামের প্রয়োজন, যখন তাহার চাকাতে তৈল দিতে হয়, ভাঙ্গা অংশ মেরামত করিতে হয়। মনুষ্যের চাকাতে কি তৈল দেওয়ার প্রয়োজন নাই? দিবসের মধ্যে কিয়ৎকাল নির্জ্জন বাস সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়,

তদ্ভিন্ন মানুষ গড়ে না; আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত এরূপ হওয়া আবশ্যক যে গৃহস্বামী ও স্বামিনীর পক্ষে কাজের সময়ে কাজ, পাঠের সময়ে পাঠ ও চিন্তা অবাধে হইতে পারে। জ্ঞানালোচনা ও আত্ম-চিন্তাবিহীন ধর্ম্মজীবনে কখনই সারবত্তা থাকে না।

সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের পথে যে বিঘ্নগুলির উল্লেখ করা গেল, সকলগুলিই ধর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অথচ সকল গুলিরই পথে বিপদ আছে। সেই বিপদ আমাদিগকে পরিহার করিতে হইবে। ঈশ্বর করুন যেন আমরা তাহা করিতে সমর্থ হই।

বিচ্ছেদের ধর্ম্ম ও মিলনের ধর্ম্ম।

(০)

বিচ্ছেদের ধর্ম্ম ও মিলনের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দুই প্রকারের আছে। জগতের প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের অধিকাংশকে বিচ্ছেদের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা বিচ্ছেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরে মানবে বিচ্ছেদ, মানবে মানবে বিচ্ছেদ, ইহার কোনও না কোনটী তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

যে সকল ধর্ম্ম সাকারবাদ বা অবতারবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরে মানবে বিচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছে ও মানবের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। কারণ যাহা কিছু ঈশ্বরকে মানবাত্মা হইতে দূরে লইয়া যায়, এবং তাঁহাকে মানব-বিবেকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করে, তাঁহাকে অন্তরে স্থান না দিয়া, দূরে স্থাপন করে, তাহাতে মানবাত্মার প্রকৃত উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাকারবাদ ও অবতারবাদ উভয়েরই সেই দিকে গতি। সাকারবাদ বলে তোমার ইষ্টদেবতা ঐ বাহিরে, তোমার আত্মার ভিতরে নয়, ঐ সম্মুখে, এবং তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে ধূপ, দীপ, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিতে হয়। তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য কিছু হইতে হয় না, কিছু কিছু দিতে হয়; হৃদয়মনের পবিত্রতা, ব্যবহার ও আচরণের বিশুদ্ধতা, এ সকল তত প্রয়োজনীয় নহে,

যত ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদির প্রয়োজন। সকলেই ইহা অনু-ভব করিতে পারেন যে, এরূপ বহির্ম্মুখীন সাধনের গতি মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে মানবাত্মা হইতে, মানবের চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের রাজ্য হইতে, বিযুক্ত করার দিকে। যে ধর্ম্মে এই বহির্ম্মুখীন সাধন প্রবল হয়, তাহা ক্রিয়াবহুল হইয়া পড়ে; এবং অচিরকালের মধ্যে কতকগুলি অসার, প্রাণহীন, নিয়ম পালনে দাঁড়ায়। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন, যে সর্ব্ব-দেশেই মধ্যে মধ্যে এরূপ মহাজন অভ্যুদিত হইয়াছেন, যাঁহারা এই বিচ্ছেদের ধর্ম্মের গতি দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করি-য়াছেন। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এরূপ মহাত্মগণ দেখা দিয়াছেন। বৈদিক কালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অভ্যু-দিত হইয়াছিলেন, যিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন,—

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

"হে গার্গি, এই অবিনাশী পুরুষকে (যিনি মানবাত্মাতে সন্নিহিত, এবং যিনি সকলকে চালাইতেছেন) না জানিয়া, এক জন মানুষ যদি সহস্র বৎসর, হোম, যাগ, তপস্যা করে, সে সমুদয় বিফল হয়।"

বৈদিক সময়ের পরেও গীতাকার বলিয়াছেন:—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া;
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

অর্থ—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। কারিকর যেমন যন্ত্রারূঢ় পদার্থ সকলকে স্বেচ্ছাক্রমে ঘুরাইয়া থাকে, তেমনি তিনি এই বিশ্বসংসারকে আপনার মায়াশক্তির দ্বারা ঘুরাইতেছেন, তুমি সমগ্র হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হও।

ঈশ্বর হৃদয়ে, এ কথা বলিলেই মানবের দৃষ্টিকে বাহির হইতে ভিতরে আনিয়া দেওয়া হয়; আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যদিও পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণ তাহা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। দেশের অধিকাংশ লোক, সাকারবাদের মধ্যে পড়িয়া, ইষ্ট-দেবতাকে বাহিরে ও দূরে দেখিয়া দেখিয়া অসার ও ক্রিয়াবহুল ধর্ম্মের পাশের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিয়াছে।

সাকারবাদের ন্যায় অবতারবাদেরও গতি ঈশ্বরকে মানবাত্মা হইতে দূরে লইয়া যাইবার দিকে। কি কারণে অবতারবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, এখানে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার ফল যাহা হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। অবতারবাদ বলে যে করুণাময় ঈশ্বর কৃপাপরবশ হইয়া ভূভার হরণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, পৃথিবীর যেরূপ পাপ তাপ দেখিয়া ভগবান কোনও অতীত কালে, কোনও দেশ বা জাতি বিশেষের মধ্যে, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেরূপ পাপ তাপ কি মানবকুলের মধ্যে এখন বিদ্যমান নাই? পৃথিবী কি পাপ-ভারে এখনও

ক্রন্দন করিতেছে না? এখনও রাজাদের অত্যাচারে প্রজারা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়া দলে দলে মরিতেছে; এখনও ধনীর অত্যাচারে দরিদ্র, পুরুষের অত্যাচারে নারী, ক্রন্দন করিতেছে; এখনও সবল জাতিগণ দুর্ব্বল জাতি-সকলের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে ধনে প্রাণে সারা করিতেছে; এখনও নর-রুধিরে মেদিনী প্লাবিত হইয়া যাইতেছে; এখনও সভ্যতা-ভিমানী জাতিরা প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি সকলকে মৃগয়ালব্ধ পশুযূথের ন্যায় হত্যা করিতেছে; এখনও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পাপস্রোত বর্ষার স্রোতের ন্যায় কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে! পৃথিবীর পাপভারের জন্য ভগবানের বিশেষ ভাবে অবতীর্ণ হইবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে সে প্রয়োজন সর্ব্বদা রহিয়াছে। একবার পৃথিবীর এক কোনে অবতীর্ণ হইয়া কি হইল? বা বহুবর্ষ পরে আবার অবতীর্ণ হইবেন জানিয়াই বা কি হইল? এই অবতারবাদ শোকার্ত্ত তাপার্ত্ত, পাপ-ভীত মানবহৃদয়ের পক্ষে কি নৈরাশ্যপূর্ণ সংবাদ দিতেছে তাহা অনেকে বিবেচনা করিয়া দেখেন না। মানবাত্মা পাপ তাপে অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে, সেণ্টপলের ন্যায় মস্তকের কেশ ছিন্ন করিয়া বলিতেছে "হায় রে, হায় রে! আমি হতভাগ্য নরাধম, আমাকে এই পাপ-যন্ত্রণা হইতে কে উদ্ধার করিবে?" তাহার উত্তরে অবতারবাদ বলিতেছে "তুমি আশ্বস্ত হও, প্রভু অমুক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন শ্রবণ কর।" ইহা কি শোকার্ত্ত তাপার্ত্ত

মানবহৃদয়ের পক্ষে বিদ্রূপ নহে ? মুক্তিদাতা ঈশ্বর অমুক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শুনিয়া আমার লাভ কি ? আমি যে এখনি মুক্তি চাই, আমি যে আর পাপ-জ্বালা সহিতে পারিতেছি না, আমি যে আর নিজ বলে উঠিতে পারিতেছি না, আমাকে এখন কে তোলে ? পাপীর হৃদয় বলে প্রভু যদি কৃপাপরবশ হইয়া পাপীর উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন, তবে এই মুহূর্ত্তে এই হৃদয়ে অবতীর্ণ হউন, নতুবা আমি আর বাঁচি না। ঈশ্বর অমুক দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বলিলে কি তাঁহাকে মানব-হৃদয়ের কাছে আনিয়া দেওয়া হয় ? তাহা কি ঈশ্বরদর্শনের সঙ্গে সমান ? একজন পল্লীগ্রামের লোক স্বীয় গ্রামে বসিয়া যদি শোনে যে একবার কলিকাতায় আলিপুরের পশুশালাতে শুক্ল ভল্লুক আসিয়াছিল, তাহা হইলে কি তাহার শুক্ল ভল্লুক দেখা হইল ? এই কারণেই বলি, অবতারবাদ মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে মানবাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, দূরে লইয়া গিয়াছে।

এই ত গেল মানবে ঈশ্বরে বিচ্ছেদ, আবার অনেক ধর্ম্মে মানবে মানবে বিচ্ছেদ দেখা যায়। এটা প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। আদিমকালে জগতের জাতিসকলের মধ্যে জাতিভেদ অতিশয় প্রবল ছিল। এক জাতি অপর জাতির সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিত; সুতরাং তাহাদের হৃদয়নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবও সেই জাতিভেদের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইত। বেদে দেখি শ্বেতকায় আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে ইন্দ্র কৃষ্ণ-

বর্ণ ত্বক্ নিঃশেষিত কর।” কৃষ্ণকায়গণ শ্বেতকায়দিগের শত্রু, সুতরাং ইন্দ্রেরও শত্রু। শ্বেতকায়গণ ইন্দ্রের প্রিয়, সুতরাং ইন্দ্র কৃষ্ণকায়দিগকে ক্লেশ দিতে ভাল বাসেন। ইন্দ্র শ্বেতকায়-দিগের একচেটিয়া দেবতা। এইরূপ ইজ্‌রায়েল বংশীয়গণ মনে করিত, জিহোভা ইজরায়েলদিগেরই দেবতা; ইজরায়েল-বিরোধিগণকে তিনি হত্যা করিতে ভালবাসেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ মনে করিত, কাফেরদিগের প্রতি আল্লার দয়া মায়া নাই, আল্লার হুকুম এই, তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা কর, নারীদিগকে বাঁদী কর, বালকবালিকাদিগকে ক্রীতদাস-দাসীরূপে বিক্রয় কর।

এইরূপে প্রাচীন জাতিসকলের জাতীয় বৈরভাব ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানবে মানবে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্য, জু ও জেণ্টাইল, হিন্দু ও ম্লেচ্ছ, গ্রীক ও বার্ব্বেরিয়ান, ইসলাম ও কাফের প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীন বৈরভাব প্রবল রহিয়াছে।

এদেশে হিন্দুম্লেচ্ছরূপ বিচ্ছেদের ভাব ত আছেই, তদ্ব্যতীত আরও দুই কারণে মানবে মানবে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। প্রথম জাতিভেদ নিবন্ধন, দ্বিতীয় অদ্বৈতবাদ নিবন্ধন। জাতিভেদে বলিয়াছে, ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের যে অধিকার আছে, শূদ্রের সে অধিকার নাই। ইহাতে শ্রেণীবিভাগ ও জাতিভেদ ঘটাইয়াছে। তৎপরে অদ্বৈতবাদ বলিয়াছে, যদি পরিত্রাণ চাও,

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

"মায়ার রচনা যে এই জনসমাজ ও সামাজিক সমুদয় সম্বন্ধ, এ সকলকে পরিহার করিয়া, ত্বরায় ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর।" অদ্বৈতবাদ এদেশে ধর্ম্মকে সমাজবিরোধী করিয়াছে; মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছে।

খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম এক নূতন অর্থে প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইটী শব্দকে ব্যবহার করিয়াছে। যাহা কিছু মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ তাহা যেন ধর্ম্মের বিরোধী, এবং যাহা কিছু ধর্ম্মের অনুগত তাহা যেন মানব-প্রকৃতিবিরোধী এই একটা ভাব দাঁড় করাইয়াছে। এই যে মানব-প্রকৃতি ও ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ, ইহা সেণ্ট অগষ্টাইনের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলে আর একটা ভাব আছে। তাহা এই, তাঁহারা ধর্ম্মকে কোনও অতিনৈসর্গিক প্রণালীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত মনে করেন। সেণ্ট অগস্টাইনপ্রমুখ খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে মানব-প্রকৃতি ধর্ম্ম চায় না, ধর্ম্ম তাহার উপরে চাপাইবার জিনিষ; সেই প্রকৃতিকে নব জীবনদ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া তবে তদুপরি আরোপ করিবার জিনিস। ঈশ্বর এক অতিনৈসর্গিক প্রক্রিয়ার দ্বারা মানব-প্রকৃতির উপর ধর্ম্ম চাপাইয়াছেন। ধর্ম্মের এই অতিনৈসর্গিকতা হইতে নিসর্গ-বিরোধিতা আসিয়াছে, যাহা কিছু মানব-প্রকৃতি চায় সমুদয় যেন ধর্ম্মবিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে, এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সমন্বিত সুন্দর জগতের

সঙ্গে, এই ঈশ্বরের সুরম্য ক্রীড়াভূমি, মানবের সম্ভোগের উপযুক্ত, আরামকাননের সঙ্গে, একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মন যদি ঐ সুন্দর ফুলটী দেখিয়া তাহা ঘ্রাণ করিতে চায়, নবোদিত ঊষার আলোক দেখিয়া আহা আহা করে, ঐ কলকণ্ঠ-বিহগের সুস্বর-ধারা কর্ণ ভরিয়া পান করিবার প্রয়াসী হয়, তবে যেন সে প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে হইবে, এবং নিতান্ত বাধা না দেও, মানব-প্রকৃতির অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

ঐ সকল ধর্ম্ম-মতে যেমন জগতের সঙ্গে মানবাত্মার একটা বিচ্ছেদের ভাব আছে, সেইরূপ দেহের সঙ্গেও আত্মার একটা বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হইয়াছে। দেহটা যেন শয়তানের কেল্লা, এবং আত্মাটা ঈশ্বরের কেল্লা,—এই উভয় দুর্গ হইতে গোলাগুলি সর্ব্বদাই চলিতেছে। মানবের যত পাপ, যত বিকৃত বুদ্ধি, যত পতনের কারণ, ঐ হতভাগ্য দেহ হইতে। ঈশ্বর যদি আত্মার সঙ্গে এই রক্তমাংসময় নটবহরটা না বাঁধিয়া দিতেন, হায়! তাহা হইলে আমরা অবাধে ধর্ম্মসাধন করিতে পারিতাম। দেহ ও আত্মার মধ্যে এই বিরোধ সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই দেখা যায়! এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া জগতের সাধুগণ এক এক জন স্বীয় স্বীয় দেহকে কিরূপ নির্যাতন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে হৃৎ-কম্প উপস্থিত হয়! এদেশে আজিও কত মানুষ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া রহিয়াছে! পঞ্চতপা হইয়া প্রখর গ্রীষ্মের দিনে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসিয়া শরীরকে ভাজিতেছে! কত মানুষ

পঞ্জালের শয্যা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকিতেছে! উপবাস, উপবাস, উপবাসে শরীরকে শুকাইয়া কাষ্ঠ করিয়া ফেলিতেছে! ঈশ্বর যে আত্মার সঙ্গে শরীরটা দিয়া ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন, যতদূর সম্ভব তাহা সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যেও এরূপ আত্ম-নিগ্রহের দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। তাঁহাদের মধ্যে এক সময় দেহকে নিগ্রহ করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ধার্ম্মিকগণ চর্ম্মের যাতনাপ্রদ অঙ্গরক্ষা পরিধান করিয়া থাকিতেন; উপবাস অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতেন; মধ্যে মধ্যে দেহ অনাবৃত করিয়া অপরের দ্বারা তাহাতে বেত্রাঘাত করাইতেন; গিরিগুহায় সামান্য ফলমূল আহার করিয়া বৎসরের পর বৎসর পড়িয়া থাকিতেন; সামান্য একটু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদয় হইলে, দেহকে গুরুতর শাস্তি দিতেন; যেন দেহ সকল নষ্টের মূল! সাইমন ষ্টাইলাইট নামক একজন সাধক একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি বহুবৎসর দণ্ডায়মান অবস্থাতে ছিলেন। এইরূপে তাঁহারা শরীরকে যাতনা দিবার অবধি রাখেন নাই! এখনও তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন ভাবাপন্ন সাধকগণের ভাব এই যে, আধ্যাত্মিক ভাবে শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিতে হইলে শরীরকে আত্মার বিরোধী জানিয়া তাহাকে পদে পদে নিগ্রহ করিতে হইবে।

এই ত গেল বিচ্ছেদের ধর্ম্ম; কিন্তু বিচ্ছেদের ধর্ম্মে আর

চলিতেছে না। এখন জগতে মিলনের ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া মানব-চিত্তে ও মানব-চরিত্রে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! সর্ব্বত্রই মিলন ও সন্ধিস্থাপন হইতেছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, এ ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিবার উপায় নাই; ঘনিষ্ঠ একতাসূত্রে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত; সর্ব্বত্র একই জ্ঞান, একই শৃঙ্খলা, একই শক্তি,—ইহার মধ্যে দুই নাই। বর্ত্তমান সময়ের একজন সর্ব্বাগ্র-শ্রেণীগণ্য দর্শনবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যদি বল ব্রহ্মাণ্ডের উপরে একাধিক দেবতা আছেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহাদের একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে, এবং কখনও কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ হয় না, এবং যে কিছু কর্ম্ম হয়, এক মতেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান, শক্তি ও শৃঙ্খলার এমনি একতা।

একদিকে যেমন খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের বিচ্ছিন্ন অংশ সকল গ্রথিত হইয়া একত্ব সম্পাদন করিতেছে, তেমনি মানবে মানবে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য প্রাচীনকালে যে সকল প্রাচীর উত্থিত করা হইয়াছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যের বিস্তার হইয়া, দেশ-পর্য্যটনের সুবিধা হইয়া, জাতিতে জাতিতে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হইয়া, দিন দিন অনুভব করা যাইতেছে যে, এই বহু বিস্তীর্ণ মানবপরিবারের এক অংশকে দুঃখে রাখিয়া অপর অংশ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। ভারতে দুর্ভিক্ষ ক্লেশ উপস্থিত হইলে, নিউইয়ার্কে রুটীর দাম বাড়িয়া যায়;

দক্ষিণ আফ্রিকাতে যুদ্ধ বাঁধিলে সমগ্র সভ্য জাতি অল্লাধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; সকলেরই বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটে। দেখ কেমন একতাতে জগতের সকল জাতি বাঁধা হইতেছে! বর্ত্তমান সময়ে জাতিসকলের যুদ্ধ-বিগ্রহপ্রবৃত্তি যতই প্রবল দৃষ্ট হউক না কেন, জগতে সেই দিন আসিতেছে, যখন ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সহিত একস্বরে সকলে বলিবে—

শান্তি-খড়্গঃ করে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং।

শান্তিরূপ খড়্গকে যে ধারণ করিয়াছে, সেই লোকত্রয় জয় করিয়াছে।"

ইহার উপরে আবার বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষভাগে নরতত্ত্বের অদ্ভুত আলোচনা হইয়া এবং সকল জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়ে গবেষণা হইয়া, মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্বেতকায় হউক আর কৃষ্ণকায় হউক, বর্ব্বর হউক আর সুসভ্য হউক, মানুষ মানুষ; মানবের উন্নতির ক্রম ও প্রণালী সর্ব্বত্র একই। যেমন ঐ দ্বিপত্রবিশিষ্ট নবাঙ্কুরটী ভাবী প্রকাণ্ড মহীরূহের সূচনা মাত্র, তেমনি ঐ অরণ্যবাসী নগ্নকায় বর্ব্বর মানুষটী ভাবী সুসভ্য মানুষের সূচনামাত্র। ইহাতেই মানুষে মানুষে যে প্রাচীন বিচ্ছেদ ছিল তাহা ঘুচাইয়া দিতেছে। আমরা মনুষ্য-পরিবারকে এক পরিবার, মানব-প্রকৃতিকে এক প্রকৃতি ও মানব নিয়তিকে এক নিয়তি ভাবিতে শিখিতেছি। সেইরূপ এই বাহ্য জগতের সঙ্গে এবং দেহের সঙ্গে আত্মার যে বিচ্ছেদ ছিল, তাহাও ঘুচিয়া যাইতেছে। দেহকে হীন বোধ করা দূরে

থাক, নিগ্রহের উপযুক্ত মনে করা দূরে থাক, সাজা দিবার পাত্র ভাবা দূরে থাক, বরং একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, দেহ দেবতার পূজা বর্ত্তমান সভ্যতার একটী প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেহ-মহাশয়কে প্রসন্ন করিবার জন্য কত আয়োজন! দেহ-মহাশয় রেলগাড়ীতে যাবেন, অতএব বেঞ্চে গদি লাগাও; দেহমহাশয় গ্রীষ্মের উত্তাপ সহিতে পারেন না, অতএব সেই গাড়ীতে খস্‌খস্ লাগাও; দেহ মহাশয়ের ঝাঁকুনি না লাগে, এইরূপ করিয়া গাড়ি ও চাকা নির্ম্মাণ কর—ইত্যাদি ইত্যাদি, দেহের পরিচর্য্যার অন্ত নাই। বলিতে কি, দেহের প্রতি এমনি মনোযোগ যে পাপ অপেক্ষা রোগকে, হৃদয়ের কঠিনতা অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকে, অধিক ভয় করা হইতেছে। স্বাস্থ্যের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য শত শত বিজ্ঞানবিদের মস্তিষ্ক নিযুক্ত হইতেছে, শত শত জীবন্ত প্রাণীর দেহ প্রতিদিন কাটিয়া দেখা যাইতেছে। এই যে দেহের ও স্বাস্থ্যের অতিরিক্ত পূজা, ইহাকে প্রাচীন অতিরিক্ত দেহ-নিগ্রহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দেহের প্রতি যেমন অতিরিক্ত মনোযোগ পড়িয়াছে, তেমনি চির অবজ্ঞাত এই জড় জগতের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞান কোনও রাজ্যে প্রবেশ করিতে বাকি রাখিতেছে না! দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশে উঠিতেছে; অণুবীক্ষণ সাহায্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সর্ব্বত্রই মানুষ দেখিতে পাইতেছে, এ জগত

মানুষের ধর্ম্ম-জীবনের শত্রু নয়, পরম বন্ধু; এ জগতে জগৎ-পতি মানবের অন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন, মানবের সুখের নানা উপকরণ সামগ্রী সাজাইয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ দেখিতেছি, esthetics বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিকে অধিক দৃষ্টি পড়িতেছে। শিশুর সুকোমল হাস্যে, পুষ্পের প্রস্ফুটিত শোভাতে, পূর্ণ-চন্দ্রের বিমল জ্যোতিতে, দৃঢ়কায়, মাংসল, সুস্থ, সুন্দর পুরুষের বিশাল বক্ষে ও উজ্জ্বল নেত্রে, রূপলাবণ্য-সম্পন্না নারীর প্রস্ফুটিত মুখপদ্মে, সর্ব্বত্রই মানুষ ভীম কান্ত ভাব, ও ঈশ্বরের প্রেমমুখ-জ্যোতি দেখিতে শিক্ষা করিতেছে।

তাই বলি, জগতে এমন দিন আসিতেছে, যখন আর বিচ্ছেদের ধর্ম্মে চলিবে না। এখন আর ঈশ্বর মানবাত্মা হইতে দূরে থাকিতেছেন না। দেখ, দেখ তিনি মানব-হৃদয়ের কাছে আসিতেছেন। মানব-হৃদয়ের কাছে কেন, মানবাত্মার সঙ্গে এক আলিঙ্গনে একীভূত হইতে চাহিতেছেন। সকলের সঙ্গে মিল করাইয়া দিয়া নিজে মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছেন! যে শতাব্দী চলিল, তাহার শেষভাগে এই এক মহাতত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, জগতে সত্য বস্তু দুই নাই,—একই। একই সত্তা জড়ে চেতনে, একই সত্তা দ্যুলোকে ভূলোকে, একই সত্তা অন্তরে বাহিরে, তবে আমরা যে সৎ, জগৎ যে সৎ, তাহা কেবল তাঁহারই আশ্রয়ে। তিনি আমাদিগকে সত্তা দিয়া নিজ মায়া-শক্তির দ্বারা আপনা হইতে উৎপন্ন করিতেছেন বলিয়া

আমরা সৎ হইয়াছি। তিনি আপনা হইতে একটু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না দিলে আমরা কি তাঁহাকে আজ পূজা করিতে পারিতাম? দেখ, আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বাস করিতেছি; তাঁহারই শক্তিদ্বারা বিধৃত হইয়া তাঁহারই আলিঙ্গনের মধ্যে রহিয়াছি; আমরা তাঁহা হইতে দূরে নই। জ্ঞান ও প্রেম উভয়ে মিলিয়া বর্ত্তমান সময়ের এই মহামিলন সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বর বলিতেছেন আমাকে ভালবাস, এবং আমার যাহা কিছু আছে সকলকে ভালবাস; তাই আমরা এই প্রেম ও মিলনের ধর্ম্মের মহাভাব পাইয়া জগতকে, মানুষকে, আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইতেছি। দেখ, আমরা কি উদার, কি আধ্যাত্মিক, কি বিশাল ধর্ম্মভাব লইয়া বিংশতি শতাব্দীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। জয়, এই মিলনের ধর্ম্মের জয়। হে অল্পবিশ্বাসি, তুমি কেন ভয় কর, এই মহাধর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ কর!

ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম।

জগতের ভ্রান্তি ও কুসংস্কারসমন্বিত ধর্ম্মসকলকে সচরাচর উপধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম বলিয়া একটা বস্তু আছে, যাহা তাহাদের সকলের মধ্যে থাকাতেই তাহাদের স্থিতি সম্ভব হইতেছে, এবং তাহারা এতকাল মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিতে পারিতেছে। সেই ধর্ম্ম বস্তুটা কি এবং উপধর্ম্ম সকলকে উপধর্ম্ম কেনই বা বলি, এবং ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে আমরা কি উপদেশ পাইতে পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার করা অদ্যকার উদ্দেশ্য।

এ জগতে যত পদার্থ আছে তাহাদের স্থিতির কতকগুলি কারণ আছে। তাহাদের অন্তর্নিহিত কতকগুলি গূঢ় শক্তি তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতেছে। সেই অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি না থাকিলে তাহারা বিলয় প্রাপ্ত হইত এবং স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে পারিত না। এই শক্তিগুলিকে এবং ঐ সকল শক্তির কার্য্যগুলিকে ঐ সকল পদার্থের ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, অগ্নির ধর্ম্ম দহন করা, বা জলের ধর্ম্ম শৈত্য ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই, অগ্নির মধ্যে এমন কোনও স্বাভাবিক শক্তি আছে যাহার বলে অগ্নি দহন করিতে

পারে, ঐটীই তাহার প্রধান ক্রিয়া, ঐটীই তাহার স্বভাব এবং ঐ শক্তি থাকাতেই অগ্নি পদার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তদ-ভাবে অগ্নির অগ্নিত্ব যাইত, অর্থাৎ অগ্নি বিলুপ্ত হইত। জলের শৈত্যগুণ সম্বন্ধেও সেইরূপ, জলে এমন কিছু আছে জল যে জন্য শীতল এবং শীতলতা দান জলের প্রধান ক্রিয়া, এবং যে কারণের সত্তানিবন্ধন জল শীতলতা দান করিতে পারে, তাহা বিলুপ্ত হইলে জলের স্থিতিই অসম্ভব, এই কারণেই শৈত্যকে জলের ধর্ম্ম বলে।

মানবের দেহ সম্বন্ধেও ঐরূপ; মানব দেহ যে জগতে দণ্ডায়মান থাকে, নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় ও কার্য্য করে, তাহার মুলে কতকগুলি অন্তর্নিহিত কারণ বা শক্তি আছে। সেগুলির বিরাম হইলেই দেহের বিলোপ হয়, আমরা তাহাকে মৃত্যু বলি। ঐ সকল অন্তর্নিহিত কারণ বা শক্তিগুলিকে দেহের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, মানবসমাজের স্থিতির মুল কারণ কি? এরূপ কোনও অন্তর্নিহিত কারণ কি আছে, যাহা থাকাতে মানবসমাজের স্থিতি সম্ভব হইতেছে, এবং যাহার অভাবে মানবসমাজের বিলোপাশঙ্কা? এরূপ কোনও অন্তর্নিহিত কারণ না থাকিলে মানব-সমাজ কিরূপে রহিয়াছে, কিরূপে কার্য্য করিতেছে, কিরূপে বিষয় বাণিজ্য, রাজকার্য্য প্রভৃতি বিস্তার করিতেছে? বরং দেখা যাইতেছে মানব-হৃদয়ে এমন সকল প্রবৃত্তি আছে, যাহারা অন্ধের ন্যায় স্বীয় চরিতার্থতাই

অন্বেষণ করিতেছে; এমন সকল হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা প্রভৃতি রহিয়াছে, যাহা মানব-সমাজকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। ঐ সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি অবাধে কাজ করিতে পারে, এবং ঐ সকল হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি যদি অবাধে স্বীয় শক্তিকে বিকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে স্বল্প কালের মধ্যেই মানব-সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব বন্য পশুর দশায় পড়িতে পারে। তবে কে মানব-সমাজকে ধরিয়া রাখিতেছে? কোন গূঢ় শক্তি সেই সকল অন্ধ প্রবৃত্তি-সকলকে শৃঙ্খলিত করিয়া, সেই সকল হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতিকে বাধা দিয়া, মানব-সমাজের স্থিতি সম্ভব করিতেছে? আমরা জগতের ইতিবৃত্তে জাতি সকলের উত্থানপতন দেখিয়াছি; কোনও জাতি বা এক সময়ে সভ্যতার উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিল, আবার বর্ব্বরতার গভীর গর্ত্তে পতিত হইয়াছে; কোনও কোনও জাতির জীবনে এরূপ সকল যুগ দেখিয়াছি যখন তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পাপ প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া তাহাদিগকে পশুর অধম করিয়াছে; এই কালের মধ্যে যাহা গর্হিত, যাহা ব্রীড়াজনক, তাহা তাহাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বজনের আদৃত হইয়াছে, অবাধে আচরিত হইয়াছে, অথচ তাহারা বন্য দশায় পতিত হয় নাই। আবার এমন সময় আসিয়াছে, যখন কোনও অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে এক যুগের পাপ-প্রবৃত্তি আর এক যুগে সংযত হইয়াছে; এক যুগের যথেচ্ছাচার আর এক যুগে নিবারিত হইয়াছে; এক

যুগের নরনারী যাহার আচরণে কুণ্ঠিত হয় নাই, আর এক যুগের লোকে তাহার স্মরণে লজ্জিত হইয়াছে ; গড়ের উপরে মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াছে এবং স্বীয় কার্য্য চালাইয়াছে।

কে মানব-সমাজকে এরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে ? মানবাত্মাতে নিশ্চয় এমন কিছু আছে যাহার গুণে মানব-সমাজ স্থিতি করিতেছে ; যাহার বলে অন্ধ প্রবৃত্তিসকল সংযত হইতেছে ; যাহার প্রভাবে হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, জিগীষা প্রভৃতি নিয়মিত হইয়া যাইতেছে। এই যে মানবাত্মার স্বভাবনিহিত শক্তি, তাহাকে ধর্ম্মশাসন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। একটা জড়বস্তু যেমন ভৌতিক শক্তির দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, তেমনি মানব-সমাজ এই ধর্ম্মশাসন দ্বারা ধৃত হইয়া রহিয়াছে। জড়ের পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, মানবাত্মার পক্ষে এই ধর্ম্মশাসন তেমনি স্বাভাবিক ; উভয়ই অলঙ্ঘনীয়, উভয়ই অনিবার্য্য, উভয়ই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত। ইহা পরিষ্কার রূপে জানিয়া রাখা উচিত যে যে আদি শক্তি বা আদি কারণের দ্বারা জগত চলিতেছে, ধর্ম্মশাসন তাঁহারই অঙ্গীভূত। জগতের মহাজনগণ, সিদ্ধ পুরুষগণ, মানব-প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্মশাসনকে লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে বিবিধ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বুদ্ধ ইহাকে বলিলেন ধর্ম্ম, মহম্মদ বলিলেন "আল্লা হো আকবর" মহান প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছা, যীশু বলিলেন, "আমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা" ভারতের ঋষিরা বলিলেন :—

"স সেতু র্বিধৃতি রেষাং লোকানামসম্ভেদায়"

"এক অক্ষর অবিনাশী পুরুষ সেতুস্বরূপ হইয়া এই লোক-সকলকে ও মানব-সমাজকে ধারণ করিতেছেন।" বাহিরে যত প্রভেদ থাকুক না কেন, কথাটা মূলে এক, পাপ পুণ্যের ফলদাতা হইয়া একজন মানবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছেন। স্বীকার কর ইঁহার হাত অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। তবে ভারতীয় ঋষিদিগের বিশেষত্ব এই তাঁহারা এই শক্তিকে জড়ে ও চেতনে সমান ভাবে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—

যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃসর্ব্বানুভূঃ
যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ,
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

"যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ এই আকাশে অন্তর্নিহিত আছেন, যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ এই আত্মাতে অন্তর্নিহিত হইয়া আছেন, তাঁহাকেই জানিয়া ও লাভ করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে; মুক্তিলাভের অন্য পথ আর নাই।"

একই শক্তিকে তাঁহারা দেশ ও কাল উভয়ত্র ব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব তাঁহারা এই অনুভব করিলেন, মানবাত্মাতে এক স্বাভাবিক ধর্ম্মশাসন বিদ্যমান, যাহাকে অতিক্রম করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। দ্বিতীয় তত্ত্ব সকলেই এই অনুভব করিয়াছিলেন, যে হৃদয়নিহিত ধর্ম্মশাসনের অধীন হওয়াতেই মানবের কল্যাণ ও শান্তি; তাহার অধীন হইতেই

হইবে। ইহার পরেই প্রশ্ন উঠিল, কিরূপে মানবকে এই অন্তর্নিহিত শাসনের অধীন হইতে হইবে? বুদ্ধ বলিলেন, যোগের দ্বারা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারা। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই, আত্মার প্রবৃত্তিসকলকে বাধা দিয়া, আত্মার হাত পা বাঁধিয়া, তাহাকে এই অন্তর্নিহিত শাসনের অধীন করিতে হইবে। মহম্মদের উপদেশ এই, বাধ্য করিতে হইবে ভয়ের দ্বারা। মহম্মদ যেন বলিতেছেন, আল্লার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, অসীম ক্রোধ ও জ্বলন্ত নরকাগ্নি তোমার সম্মুখে, তুমি বাধ্য না হইয়া যাবে কোথায়? যীশু বলিলেন, বাধ্য করিতে হইবে প্রেমের দ্বারা; তাঁহার উপদেশের যেন মর্ম্ম এই, হে মানব! যিনি তোমার পিতা, তোমার কল্যাণকৃত সুহৃৎ, তুমি কেন তাঁহার অধীন হইবে না? তুমি সমগ্র হৃদয় মন্ প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভালবাস, দেখিবে তাঁহার বাধ্যতা তোমার পক্ষে সুখকর হইবে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে যীশু এই মূল উপদেশের সহিত স্বর্গ নরকের লোভ এবং ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতীয় ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিয়াছিলেন, এই বাধ্যতা আসিবে বিমল জ্ঞান দ্বারা; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন মানুষ অজ্ঞাতবশতঃই অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে করে ও তাহাতে আসক্ত হয়; যে জ্ঞান দ্বারা অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া জানা যায়, সেই জ্ঞান লাভ করিলে মানুষের আসক্তি-পাশ ছিন্ন হইবে ও মানুষ সহজে এই অবিনাশী পরম পুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

তবে ধর্ম্মের দুইটী সার মূল তত্ত্ব এই পাওয়া যাইতেছে— প্রথম, এক ধর্ম্মাবহ পুরুষ মানবাত্মাতে নিহিত থাকিয়া ধর্ম্ম-শাসনকে প্রবল রাখিতেছেন; দ্বিতীয় সেই শাসনের অধীন হওয়াই মানবের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের উপায়।

জগতের সকল উপধর্ম্মের মধ্যেই এই দুইটী মূলতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাদিগকে উপধর্ম্ম বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই মূলতত্ত্বের সহিত অনেক আবর্জ্জনা যুটিয়াছে; জগৎ ও মানব সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত লিপ্ত হইয়াছে। জগতের উপধর্ম্ম সকলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—শাস্ত্রনিষ্ঠ ও গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম। অর্থাৎ কতকগুলি সম্প্রদায় এক এক জন মহাপুরুষ হইতে অভ্যুদিত হইয়া তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; ইঁহাদিগকে গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অপর কতকগুলির প্রকৃতি সেরূপ নহে, তাঁহারা কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান নহেন, কিন্তু বহুজনের উক্তি ও উপদেশকে আশ্রয় করিয়া আছেন; তাঁহাদেরই উক্তিকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন এবং তাঁহাদেরই প্রদর্শিত আচারকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন: যেমন হিন্দুধর্ম্ম অথবা প্রাচীন রোম বা গ্রীসের ধর্ম্ম। এই জন্য ইহাঁদিগকে শাস্ত্রনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, যে ইঁহারা ব্যক্তি বিশেষের নামে পরিচিত নহেন; কিন্তু শাস্ত্র অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত। গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্মেও শাস্ত্র-নিষ্ঠতা আছে; কিন্তু গুরুনিষ্ঠতাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষণ। শাস্ত্রনিষ্ঠ

ধর্ম্মেও গুরুনিষ্ঠতা আছে কিন্তু শাস্ত্র বা আচারনিষ্ঠাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষণ। এই উভয়বিধ ধর্ম্মেই দুইটী ভ্রান্তি দেখা গিয়াছে; প্রথম জগৎ ও মানব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা; দ্বিতীয় শাস্ত্র বা গুরুর অভ্রান্ততাবাদ। এই উভয় মূল হইতে সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার অভ্যুদিত হইয়াছে। প্রথম, উক্ত ধর্ম্ম সকলের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এমন সকল প্রশ্ন ধর্ম্মের এলাকাভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন যাহা ধর্ম্মের এলাকাভুক্ত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই পৃথিবী সাতদিনে হইয়াছে, কি সাত লক্ষ বৎসরে ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়; তাহার সহিত মানবাত্মার ভদ্রাভদ্রের সম্বন্ধ নাই। অথচ জগতের অনেক শাস্ত্রনিষ্ঠ ধর্ম্ম তাহাকে ধর্ম্মের এলাকাভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ যেন মনে করিয়াছিলেন, এই জগৎ সম্বন্ধে মানব-হৃদয়ে যত প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে, সকলের সদুত্তর দেওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারের কর্ত্তব্য। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফল এই হইয়াছে, ধর্ম্মোপদেশের সহিত জগৎ ও মানব-সম্বন্ধীয় বিবিধ ভ্রান্ত মত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

গুরু ও শাস্ত্রের অভ্রান্ততাবাদ হইতেই ঐ প্রকার অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছে; এক যুগের ভ্রম বহু বহু যুগ মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে; এবং মানবের চিন্তার প্রসার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু উপধর্ম্ম সকলের এই গতি নির্ণয় করিবার সময় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই শাস্ত্রনিষ্ঠা ও গুরু-নিষ্ঠা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবকে পোষণ করিয়াছে বলিয়াই ঐ সকল ধর্ম্ম এত কাল জগতে রাজত্ব করিতেছে; এবং মানবহৃদয়কে শাসন করিতে পারিতেছে। জগদীশ্বর একদিকে যেমন মানবাত্মাতে নিহিত থাকিয়া ধর্ম্মশাসনকে প্রবল রাখিতেছেন, তেমনি আর এক দিকে মানব-হৃদয়ে এরূপ একটী স্বাভাবিক বৃত্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা মানব একদিকে তাঁহার সঙ্গে অপরদিকে জগতের বহুকালসঞ্চিত অমূল্য জ্ঞান-সম্পত্তির সঙ্গে এবং মানবের ধর্ম্মগুরু মহাজনগণের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে! এই স্বাভাবিক বৃত্তিকে ভক্তি নাম দিতেছি। ইহা মানব-প্রকৃতির অদ্ভুত উপাদান সামগ্রী! ইহা মানবের অপূর্ব্ব সম্পদ! ইহা মানবের সর্ব্ববিধ মহত্ত্বের মূল! মানব সেই জীব, যে দৃশ্যকে ভুলিয়া অদৃশ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে! অপর জীবেরা যাহা চক্ষে দেখে, যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাকেই ভাল বাসিতে পারে, কিন্তু মানবই কেবল অতীন্দ্রিয় পদার্থকে ভাল বাসিতে পারে। যীশু স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রাণ দিলেন, কিন্তু এ স্বর্গরাজ্যটা কি? তাহা ত তাঁহার ভাষাতেও ব্যক্ত হইল না! তিনি নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে জিনিসটাকে তাঁহার বিরোধীগণ হাসিয়া উড়াইল; বন্ধুগণ এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া লইল; অথচ তাহার প্রতি তাঁহার

এমনি প্রেম জন্মিল, যে সে জন্য প্রাণটা দেওয়া কিছুই মনে করিলেন না। আবার বলি, এই যে অতীন্দ্রিয় বিষয়কে মানুষ ভাল বাসিতে পারে, অতীন্দ্রিয় বিষয়কে সম্পদ মনে করিতে পারে, ইহাই মানুষের মহত্ত্ব। মানব-হৃদয়ের যে ভাব, যে বৃত্তি, যে শক্তি এই অতীন্দ্রিয় বিষয়কে বুকে ধরে তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তি যখন ভগবানের চরণালিঙ্গন করিয়া স্বর্গীয় বেশে উত্থিত হয়, তখন তাহাকে বলি ভগদ্ভক্তি; যখন জগতের বহুকাল-সঞ্চিত জ্ঞান-সম্পত্তিকে বুকে ধরে তখন বলি শাস্ত্রনিষ্ঠা; যখন মহাজনদিগের চরিত্রের আদর্শ দেখিয়া তাঁহাদের চরণে নত হয়, তখন বলি সাধুভক্তি; মূলে ইহা একই, প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন।

এই ভক্তিবৃত্তির বিষয়ে যতই চিন্তা করি ততই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হই। একবার ভাবিয়া দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! জগতের কত বিষয় বিলুপ্ত হইয়াছে, বহু বহু সহস্র বৎসর পরে তাহাদের ভগ্নাবশেষ সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে! কোনও স্থানে বা এক মহানগরী ছিল, তাহা ভূমিতলে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, কোনও রাজার কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিল তাহা বিদেশীয়েরা অধিকার করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে; সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য সকল ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই; কত সাহিত্য, কত কাব্য, কত বিষয় বাণিজ্যের উন্নতি ছিল, যাহা মানবের স্মৃতি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু এই জাতি সকলের অভ্যুত্থান ও পতনের মধ্যে, সমৃদ্ধি ও অবসাদের মধ্যে,

বহুযুগ-ব্যাপী ও বহুদূর-ব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে, মহাবিনাশ ও প্রলয়ের মধ্যে, জগতের ধর্ম্মগুলি, সাধুজনের উক্তিগুলি, আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বলগুলি, সুরক্ষিত হইয়াছে! হিন্দুদের সকল কীর্ত্তি বিলোপ প্রাপ্ত; কিন্তু বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের সহায় গ্রন্থগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে! যেমন ঘরে আগুন লাগিলে জননী টাকার ও অলঙ্কারের বাক্সটী ফেলিয়া শিশুটীকে বুকে ধরিয়া পলায়ন করে, তেমনি মানবজাতি প্রলয়ের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বুকে ধরিয়া পলায়ন করিয়াছে! ইহা ভাবিলে কাহার চক্ষে না জল আসে! ইহা হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায়? উপদেশ সেই অমূল্য ভক্তি, যাহা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার সহিত বাঁধিয়া রাখিতেছে। ভক্তির আতিশয্য হইতেই অভ্রান্তবাদ উঠিয়াছে। মানুষ ভাবিয়াছে যাঁহাদের পদধূলি পাইয়া পৃথিবী পবিত্র, তাঁহাদের উপরে আবার আমি কি বিচার করিব? তাঁহারা ত ঈশ্বরের অংশ, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য। মনে কর তুমি একটী বাতি জ্বালিয়া একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতেছ, এমন সময় হঠাৎ কোনও দিক হইতে একটী তাড়িত আলো জ্বলিয়া উঠিল; সমুদয় ঘর আলোকে ভরিয়া গেল; তখন আর কি তুমি আপনার বাতিটী জ্বালিয়া রাখ, না নিবাইয়া ফেল? তখন কি তুমি ভাব না আর আমার ক্ষুদ্র বাতিতে প্রয়োজন কি? অমনি তাহাকে নিবাইয়া ফেল, তেমনি যেন ভক্তিতে নত মানুষ সাধু মহাজনদিগের চরণে গিয়া ভাবিয়াছে,

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, আমার ভ্রান্তিশীল মতি, আর কি বিচার করিবে? এই যে আমার জন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া রহিয়াছে? অতএব আমার বুদ্ধি তুমি নিবিয়া যাও। আপনারাই বলুন, একথা ভাবিলে কি চক্ষে জল আসে না?

যে নিজের বাতি নিবাইতে যাইতেছে তাহাকে এইমাত্র বলি, ভাই বাতিটা নিবাইও না, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার হাতে ঐ বাতি দিয়াছেন; তোমার জীবন-পথে চলিবার পক্ষে ঐ তোমার পরম সম্বল; তুমি দেখিবে জীবন-পথে এমন অন্ধকারপূর্ণ রাস্তা আসিবে যেখানে ঐ সাধুজীবনের আলোক আর পাইবে না; তখন নিজের বাতি না থাকিলে অন্ধকার গর্ত্তে পড়িবে; আর একথা জানিও ঐ সাধু হৃদয়ের আলোক তোমার বাতিকে নিবাইবার জন্য দেওয়া হয় নাই; তোমার আলোককে উজ্জ্বলতর করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছে।

আমরা ইহা বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি প্রত্যেকের হৃদয়নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত; শক্তি জীবনে ঈশ্বর-দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও সাধুভক্তি তাহার বিকাশক ও পরিপোষক। বৃক্ষের বীজটী ভূমিতে পড়িলেই হয় না, তাহাকে ফুটাইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে সূর্য্যের উত্তাপ চাই, বায়ু চাই, পৃথিবীর রস চাই, তেমনি ধর্ম্মবীজ মানব-হৃদয়ে থাকিলেই হয় না, তাহাকে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিবার জন্য মণ্ডলীর ধর্ম্মভাব, প্রাচীনের জ্ঞান সম্পত্তি, সাধুজীবনের আদর্শ চাই। এজন্য

এ সকলেরই ব্যবস্থা বিধাতা করিয়াছেন। মানুষের ভ্রম এই স্থানে হইয়াছে যে তাহারা সাধুদিগকে ধর্ম্মজীবনের শিক্ষক ও পরিপোষক ভাবে না লইয়া ব্যবস্থাপকরূপে লইয়াছে। তাঁহারা আমাদের চিত্তে আদর্শ ও উদ্দীপনা আনিয়া দেন, এই মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া মানুষ বলিয়াছে, যে তাঁহারা আমাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই সংস্কারই সর্ব্ববিধ ভ্রমের উৎসস্বরূপ হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মের যে মহৎভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, তাহাতে শাস্ত্রের ও মহাজনদিগের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেছি, সকল উপধর্ম্মের অসার ও অনিত্য ভাব সকলের মধ্যে ধর্ম্মের সার ও নিত্য ভাব লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি।

দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের একটী উপদেশ এই ঃ—

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥

অর্থ—মানুষের ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে একটী ইন্দ্রিয়ের যদি ক্ষরণ হয়, তাহা হইলে চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রের জলের ন্যায় তদ্দারা তাহার সমস্ত হিতাহিত বুদ্ধি ক্ষরিত হইয়া যায়।

যে ঋষি এই বচন রচনা করিয়াছিলেন, তিনি কি দেখিয়া এরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিলেন? একটী চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রে অর্থাৎ ভিস্তির মশোকে যদি একটী মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হয়, তবে তদ্দারা যেমন অজ্ঞাতসারে সমস্ত জল বাহির হইয়া যায়, তেমনি মানব-চরিত্রের এক ধারে একটী ছিদ্র হইলে তদ্দারা অজ্ঞাতসারে সমগ্র চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়; একথা কি সত্য?

মশোকের ছিদ্রের দৃষ্টান্ত কি সুন্দর! এতদ্দারা আমরা ঋষির হৃদ্গত ভাবটী কেমন সুন্দররূপে অনুভব করিতে পারিতেছি! এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা কয়েকটী তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রতীতি করিতে পারি।

প্রথম তত্ত্বটী এই, কোনও পাত্রস্থিত জলরাশির মধ্যে যেমন একীভাব আছে, মানব-চরিত্রের মধ্যে তেমনি একীভাব

আছে। অর্থাৎ কোনও পাত্রস্থিত জলের এক অংশে কোনও শক্তিকে প্রয়োগ করিলে যেমন সর্ব্বত্র তাহা ব্যাপ্ত হয়, এক অংশে কোনও মলিন পদার্থ মিশ্রিত হইলে, তাহা যেমন সমগ্র জলরাশিকে আবিল করে, তেমনি মানব-চরিত্রের মধ্যে এরূপ একত্ব আছে যে চরিত্রের এক অংশে কোনও শক্তি প্রয়োগ করিলে সমগ্র চরিত্রে তাহা ব্যাপ্ত হয়, এবং এক অংশের সদসৎভাব সমস্ত চরিত্রকে কলুষিত বা উন্নত করে। এই সত্যটী আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি, এক অংশের কার্য্য সেই অংশেই আবদ্ধ থাকিবে, এবং তাহার ফল অপর অংশে ব্যাপ্ত হইবে না। মানুষ মিথ্যা কথাটী বলিবার বা প্রবঞ্চনাটী করিবার সময় মনে করে, একটী মিথ্যা কহিলাম বৈত নয়, বা এক বিষয়ে প্রবঞ্চনা করিতেছি বৈত নয়, আর সকল বিষয়ে ত ভাল আছি এবং ভাল থাকিব, তবে আর কি? কিন্তু ত্বরায় দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ চিন্তা কল্পনা মাত্র। মানব-চরিত্রকে এরূপ দ্বিখণ্ডিত করিয়া লওয়া যায় না। গৃহস্থের গৃহে যেমন ময়লা কাপড়গুলি লুকাইয়া রাখিবার জন্য একটী ঘর বা একটী থলে থাকে, তেমন যে মানব-চরিত্রের মধ্যে একটী ময়লা কাপড়ের থলে বা কুঠরী রাখা যায়, যাহাতে সমগ্র চরিত্রের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হয় না, এরূপ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যের সূক্ষ্ম শক্তি সমগ্র চরিত্রে ব্যাপ্ত হয়।

মানব-চরিত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভাবার অযৌক্তিকতা জনসমাজে প্রতিদিন প্রতিপন্ন হইতেছে। অনেক স্থলে

দেখিতেছি মানুষ মনে করিতেছে যে ভদ্র সমাজে চলিবার জন্য লোকে যেমন আটপরে ও পোষাকী দুই প্রকার বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি দুই স্থানের জন্য দুই প্রকার চরিত্র ও দুই প্রকার আচরণ রাখা যায়; এই ভাবিয়া দুই অবস্থার জন্য দুই প্রকার আচরণ রাখিয়া দেয়। গৃহে যে স্বেচ্ছাচারী, পরিবারপীড়ক, সে মনে করিতেছে যে, সে ভদ্রতার আবরণ পরিধান করিয়া বাহিরে ন্যায়কারী, সদ্বিবেচক ও পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী থাকিবে। ভাবিয়া তদনুরূপ করিতেছে, কিন্তু সময়ে সে আশা পূর্ণ হইতেছে না। তাহার পরপীড়কতা বাহিরের কাজেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। একজন লোক কিছুকাল কোনও কারাগারে কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সেই সময়ে উঠিতে বসিতে নিরুপায়, অসহায়, কয়েদীদিগকে কটূক্তি ও প্রহারাদি করা তাহার অভ্যাস-প্রাপ্ত হইয়া যায়। সে যখন কয়েদীদিগের প্রতি এ প্রকার ব্যবহার করিত তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই বাহিরের কোনও ভদ্র লোকের প্রতি সে কখনও কোনও অভদ্র আচরণ করিবে। সে হয়ত ভাবিয়াছিল দুই স্থান ও দুই অবস্থার জন্য দুই প্রকার আচরণ ও দুই প্রকার চরিত্র রাখিবে। কিন্তু ফল কি হইল? ফল এই দাঁড়াইল যে সে যখন কয়েক বৎসর পরে সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল, তখন এমন মেজাজ লইয়া আসিল, যে জন্য ভদ্র লোকে তাহার সঙ্গে মিশিতে ভয় পাইতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরাজগণ যখন বহু বৎসর পরে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া

স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন, তখন অনেক স্থলে দেখা যায়, যে সেদেশীয় দাসদাসীগণ তাঁহাদের গৃহে কর্ম্ম লইতে চাহে না। কারণ এদেশে ভৃত্যাদিগকে কথায় কথায় "গাধা, শূয়ার, শূয়ারকে বাচ্ছা" বলিয়া বলিয়া তাঁহাদের অভ্যাস ও স্বভাব এরূপ দাঁড়ায় যে, দেশে ফিরিয়া ভৃত্যদিগের সহিত সৌজন্যের সহিত কথা কহিতে মনে থাকে না। এজন্য ভারত-প্রতিনিবৃত্ত ইংরাজদিগকে সে দেশীয় লোক অনেক সময় দূরে দূরে পরিহার করে।

ইতিবৃত্তেও মানব-চরিত্রের এই একতার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তির পতন হইল কেন? অপরাপর কারণের মধ্যে বোধ হয় একটা কারণ এই যে, প্রাচীন রোমকগণ বহুল পরিমাণে দাসত্ব-প্রথাকে প্রশ্রয় দিতেন। তাঁহারা যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, তখন যে সকল দেশ জয় করিতেন, তাহা হইতে দলে দলে নরনারীকে বন্দী করিয়া আনিতেন; এই সকল হতভাগ্য নরনারীকে বাজারে নিলামে বিক্রয় করা হইত; ধনিগণ তাহাদিগকে ক্রয় করিতেন। রোমে এরূপ নিয়ম দাঁড়াইয়াছিল, যাঁহার যে পরিমাণে অধিক সংখ্যক ক্রীত দাস দাসী থাকিত তিনি সেই পরিমাণে সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতেন। এই সকল দাস দাসীর স্বামী বা স্বামিনীগণ সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতেন। অনেক সময়ে অতি সামান্য অপরাধে যাতনা দিয়া প্রাণদণ্ড করিতেন।

একটী দাসী যুবতী নিজ স্বামিনীর ভৎসনা শুনিয়া উত্তর করিয়াছিল বলিয়া উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা নিজের মস্তক হইতে হেয়ার্পিন লইয়া তাহার রসনাতে বিদ্ধ করিয়া রসনাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত রোমকের একটী বালক দাস একটী পুষ্পাধার বহন করিয়া আনিতে আনিতে অসাবধানতা-বশতঃ তাহা ফেলিয়া দিয়া ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রভু আদেশ করিলেন যে তাহার হাত পা বাঁধিয়া সমস্ত রাত্রি তাহাকে জলের চৌবাচ্চার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখা হইবে, মৎস্যগণ তাহার শরীরের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে। এরূপ অত্যাচার প্রতিদিন রোমের গৃহে গৃহে ক্রীত দাসদিগের প্রতি হইত, কাহারও চিত্ত বিশেষ উদ্বুদ্ধ হইত না। কিন্তু ইহার ফল আর এক দিকে গিয়া ফলিল। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, যে ন্যায়ানুরাগ রোমের প্রধান শক্তি ছিল, এবং রোমকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা জাতীয় চরিত্রে ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল; রোমকগণ অত্যাচার করিয়া করিয়া অত্যাচার বহন করিবার উপযুক্ত হইতে লাগিলেন; জাতীয় চরিত্র হইতে প্রাচীন তেজস্বিতা ও মনুষ্যত্ব চলিয়া গেল; রোম বর্ব্বর জাতিদিগের মুষ্ট্যাঘাত আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

এদেশেও ইহার প্রমাণ আছে। এখানে এরূপ অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন "লোকের কাছে লোকাচার সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার" অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট যখন বসিবে তখন আপনাদের

অবলম্বিত মতের মত আচরণ করিবে, কিন্তু লোকসমাজে যখন থাকিবে তখন তৎ তৎ সমাজপ্রসিদ্ধ যে কিছু আচরণ তাহা করিবে। অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় চরিত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া উন্নত ধর্ম্ম ভাব এক অংশে ও লৌকিক আচরণ আর এক অংশে রাখিবে। কালে দেখা গিয়াছে সে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় কেবল ভাবুকতা বা বাহ্য ক্রিয়ার আচরণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের আদেশ উপদেশাদি দ্বারা জনসমাজকে কিছুমাত্র উন্নত করিতে পারে নাই; বরং সমাজের নানা প্রকার ব্যাধি তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে।

ইতিবৃত্তে যাহা দেখিয়াছি, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্রবেই এরূপ মানুষ অনেক দেখিয়াছি, যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের প্রথমোদ্যমে আপনাদের চরিত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভাবিয়াছেন, যে তাঁহারা গৃহে, পরিবারে ও সমাজ মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাকে লইয়া যাইবেন না, তাহাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ও উপাসনা-মন্দিরে আবদ্ধ রাখিবেন। তাঁহারা যেন পরস্পরকে বলিয়াছেন "দেখ ভাই, অপরদিগের ন্যায় আমরা কাঁচা মাটীতে পা দিব না; ব্রহ্মোপাসনা বড় ভাল জিনিস, ব্রহ্মোপাসনাকে আমরা ধরিয়া থাকিব, গার্হস্থ্য, ও সামাজিক জীবনে যেরূপ চলিয়া আসিতেছি সেইরূপ চলিব; যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত সদনুষ্ঠানে যোগ দিতেছি তাহা দিব।"

কিন্তু কালে দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের ব্রহ্মোপাসনার

সরসতা নষ্ট হইয়াছে; সদনুষ্ঠানে অনুরাগ চলিয়া গিয়াছে; হৃদয়ের ধর্ম্মভাব কালে বিলুপ্ত হইয়াছে; তাঁহারা চরমে অপরাপর ব্যক্তিদিগের ন্যায় সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; চরিত্রের এক অংশে একটী দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়া সমগ্র চরিত্রকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে!

এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন, ক্ষেত্রের জল যেমন আলি দিয়া বাঁধিয়া রাখা যায়, তেমন মানব-চরিত্রকে আলি দিয়া বাঁধা যায় না; এক দিকে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিলে মশোকের জলের ন্যায় সমগ্র জল কালে বাহির হইয়া যায়।

মশোকের দৃষ্টান্ত দিবার আরও একটু তাৎপর্য্য আছে। মশোকের জল যেমন ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া যায়, মানব-চরিত্রের উন্নতি ও অবনতিও সেইরূপ অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। সূচ্যগ্র প্রমাণ ছিদ্র দিয়া অণু অণু পরিমিত জল যখন মশোক হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তুমি আমি তাহা দেখিতেছি না; যখন বহুল পরিমাণে জল বাহির হইয়া গিয়া মশোকটা খালি হইয়া গিয়াছে, তখনি হয়ত প্রথম লক্ষ্য করিতেছি; তেমনি ইন্দ্রিয়-বিশেষের ক্ষরণ হইয়া মানব-চরিত্র কিরূপে তিল তিল করিয়া নামিয়া যাইতেছে তাহা হয়ত আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না; যে ব্যক্তির চরিত্র নামিয়া যাইতেছে তিনিও বোধ হয় লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছেন না; তিনি হয়ত মনে করিতেছেন, কৈ আমার ত বিশেষ অধোগতি দেখিতেছি না, সেই পুরাতন কাজ, সেই পুরাতন উৎসাহ, সেই

পুরাতন বন্ধু বান্ধব সকলিত রহিয়াছে, আমি নামি নাই বরং উঠিতেছি ; কিন্তু কয়েক বৎসরের পরে দেখা গেল মানুষটী উচ্চভূমি হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। মানুষ আছে সে শক্তি নাই ; কাজ আছে সে অগ্নি নাই ; বন্ধু বান্ধব আছে সকলকে অনুপ্রাণিত করিবার সে ক্ষমতা নাই ; একটু ক্ষুদ্র আসক্তি সকলকে খাইয়া দিয়াছে। এই ক্ষুদ্র আসক্তির কথা বলিলেই কবীরের কথা স্মরণ হয়। কবীর বলিয়াছেন :—

মোটী মায়া সব কোই ত্যজে, ঝিনী ত্যজী ন যা।
পীর প্যাগম্বর আউলিয়া ঝিনী সবকো খা।

অর্থ—অর্থাৎ মোটা মোটা আসক্তি সকলেই পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না ; পীর প্যাগম্বর, আউলে, সূক্ষ্ম আসক্তিতে সকলকে খাইয়াছে।” এই ক্ষুদ্র আসক্তি সূচ্যগ্রের ন্যায় চরিত্রের মোশকে ছিদ্র করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা হৃদয়ের সমুদয় ধর্ম্মভাব ক্রমে বহির্গত হইয়া যায়।

এই মানব-চরিত্রের নামাটা বহুদিনে ঘটে। যে চিন্তা অগ্রে নিঃস্বার্থ বিষয়ে ধ্যান করিতে সুখী হইত ও সেইরূপ পথেই ঘুরিত, তাহা অল্পে অল্পে আসক্তির বিষয়ীভূত পদার্থে ঘুরিতে অভ্যস্ত হয় ; যে আকাঙ্ক্ষা অগ্রে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে ভাল বাসিত, তাহা তখন সেই ক্ষুদ্র আসক্তির বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার পথ অন্বেষণ করিতে থাকে ; যে কল্পনা এক সময়ে উন্নত অবস্থা ও উন্নত

লোক রচনা করিতে সুখী হইত, তাহা তখন বিষয়-জাল রচনা করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে ভাল বাসে। এইরূপে মানব-চরিত্র যেন সোপান পরম্পরাতে অবতরণ করিতে থাকে। প্রথমে চিন্তার অবনতি হয়; তৎপরে আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্রাশয়তা হইতে চিত্ত ক্ষুদ্র কাজে অবতরণ করে; ক্ষুদ্র কাজ হইতে মানুষের কথাবার্ত্তা, আত্মীয়তা বন্ধুতা সমুদয় ক্ষুদ্র হইয়া যায়। একজন মানুষ এক সময়ে বিশ্বাসী ও ব্যাকুল ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিতে ভাল বাসিত, বিষয়াসক্ত হইয়া সে এখন বিষয়ী লোকদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে ভাল বাসে। অগ্রে সে ভাবিত কিরূপে সৎকার্য্যের সহায় হইবে, এখন ভাবে কিসে একখানা বাড়ীর পরে আর একখানা বাড়ী করিবে, একটা যুড়ী গাড়ির পরে আর একটা যুড়ীগাড়ী হইবে। তাহার সকলি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; বিষয়াসক্তিরূপ ছিদ্র দিয়া সমুদয় মশোকের জল বাহির হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বচনে আর একটী তত্ত্ব নিহিত আছে। একটী ইন্দ্রিয়ের ক্ষরণ হইলে তদ্দ্বারা হিতাহিত বুদ্ধি পর্য্যন্ত ক্ষরিত হইয়া যায়। এতক্ষণ যে তত্ত্বের বিচার করিতেছিলাম, তাহাতে এইমাত্র অনুভব করিতেছিলাম যে চরিত্রের এক অংশের ভাল-মন্দ যাহা কিছু তাহা সমস্ত চরিত্রে ব্যাপ্ত হয়; কিন্তু এই উক্তিতে বলিতেছে যে মানবের চরিত্রের সহিত তাহার হিতাহিত বুদ্ধির এমনি নিগূঢ় সম্বন্ধ যে, ইন্দ্রিয়বিশেষের ক্ষরণ হইলে, ক্রমে হিতাহিত বুদ্ধিরও ব্যতিক্রম ঘটে। কলুষিত

ব্যসনের দ্বারা মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি কতদূর কলুষিত হয় তাহা আমরা অনেকে ভাবিয়া দেখি না। দুশ্চরিত্র মানুষের হিতাহিত বুদ্ধিরও বিলোপ হয়, জ্ঞানের নির্ম্মলতাও চলিয়া যায়। জ্ঞানের যে সত্য, হিতাহিত সম্বন্ধীয় যে কর্ত্তব্য সে ব্যক্তি অগ্রে উজ্জ্বল-রূপে অনুভব করিতে পারিত তখন আর তাহা পারে না, সমুদয় সংশয়াকুল হইয়া যায়। অপবিত্র বাসনা হইতে দূষিত বাষ্পের ন্যায় যে সকল চিন্তা ও যে সকল ভাব উত্থিত হইতে থাকে, তাহাতে তাহার চিত্তকে এমনি আবৃত করে যে সে সম্মুখের পথ আর দেখিতে পায় না; সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়।

সামান্য জ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য চিত্তের নির্ম্মলতার, হৃদয় মনের সুস্থতার, ও প্রকৃতির স্থিরতার, কত প্রয়োজন তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। এমন কি একজন বিজ্ঞানবিৎ যখন বিজ্ঞানের এক প্রক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, দুই সূক্ষ্মদ্রব্য একত্র সংযোজন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার হস্তখানি যাহাতে বিকম্পিত না হয়, দৃষ্টি যাহাতে স্থির থাকে, চিত্ত যাহাতে একাগ্র থাকে, স্নায়ুমণ্ডল যাহাতে উত্তেজনাহীন থাকে, এজন্য সমগ্র প্রকৃতির সুস্থতা ও চিত্তের নির্ম্মলতার প্রয়োজন। যে অন্তরে অসুস্থ, উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত, সে কিরূপে দৃষ্টি ও চিত্তকে স্থির রাখিবে?

সামান্য লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধেই যখন এইরূপ, তখন পার-মার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে ইহা কতগুণে সত্য তাহা সহজেই ধারণা করিতে পারা যায়। তুমি যে পরস্পর-বিসম্বাদী কর্ত্তব্যের

মধ্যে একটীকে নির্ণয় করিবে, নানা প্রবৃত্তির ও নানা স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এক পথ নির্দ্ধারণ করিবে, অধ্যাত্ম তত্ত্বের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্য-রত্ন উদ্ধার করিবে, চিত্তের নির্ম্মলতা ও স্থৈর্য্য ভিন্ন কি তাহা করিতে পার? আমি বলি যাহার হৃদয় সুস্থ, ঈশ্বর মানব ও জগতের সঙ্গে যাহার মিত্রতা, এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রকৃত আলোচনা করিতে পারে না।

ইহার বিপরীত কথাও সত্য। যাহার চিত্ত কলুষিত, হৃদয় অসুস্থ, অন্তর্দৃষ্টি মলিন, তাহার হিতাহিত বুদ্ধিও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অসৎ লোক চিন্তাতেও ভুল করে। গুরুতর কর্ত্তব্য অনেক সময়ে তাহার নিকট লঘু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন চিন্তা ও মলিন কার্য্যের মলিনতা তাহার দৃষ্টিকে আবরণ করে; এবং সেরূপ ব্যক্তি কর্ত্তব্যের পথ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায় না। অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ হয়, সামান্য সরলমতি বালক বালিকার নিকট যে সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা এই কলুষিত-হৃদয় জ্ঞানাভিমানীদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে। এই জন্যই বলি, ঋষিদিগের কথা সত্য, যাহার ইন্দ্রিয় ক্ষরণ হয় তাহার প্রজ্ঞাও ক্ষরিত হইয়া যায়।

চক্রনাভি ও চক্রনেমি।

সেই পরম পুরুষ কিরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য উপনিষদকার ঋষিগণ একটী উৎকৃষ্ট উপমা দিয়াছেন। তাহা এই :—

তদ্যথা রথনাভৌচ রথনেমৌচারাঃ সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বানি ভূতানি, সর্ব্বেদেবা, সর্ব্বেলোকা,
সর্ব্বে প্রাণা সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।

অর্থাৎ যেরূপ রথনাভিতে ও রথনেমিতে অর সকল অর্পিত থাকে, তেমনি সেই পরমাত্মাতে সমুদয় ভূত, সমুদয় দেবতা, সমুদয় লোক, সমুদয় প্রাণ ও সমুদয় আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে। এই বিষয়ে আমি যত উপমা বা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি সকলের মধ্যে এইটীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হয়। ইহার নিগূঢ় অর্থের মধ্যে প্রবেশ করিলে এক আশ্চর্য্য ভাব মনে আসে। রথচক্রের অর সকল যে স্ব স্ব স্থানে বিধৃত হইয়া থাকে, ও স্বীয় স্বীয় কার্য্য করে, তাহার প্রধান কারণ দুই শক্তি,—প্রথম, কেন্দ্রগ নাভির শক্তি—দ্বিতীয়, পরিধিস্থ নেমির শক্তি। কেন্দ্র হইতে নাভি অর সকলকে ধরিয়া রাখে, পরিধি হইতে নেমি তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ও পরিধি উভয় স্থানেই এক শক্তি; সেই পরমাত্মা, পরম পুরুষ, পরা শক্তি।

যে নামেই তাঁহাকে আখ্যাত কর না কেন, তিনিই কেন্দ্র হইতে জীবন ও শক্তিকে উৎসারিত করিতেছেন; আবার পরিধি হইতে প্রত্যেক পদার্থকে তাঁহার মহা আবেস্টনে আবদ্ধ রাখিতেছেন। তিনি দূর হইতে সুদূরে, আবার তিনি নিকট হইতেও নিকটে।

কেন্দ্র হইতে শক্তি কিরূপে পদার্থকে ধারণ করে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথম দৃষ্টান্ত সূর্য্য, সূর্য্য সৌর-জগতের কেন্দ্র স্থানে থাকিয়া সৌরজগতকে ধারণ করিয়া আছে। গ্রহ উপগ্রহ সকল সূর্য্যের দ্বারা বিধৃত হইয়াই স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে; স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে জীবন ও কার্য্যকে রক্ষা করিতেছে। কেন্দ্র স্থানে সূর্য্য না থাকিলে কি হইত, ব্রহ্মাণ্ডে জীবন থাকিত কি না তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। ভক্তিভাজন আর্য্য ঋষিগণ এই বলিয়া আদিত্যের উপাসনা করিয়াছিলেন, যে আদিত্যই জীবন ও শক্তির উৎস। তাহা মিথ্যা নহে। আদিত্য না থাকিলে উদ্ভিদ ও জীবের জীবন থাকিত না; এই অত্যাশ্চর্য্য জগৎ সৌন্দর্য্যদ্বারা বিভূষিত হইত না।

সূর্য্য যেমন কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া গ্রহ উপগ্রহ সকলকে ধারণ করিতেছে, উদ্ভিদ ও জীবকে জীবন ও শক্তি দিতেছে, তেমনি আমাদের হৃৎপিণ্ড বা রক্তাধার আমাদের দেহের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া ইহাকে ধারণ করিতেছে; প্রতিনিয়ত রক্তস্রোতকে প্রবাহিত রাখিয়া দেহের ক্রিয়া সকলকে রক্ষা করিতেছে। এখানেও শক্তি কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে যাইতেছে। এই-

রূপ কেন্দ্রস্থ মেরুদণ্ড হইতে স্নায়বীয় তরঙ্গ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ধাবিত হইতেছে।

এইরূপে যে গূঢ় শক্তি দ্বারা বিধৃত হইয়া জনসমাজ ও মানব-পরিবার সকল বিবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহারও বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে প্রত্যেক মানব সমষ্টির মধ্যে এক একটী প্রেমের কেন্দ্র আছে, যাহাতে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছে। গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিলে দেখিতে পাই যে, পরিবারের মধ্যস্থলে হয়ত একজন নারী রহিয়াছেন, যিনি প্রেমের দশ বাহু বিস্তার করিয়া যেন দশদিকে দশজনকে ধরিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার সহিত গূঢ় প্রীতিসূত্রে একদিকে পতি বাঁধা, অপর দিকে পুত্র কন্যাগণ বাঁধা, অপর দিকে দাস দাসী-গণ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলে বাঁধা। অব্যক্ত প্রেমের শক্তি যে কত, মানুষ তাহা জানে না। একবার ভাবিয়া দেখে না! সাধারণ মানুষের বুদ্ধি বড় স্থূল ; তাহারা স্থূল বস্তুকেই দেখে। ধন সম্পদ, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল শক্তি বাহিরে কাজ করে, তাহাদিগকেই দেখিতে পায়, তাহাদিগকেই শক্তি বলিয়া স্বীকার করে, মনে ভাবে তাদেরই গুণে মানব-সংসার স্থিতি করিতেছে, ও স্বীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে। সকলের পশ্চাতে, সকলের অভ্যন্তরে, সকলের অন্তরালে যে অব্যক্ত প্রেমের শক্তি লুকাইয়া থাকে, তাহা অনেক সময়ে লক্ষ্য করে না। মানবসমাজ কিরূপে থাকিতেছে, কিরূপে কার্য্য করিতেছে, কিরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল চিন্তা

করিতে গেলেই স্থূলদর্শী মানুষের মনে বিষয় বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি কত কি আসে! আসেনা কেবল সেই প্রেমের কথাটা যেটা প্রকৃত প্রস্তাবে মানব-সমাজকে ধারণ করিতেছে। এই যে তুমি আমি, জন সমাজে রহিয়াছি, স্বীয় স্বীয় সুখ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিতেছি, ঘটনা ও অবস্থা সকলের ঘাত প্রতিঘাত সহিতেছি, ইহার মূলীভূত কারণ প্রেমের শক্তি। আমরা দশজনে প্রীতি-সূত্রে এক একটী কেন্দ্রের সহিত বদ্ধ রহিয়াছি। আমি দশজনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তুমি দশজনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, আর একজন আর একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ বাঁধা-বাঁধির, ধরাধরির মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। যাহার ভাল বাসিবার বা যাহাকে ভাল বাসিবার কেহই নাই, তাহার পক্ষে জন-সমাজও যাহা বিজন অরণ্যও তাহা। প্রেমের বাঁধন আছে বলিয়াই শত দুঃখের কষাঘাত, শত শত্রুতার তীব্রতা সহ্য করিয়াও মানবসমাজে থাকিতে পারি। এই প্রেমের শক্তিই মানব-সমাজের স্থিতি ও উন্নতির প্রধান কারণ। এই শক্তি নারী হৃদয়ে অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া, গৃহ পরিবার ও সমাজ সমুদয় নারীর উপরে প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত।

এখন বলি সূর্য্য যেমন সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া সৌরজগতকে ধারণ করিতেছে, হৃৎপিণ্ড বা মেরুদণ্ড যেমন মানব-দেহের কেন্দ্র স্থানে থাকিয়া দেহের সমুদয় গতি ও

কার্য্যকে রক্ষা করিতেছে, নারী-হৃদয় যেমন গৃহ, পরিবার সমাজ সকলের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া, সকলকে রক্ষা করিতেছে, তেমনি সেই জ্ঞানময় ও প্রেমময় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন। রথনাভি যেমন অর সকলকে ধরিয়া রাখে, তেমনি তিনিই সমুদয় চরাচরকে ধরিয়া রাখিতেছেন। কিন্তু চক্রনাভি যেমন অর সকলকে ধরিয়া রাখে তেমনি নেমিও তাহাদিগকে ধারণ করে। ব্রহ্মাণ্ডচক্রের স্থলে এই মাত্র প্রভেদ যে যিনি চক্রনাভি তিনিই চক্রনেমি। তিনিই ভিতর হইতে জীবন ও শক্তিকে উৎসারিত করিতেছেন, তিনিই বাহির হইতে সমুদয়কে ধারণ করিতেছেন। আমরা বাহির দিয়া যখন দেখিতেছি, তখন বিবিধ শক্তির ক্রীড়া দেখিতেছি, বিবিধ রূপ, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ ঘটনা লক্ষ্য করিতেছি। অর সকল যেমন নাভিতে একত্র বদ্ধ থাকিয়াও নেমিতে পরস্পর হইতে দূরে, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরের ঘটনা সকল মূলে এক শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াও আমাদের চক্ষে পরস্পর হইতে বিভিন্ন দেখাইতেছে। আমরা তাহাদের আদি অন্ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; তাহাদের ভিতরের তত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। যাহারা অভিনয় দেখে তাহারা যেমন দূরে বসিয়া নটগণের গতিবিধি লক্ষ্য করে, সাজঘরের সংবাদ জানে না, আমরাও যেন তেমনি বাহিরে বসিয়া ব্রহ্মাণ্ডশক্তির বাহিরের ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছি, ভিতরের কথা আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঋষিগণ যোগবলে দেখিয়াছিলেন,

ভিতরে বাহিরে একই শক্তি, রথনাভি ও রথনেমি উভয়স্থলে একই জ্ঞান, একই প্রেম।

কেন্দ্র ও পরিধি উভয় স্থানেই থাকিয়া কিরূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। মূলে এক শক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি নাই, অথচ বাহিরে শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ দেখিতেছি। কি প্রকৃতি রাজ্যে, কি জীব জগতে, কি মানব-সমাজে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি যে সকল শক্তির ক্রোড়ে আমরা আশ্রিত আছি, তাহারা কখনও কখনও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদয় ভগ্ন করিতে চাহিতেছে! বহু বহু সহস্র বৎসরে যে ভূস্তর বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এক দিনের ভূমিকম্পে তাহা বিদীর্ণ হইয়া গেল; ধরাগর্ভস্থ অগ্নিরাশি শমনের লোল জিহ্বার ন্যায় উদ্গীরিত হইয়া বহু বহু যোজন ব্যাপিয়া ধরাপৃষ্ঠকে ধাতুদ্রব্যে নিমগ্ন করিল; যে সকল স্থান শ্যামল শস্যে, জীব মানবের আবাস গৃহে, বা সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ মহানগরে পূর্ণ ছিল, তাহা মৃত্যুর ঘন অন্ধকারে চিরমগ্ন হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইল; কোথাও বা বহুজনপদপূর্ণ ভূভাগ বিষয় বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ রহিয়াছিল, একদিন মহা ঝটিকার মহা আঘাতে সাগর বারি নৃত্য করিয়া সেই ভূভাগে ধাবিত হইল, বহু শতাব্দীর সুখ সমৃদ্ধি একদিনে ডুবাইয়া দিল। এইরূপে জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি যাহাদিগকে মানব-জীবনের বন্ধু, ও মানব-জীবনের রক্ষক ও প্রতিপালক বলি, তাহারাই এক এক সময়ে দুর্জ্জয়

বিক্রম প্রকাশ করিয়া মানবকে ত্রস্ত ও বিকম্পিত করিতেছে। বহুকালের গঠিত বিষয় সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। কেবল কি জড় ও জড়ীয় শক্তির মধ্যে এইরূপে রুদ্ররূপ দেখিতেছি তাহা নহে। আমরা সচরাচর বলি, মানব মানবকে চায়, এই জন্যই জনসমাজের অভ্যুদয়। কিন্তু অপরদিকে দেখিতেছি, সামান্য স্বার্থের জন্য মানুষ মানুষকে বিনাশ করিতেছে; জাতিতে জাতিতে বিরোধ ঘটিয়া সহস্র সহস্র মানুষ নিধন প্রাপ্ত হইতেছে; বহু বহু শতাব্দীর সুখ সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইতেছে: এই সকল দেখিয়া আমরা এক এক সময়ে চিন্তা করিতে বসি, ব্রহ্মাণ্ডশক্তি কি গড়িতে চায়, না ভাঙ্গিতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকারীর হৃদয়ের অবস্থার উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যাঁহারা তিক্ত ও বিষাক্ত চক্ষে জগতের দিকে চান তাঁহারা দেখেন ভাঙ্গাই গূঢ় ব্রহ্মাণ্ডশক্তির প্রধান কাজ। তাঁহারা বলেন, জগতের মূলে যিনিই থাকুন, মারিতে ও যাতনা দিতে তাঁহার দয়া মায়া নাই। মারিবার সময়ে তিনি আপনার পর বিচার করেন না। যে শরণাপন্ন হইয়া কাঁদিতেছে, তাহাকেও অতল সাগর জলে বা ভূকম্পভগ্ন মৃত্তিকারাশির মধ্যে সমাহিত করেন। আবার যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম ও প্রাণে মিষ্টতা আছে, তাঁহারা জগতের সৌন্দর্য্য ও জীবনের সুখের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, দেখ জগতের পিতামাতা কিরূপ দয়ালু। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে

না পারিলেও আমরা পড়ের উপরে একথা বলিতে পারি যে তিনি কেন্দ্র ও পরিধি উভয় দিক হইতে মানব-জীবনকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি সকল ও মানব-হৃদয়ের ভাব সকল, সময়ে সময়ে যতই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করুক না কেন, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য মানব-জীবন হইতে দূরে নহেন।

কেবল যে বাহিরে আমরা তাঁহার প্রসন্নরূপ ও রুদ্ররূপ দুই রূপ দেখিতেছি তাহা নহে, আত্মার গভীর অভ্যন্তরেও উক্ত উভয় রূপ লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয় কখনও বা প্রেমের সুকোমলতা, পুণ্যের স্নিগ্ধতা অনুভব করিতেছে, আবার কখনও বা প্রবৃত্তিকুলের ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতেছে; আমরা কখনও বা সাধু সঙ্গে বসিয়া তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিতেছি আবার কখনও বা পাপ বিকারে অন্ধপ্রায় হইয়া তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিতেছি। তখন তাঁহার সেই প্রেমমুখ আমাদের নিকটে উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক বোধ হইতেছে। তখন যেন দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া পাপী বলিতেছে,

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তদ্দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।

এখানেও প্রসন্নতা ও রুদ্রতা উভয়ের মধ্যে একই জন, দুই জন নাই। একই জন প্রেমে সকলকে ধারণ করিতেছেন।

আমরা একবার পরিষ্কার করিয়া বুঝি যে চক্রনাভি ও চক্রনেমির ন্যায় তিনিই ভিতর বাহিরে আমাদের জীবনকে

ধারণ করিয়া আছেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম কত স্বাভাবিক হয়; তাহা হইলে কত আশা ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, হৃদয় মনে কত শক্তি ও সাহস আসে! জগদীশ্বরের এরূপ বিধি নয় যে মানবাত্মা প্রাচীন বৃক্ষের ন্যায় জীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যাইবে; তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে নিরুদ্যম ও শক্তিহীন হইয়া সংসারে অবসন্ন দশায় থাকিবে; তিনি যেন আমা-দিগকে বলিতেছেন, "ভয় কি, ভয় কি, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে কেন ভয় পাও, আমি যে তোমাদের ভিতর বাহিরে ধরিয়া রহিয়াছি।" ইহাতে কোনও ভুল নাই, যে ধর্ম্মে আপনাকে দিলে তাঁহার ক্রোড়েই আপনাকে দেওয়া হয়, অথচ অকপটে ধর্ম্মে আপনাকে দিতে আমরা কত ভয় পাই। এই যে বর্ষ শেষ ও শতাব্দীর শেষ হইতে যাইতেছে, আমরা কি আশাপূর্ণ নয়নে নব বর্ষ ও নব শতাব্দীর দিকে চাহিতে পারিতেছি? তিনি ভিতর বাহিরে জীবনকে ধরিয়া আছেন জানিয়া উৎসাহিত চিত্তে কি ভবিষ্যতে প্রবেশ করিতে পারিতেছি? আজ একবার বিশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া উত্থিত হই। যিনি ভিতরে বাহিরে জীবনকে ধরিয়া আছেন তাঁহার ক্রোড়ে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করি। তিনি শক্তিরূপে হৃদয়ে বাস করুন, আলোকরূপে চক্ষে থাকুন, আমরা আশা ও আনন্দের সহিত তাঁহার পথে অগ্রসর হই।